বর্ধমান চর্চা

পরিবেশক ঃ
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

স্বত্বাধিকারী :
অভিযান গোষ্ঠীর পক্ষে সচিব,
বিদ্যানন্দ চৌধুরী,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

প্রকাশকাল :
৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

প্রকাশক :
শ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ :
ইন্দ্রনাথ দাশ
কো - আপারেটিভ প্রেস,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় :
কম্পু - কালার,
৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা - ৯

(লেসার কম্পোজ)
ইলেক্ট্রো গ্রাফিক্স
২২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা - ৭৩

(প্রচ্ছদ মুদ্রণ)
টাইপো গ্রাফিকস আর্ট
পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৯

(লেমিনেশন)
চৌধুরী কনসার্ন
৫৭/২ই, কলেজস্ট্রীট কলিকাতা - ৭৩

প্রচ্ছদ : সমর মুখোপাধ্যায়

অভিযান গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য বৃন্দ ঃ

কালীপদ সিংহ
জীবেশচন্দ্র তালুকদার
নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবেন মুখোপাধ্যায়
দেবাশীষ চৌধুরী
প্রবীর চট্টোপাধ্যায়
প্রবীর সাহানা
আশিস গুহ
অঞ্জন রায়
দীনবন্ধু দাশ
সুনন্দা রায়চৌধুরী
কবিতা মুখোপাধ্যায়
সৌম্যেন সরকার
নিরুপম চৌধুরী
তরুণ রায়
গিরিধারী সরকার
বিশ্বজিৎ হালদার
দেবনাথ মৈত্র

বর্ধমান চর্চা

সূচীপত্র

প্রাকভাষ

বর্ধমান চর্চা

প্রাক্‌ভাষ

প্রথমে বিষয়ের কথা। 'বর্ধমান চর্চা' বর্ধমানের ইতিহাস নয় যদিও বিষয় ইতিহাস। যে জেলায় আমরা বসবাস করি রাঢ় বঙ্গের মধ্যমণি সেই বর্ধমানের ইতিহাস 'এক যে ছিল রাজা' বলে শুরু হতে পারে না এতই প্রাচীন এই বর্ধমান জনপদ। যে কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে বিস্তর হট্টগোল হচ্ছে, বর্ধমানের তুলনায় সে কলকাতা নেহাৎই অর্বাচীন। অন্ততঃ তিনহাজার বছরের ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে প্রাকার্যযুগেও বর্ধমান জেলায় সুসভ্য মানুষের ঘরগেরস্থালি ছিল - জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্র' যতই বলুক না কেন যে মহাবীর বর্ধমানের 'লাঢ়' দেশ পরিভ্রমণ কালে তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রবজ্যার ভূগোল হিসাবে বর্ধমান যে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তা তো বোঝাই যায়। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর চেয়ে দামোদরের জলপ্রবাহ প্রাচীনতর, মঙ্গলকোটের ভূগর্ভস্থ সভ্যতার খন্ডহার মহেনজোদারো এবং হরপ্পার সমবয়সীতো বটেই তার থেকে বয়সী হওয়াও অসম্ভব নয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অনুসন্ধিৎসুদের হাতে যৎকিঞ্চিৎ যে প্রমাণ এসেছে তা থেকেই এ অনুমান । দামোদরের ধারে বীরভানপুর এবং ভরতপুরে বৌদ্ধযুগের প্রত্ন-স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া গেছে-অর্থাৎ আড়াই হাজার বছরের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। গলসীর কাছে মল্লসারুলে ষষ্ঠ শতাব্দীর যে তাম্রলেখ পাওয়া গেছে তা বাংলাদেশে প্রাপ্ত সবথেকে প্রাচীন। এ হলো চোদ্দশ বছর আগের কথা। এর পর শশাংক, গোপাল - মহীপাল - ধর্মপালদের রাজত্বের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বল্লাল সেন - লক্ষ্মণ সেনরা তুর্কী সমর নায়ক ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির নবদ্বীপ আক্রমণ পর্যন্ত রাঢ়বঙ্গে তথা সমগ্র বাংলাদেশে সগৌরবে রাজত্ব করে গেছেন।

বর্ধমানের উত্তরে অজয়ের তীরে উজানি-কোগ্রাম মঙ্গলকোটে অঞ্চলে একদা ধনপতি এবং চাঁদ সদাগরের বাস ছিল। মঙ্গলকাব্যের কবিরা আমাদের এসব বৃত্তান্ত ছন্দোবদ্ধভাবে জানিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অর্ধেকেরও বেশি মণিমাণিক্য বর্ধমান জেলার উপহার। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভুপাদ কেশব ভারতীয় কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়েছিলেন কাটোয়া বা কন্টকনগরে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে। মৃত লখিন্দরকে নিয়ে গাঙুরের স্রোতে ভেলা ভাসিয়েছিলেন সতী বেহুলা সে গাঙুর বর্ধমান জেলার বুক চিরেই একদা প্রবাহিত হত। এখান থেকে চাঁদসদাগর ধনপিত সদাগর সিংহল দ্বীপের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন বলে আমাদের ভাবতে ভালো লাগে।

প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে অনেক গল্প কাহিনীও মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। কালের প্রবাহে অনেক কিছু হারিয়ে যায় - স্মৃতি, তথ্যপ্রমাণাদি এবং আরো অনেককিছু। আঞ্চলিক ইতিহাস রচিত না হলে বাংলাদেশ তথা বাঙালী জাতির পূর্ণ ইতিহাস কোনদিনই আমরা জানতে পারব না। বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্ষেপ করেছিলেন বাঙালীর ইতিহাস লেখা হল না - আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি সে কথায় তেমনভাবে কোন দিনই কর্ণপাত করেনি।

রাঢ় বাংলা তথা বর্ধমানের পূণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হবার অপেক্ষায়। শুদ্ধ বাংলায় সিংহাবলোকন বলে যে শব্দটি রয়েছে তার সোজা অর্থ পিছন ফিরে দেখা। এই যে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পেরিয়ে এলো মানুষের ক্রমবিকশিত সভ্যতা সে কাহিনীর মত রোমাঞ্চকর আর কিছু হতে পারে না। যে সভ্যতার সাতমহলা বহুবর্ণ রাজপ্রাসাদে আমাদের বসবাস কে তার ভিত খুঁড়েছিল ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে যুগের পর যুগ অতিক্রম করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা বর্ধমানের প্রাচীন অধিবাসীরা ? সব ইতিহাস আজ আর জানার উপায় নেই তবে পদচিহ্ন ধরে পিছান হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা কি কিছু স্মৃতিফলক কুড়িয়ে পাবনা ? 'বর্ধমান চর্চা' এমনই এক প্রয়াস।

'বর্ধমান চর্চা' বর্ধমানের পূর্ণাঙ্গ কেন আংশিক ইতিহাসও নয়। প্রবন্ধের পরিসরে ইতিহাসের যাবতীয় অনুপুঙ্খ ধরা যায় না। তবুও আমরা চেষ্টা করেছি বিহঙ্গ দৃষ্টিপাতে প্রাচীন এবং বর্তমান বর্ধমানের জীবনের চালচিত্রের বহুবর্ণ মোজাইকটিকে পাঠক পাঠিকার সামনে তুলে ধরতে। অনেক ফাঁক থেকে গেছে সে বিষয়ে আমরা সচেতন। অর্থ, সামর্থ্য, সময় এবং যোগ্যতার ঘাটতি যে ছিল তা অনস্বীকার্য। এখনও পর্যন্ত বর্ধমান জেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনীতির পরিচয়জ্ঞাপক যে সব বইপত্র এবং প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে তা সবই ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত উদ্যোগে। ১৯০৮-৯ সালে বর্ধমান গেজেটীয়র প্রকাশিত হবার পর

৮০ বছর সময় পেরিয়ে গেছে। বর্ধমান সম্মিলনীর পক্ষ থেকে দুবার চেষ্টা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অনুকূল চন্দ্র সেন এবং নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী 'বর্ধমান পরিচিতি' লিখেছেন। উদয় অভিযান পত্রিকার 'বর্ধমান সংখ্যা (১৯৭৩)' এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। আজকের অভিযান গোষ্ঠী এঁদেরই উত্তরসূরী। সেই অর্থে এটা তাঁদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বর্ধমান চর্চার ক্ষেত্রে এঁরা যে নিরলস অনুসন্ধিৎসু এবং আন্তরিক উৎসাহী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এঁরা ছাড়াও আরো অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছেন। ডঃ সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল, নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, কালীপদ সিংহ, ডঃ আবদুস সামাদ, রফিকুল ইসলাম, ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, ডঃ বারিদবরণ ঘোষ, আবদুল গণি, সুধীর চন্দ্র দাঁ এবং আরো অনেকে। রাজবংশের ডঃ প্রণয় চাঁদ মহতাব, নন্দিনী মহতাবও এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল, ইতিহাস এবং বাণিজ্য বিভাগ থেকেও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বর্ধমানের পরিচয় তুলে ধরার জন্য । বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ ম্যাগাজীনেও অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে এই সব বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বর্ধমানের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোন ফাউন্ডেশন। একদল গবেষক যদি এ কাজে উদ্যোগী হন তাহলেই তা সম্ভব। এজন্য প্রচুর অর্থ এবং সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করার প্রয়োজন। আন্তরিক তাগিদ না থাকলে এ কাজ হবে না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স হলো প্রায় তিরিশ বছর। এতদিনে কেন এ কাজে হাত দেওয়া হয়নি তা ভাবতে অবাক লাগে। আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যমত চেষ্টা করেছি- এর বেশী কিছু দাবী আমাদের নেই।

বর্ধমান চর্চায় যাঁরা অংশ নিয়েছেন দু চারজন ছাড়া তাঁরা সকলেই অভিযান গোষ্ঠীর সদস্য। যাঁরা লেখেননি তারাও আমাদের ভাবনা ও প্রয়াসের সঙ্গী হয়েছেন। অনুজপ্রতিম অজয় কোনার, প্রবীর চ্যাটার্জী এবং ধূর্জটি মাজি বইপত্র জোগাড় করে দিয়ে এবং তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নাগেশ্বর প্রসাদ বাড়ী বয়ে এসে বইপত্র যোগান দিয়ে এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই সজ্জন মানুষটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। বন্ধু নিরদেন্দু কোনার এবং আরো অনেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রমা কুন্ডু (ঘোষ) আমাদের নানাভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ডঃ বারিদবরণ ঘোষের সস্নেহ উৎসাহ এবং সমীরণ চৌধুরীর মিশনারীতুল্য কর্মোদ্যোগ ছাড়া বর্ধমান চর্চা প্রকাশিত হতে পারত না। এঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট কোরব না।

কোন কোন প্রবন্ধের শেষে সংযোজন হিসাবে যা যুক্ত হয়েছে তা মূল প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার দায় একান্তভাবেই সম্পাদকের। মূল প্রবন্ধের বক্তব্য অক্ষুণ্ণই থাকছে সংযোজনে আরো কিছু তথ্যের যোগান দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

বর্ধমান চর্চা বর্ধমানবাসীর হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। চর্চা নিরবচ্ছিন্ন চলতে থাকুক - এই আমাদের নিবেদন। অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, গবেষক এবং সাধারণ পাঠক পাঠিকার কৌতূহল বর্ধমান চর্চা যদি জাগ্রত করতে পারে এবং বর্ধমানের ইতিহাস গবেষণায় উৎসাহিত করে তুলতে পারে অভিযান গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এর বেশী দাবী আমাদের নয়।

চিত্র নং　　　　　　　　**পরিচিতি**

১। মাইথনে, জলবিহারের আয়োজন

২। বর্ধমান রাজবাড়ি (inset এ বর্ধমান রাজার emblem).

৩। বারোদুয়ারী, কাঞ্চন নগর

৪। বর্ধমানে ধর্মীয় সহাবস্থানের অপূর্ব নিদর্শন। জুম্মা মসজিদ, পাশে শিব মন্দির তারপাশে শক্তিময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত যুগল মন্দির (ময়ূর মহল, বর্ধমান সহর)

৫। বৈদ্যপুরের দেউল (রেখ দেউল, সপ্তরথ পদ্ধতিতে তৈরী, শিখর স্থাপত্যের নিদর্শন)

৬। ১৯ শতকের মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ। প্রবেশ পথের উপরে রামের রাজ্যাভিষেকের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে । মন্দিরটি শিবের মন্দির । স্থান - বর্ধমান সহর

৭। খড়ো খরের অনুরূপ ইটের মন্দির (অমরাগড়)

৮। বহিসর্বমঙ্গলা মন্দিরের প্রবেশ পথের সরদল (lintel)। সরদলটির মধ্যস্থলে ললিতাসনে উপবিষ্টা চতুর্ভূজা দেবী। প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের নক্সা খোদিত রয়েছে। সরদলটি বেলেপাথরের তৈরী । সময়কাল : দশম / একাদশ শতক

৯। ত্রিভঙ্গ চতুর্ভুজ দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তি। মাইকাসিস্ট পাথরের তৈরী। সময়কাল : একাদশ শতক, প্রাপ্তিস্থান : সিজনা গ্রাম, মন্তেশ্বর (থানা)

১০। দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তির ভগ্নাংশ (ডানদিক) বিষ্ণুর পাশে দেখা যাচ্ছে দণ্ডায়মান লক্ষী (শ্রীদেবী) লক্ষীর বামহস্তে পদ্মফুল, মস্তকে গজসিংহ (motif) মূর্তিটি - কষ্টিপাথর নির্মিত। সময়কাল : একাদশ শতক প্রাপ্তিস্থান : কুচুট, নবস্থা, বর্ধমান ।

১১। গ্রানাইট পাথর নির্মিত মন্দিরের দ্বারের অংশ সময়কাল : নবম / দশম শতক
প্রাপ্তি স্থান : বোমপুর, মন্তেশ্বর
(বিশ্বেশ্বরী যোগমায়া আশ্রম এটি সংগ্রহ করে বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় এনে দেন।

১২। শ্রমপদস্থানে, দণ্ডায়মান দ্বিভূজ বৈশ্রবন মূর্তি। বৈশ্রবণ মূর্তিটি বৌদ্ধ দেবতা অমিতাভ পরিবারের অন্তর্গত। মূর্তিটি বেলে পাথরের তৈরী। সময়কাল : নবম শতক। প্রাপ্তিস্থান : কাঞ্চননগর, বর্ধমান ।

১৩। বিজয় তোরণ (কার্জন গেট), বর্ধমান শহর ।

১৪। বরাকর ও বাহুলাড়ার রেখ ও দেউল

চিত্র নং পরিচিতি

১৫। সর্বমঙ্গলা মন্দির
১৬। পীরবাহারাম, শের আফগনের সমাধি।
১৭। ১০৮ শিবমন্দির বর্ধমান শহর।
১৮। শেষ অষ্টাদশক শতকের পঞ্চরত্ন দেউল। কাঞ্চননগর কঙ্কালেশ্বরী কালিবাড়িটি পিছনে দৃশ্যমান। ভগ্নদশাতেও সুন্দর । গৌড়ীয় স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যাচ্ছে ।
১৯। জৈন মূর্তি ।
২০। উনিশ শতকের একটি মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে পোড়ামাটির কাজ। মন্দিরটি শিবের মন্দির । স্থান ঃ বৈদ্যপুর ।
২১। বাবা বর্ধমানেশ্বর। ত্রয়োদশ শতকের শিবলিঙ্গ। পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রাপ্তিস্থান ঃ মতিবাগ, আলমগঞ্জ, বর্ধমান।
২২। বেলেপাথরের নির্মিত ধ্যানমগ্ন মহাদেব মূর্তির উপরিভাগ । মূর্তিটি নবম /দশম শতকের
প্রাপ্তিস্থান ঃ আদ্রাহাটি।
২৩। বিজয় বিহারের ভিতর একটি মন্দির।
২৪। মৃগ উদ্যানে হরিণেরা
২৫। পাতুনের মূর্তিস্তূপ - শিবলিঙ্গ ও কূর্ম্ম মূর্তি ধমঠাকুর।
২৬। চামুণ্ডামূর্তি
২৭। ইটের দো-চালা কবর, বর্ধমান।
২৮। বৌদ্ধস্তূপ, ভরতপুর

ছবিগু লি তুলেছেন শ্রী দেবনাথ মৈত্র। কেবল ৮,৯,১০,১১,১২ এবং ২২ নম্বর ছবিগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা থেকে তোলা। এই ছবিগুলির পাঠ্যাংশটি লিখতে সাহায্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিউরেটর শ্রী শৈলেন সামন্ত । ১৭ নং ছবিটি গোলাম মোস্তাফার তোলা। এছাড়া ৭,১৪,১৯,২৭,২৮,২৯ এবং ৩০ নম্বর ছবিগুলি বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগৃহীত ।

মানচিত্র পরিচিতি

১। প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত
২। আধুনিক বর্ধমান
৩। জমির শ্রেনী অনুযায়ী বর্ধমান
দষ্টব্য ঃ বর্ধমানের ভূমি ব্যাবস্থা ও কৃষি পরিচয় প্রবন্ধ

চিত্র - ১
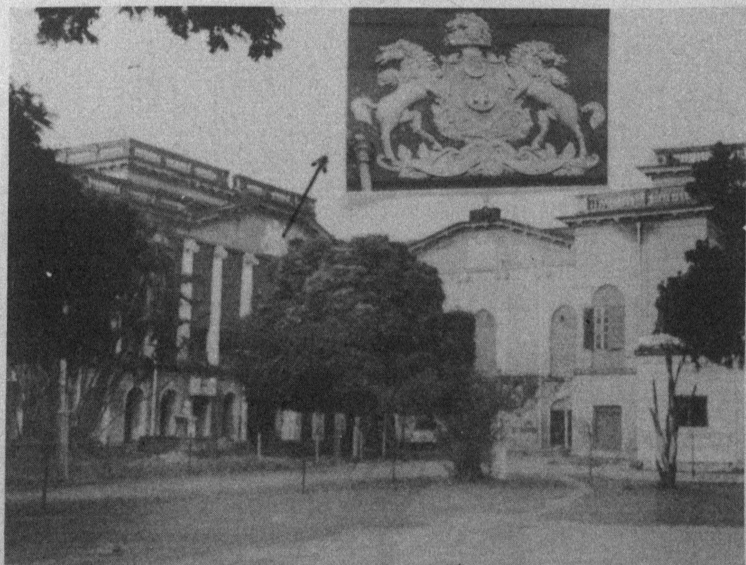
চিত্র - ২
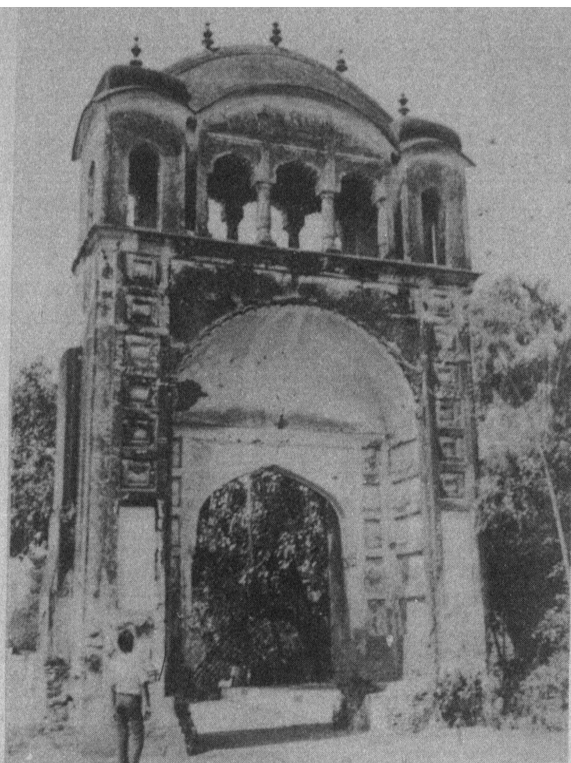
চিত্র - ৩

চিত্র - ৪ চিত্র - ৫
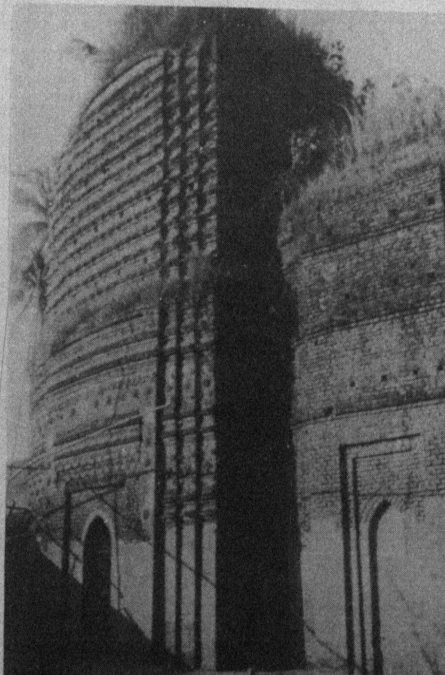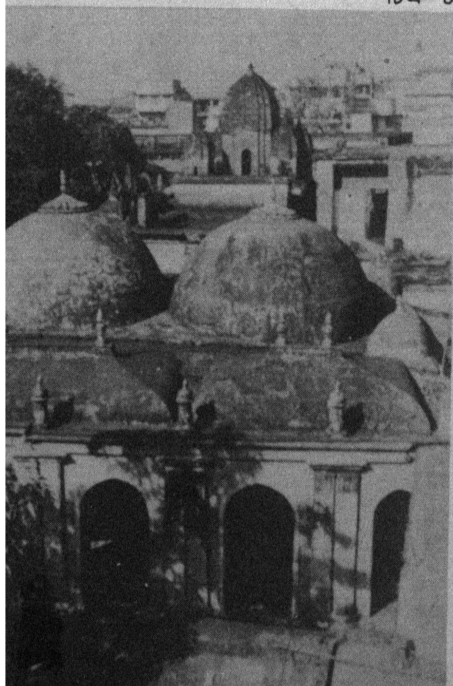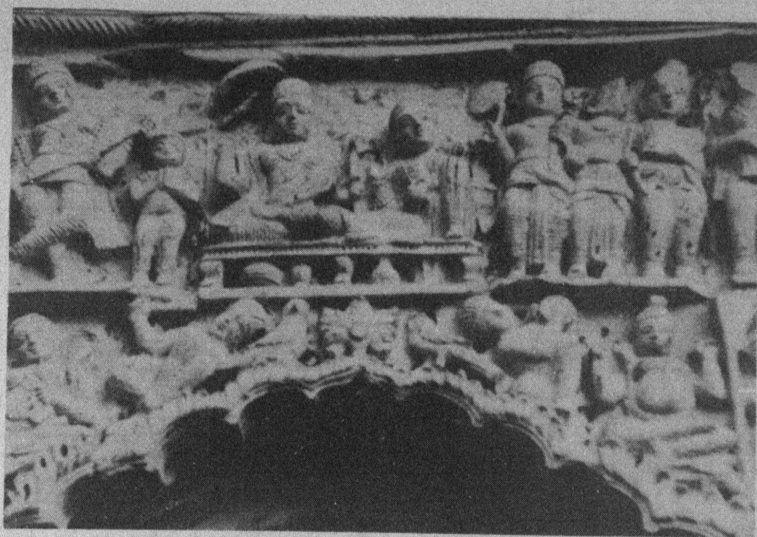
চিত্র - ৬
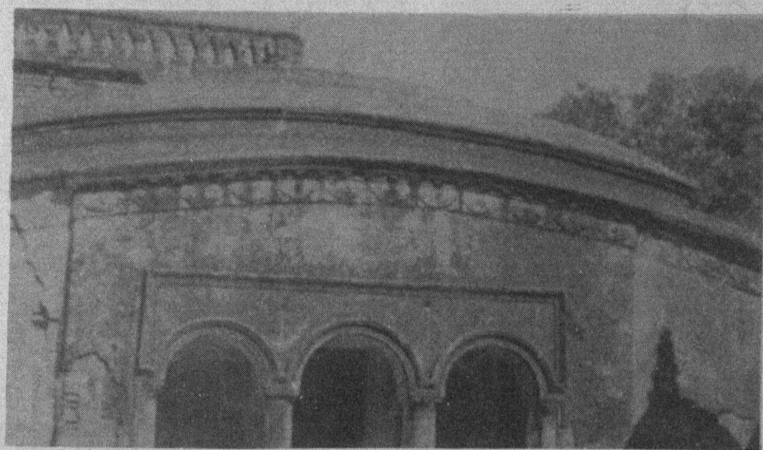
চিত্র - ৭

চিত্র - ৮
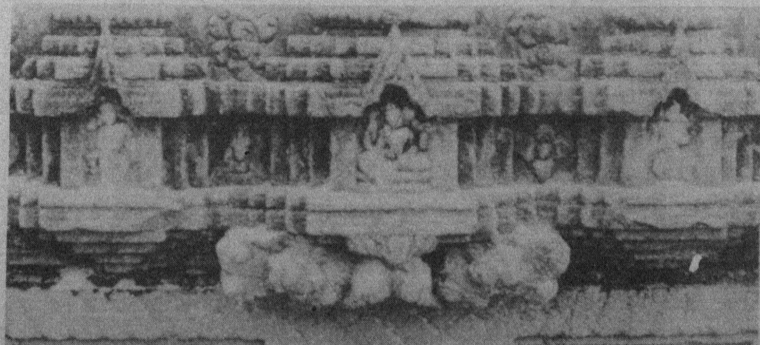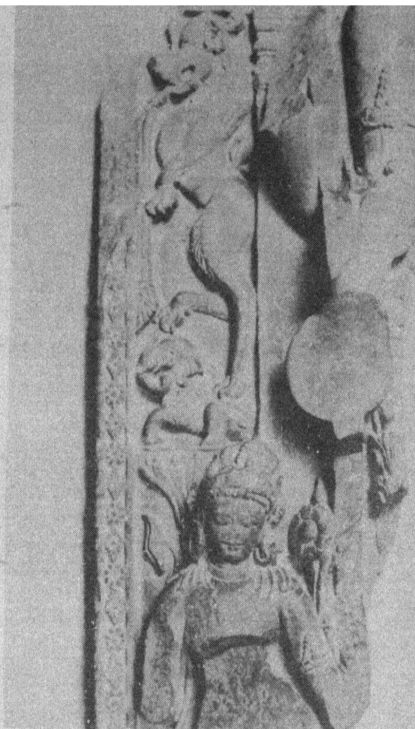
চিত্র - ৯ চিত্র - ১০

চিত্র - ১১

চিত্র - ১২

চিত্র - ১৪
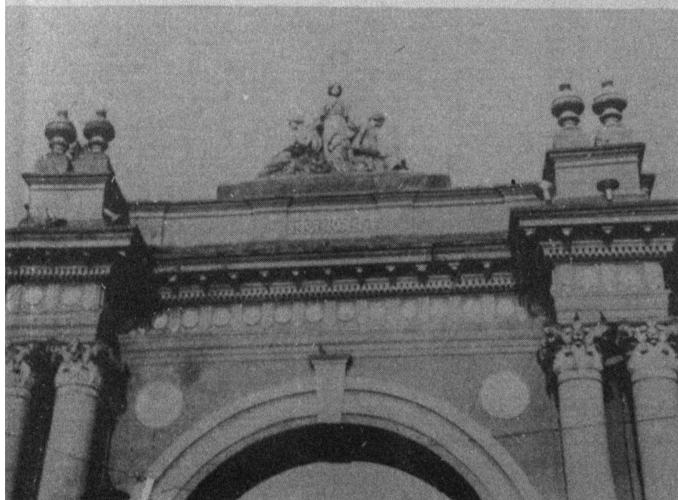
চিত্র - ১৩

চিত্র - ১৫ চিত্র - ১৬

চিত্র - ১৭

চিত্র - ১৮

চিত্র - ১৯

চিত্র - ২০

চিত্র - ২১

চিত্র - ২২
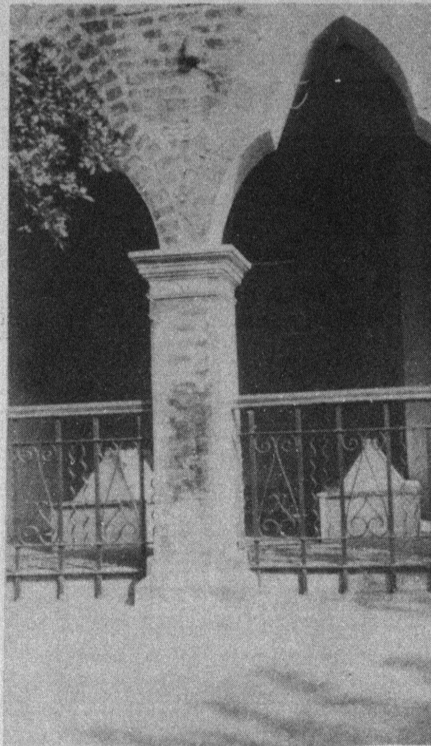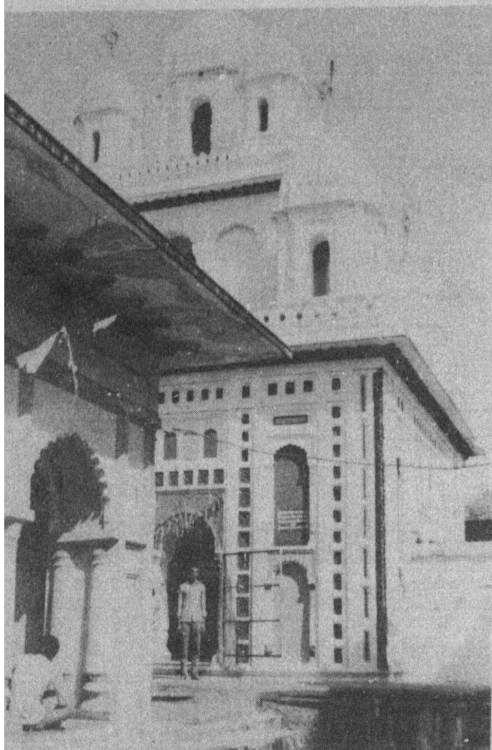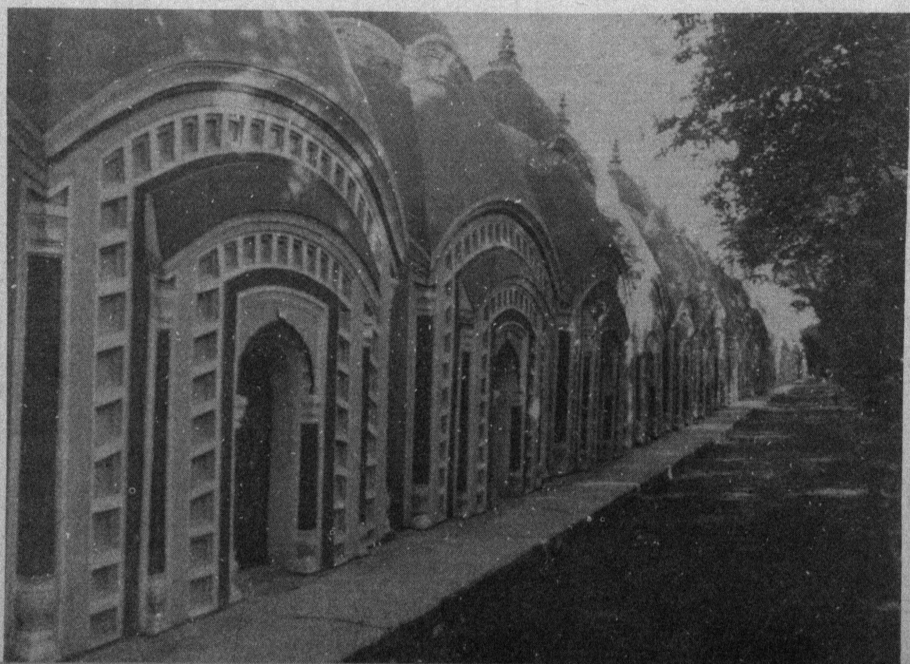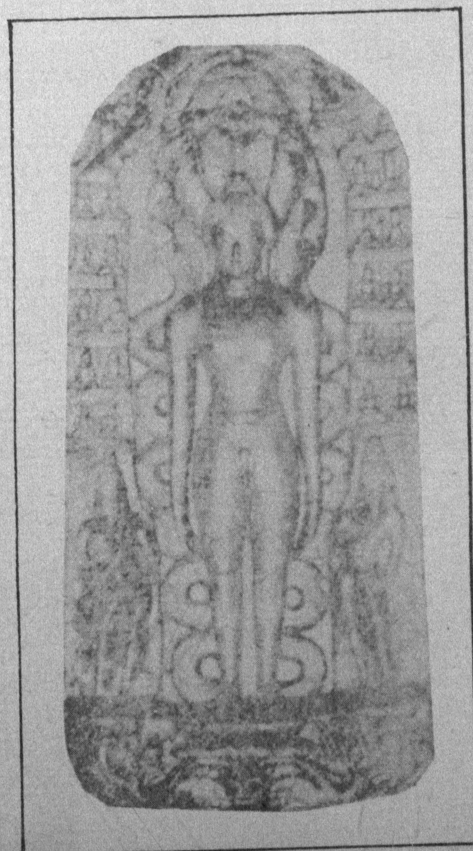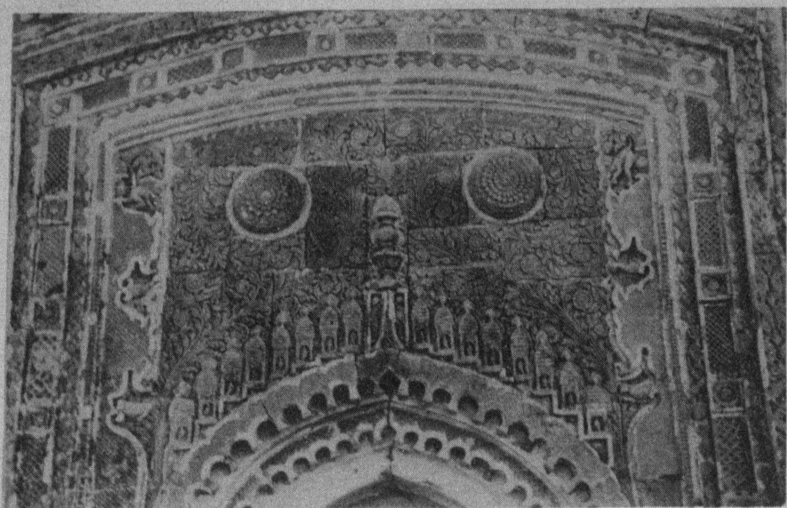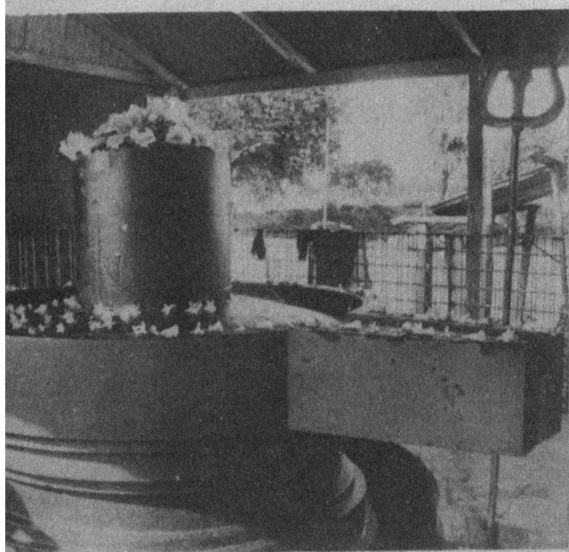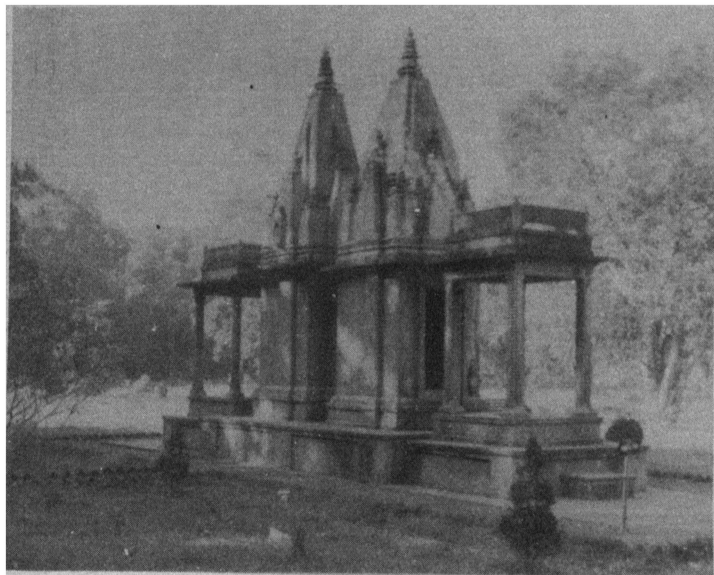
চিত্র - ২৩

চিত্র - ২৪

চিত্র - ২৫

চিত্র - ২৬

চিত্র - ২৭

চিত্র - ২৮
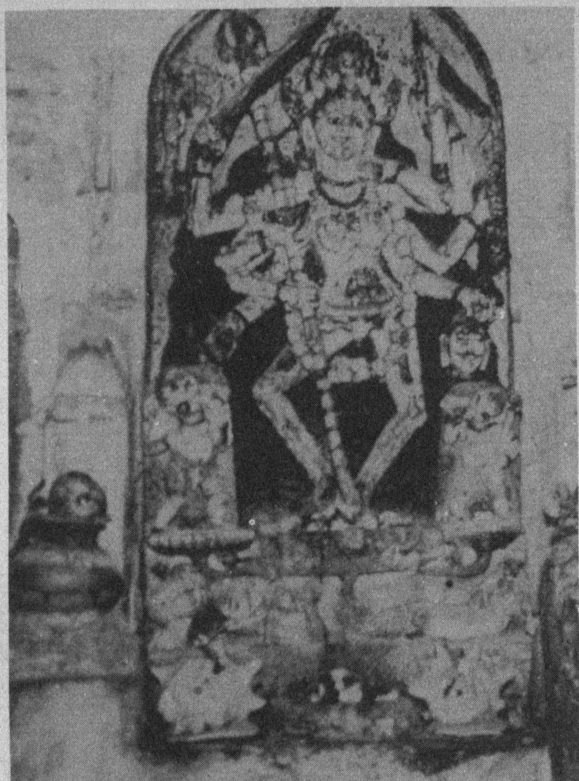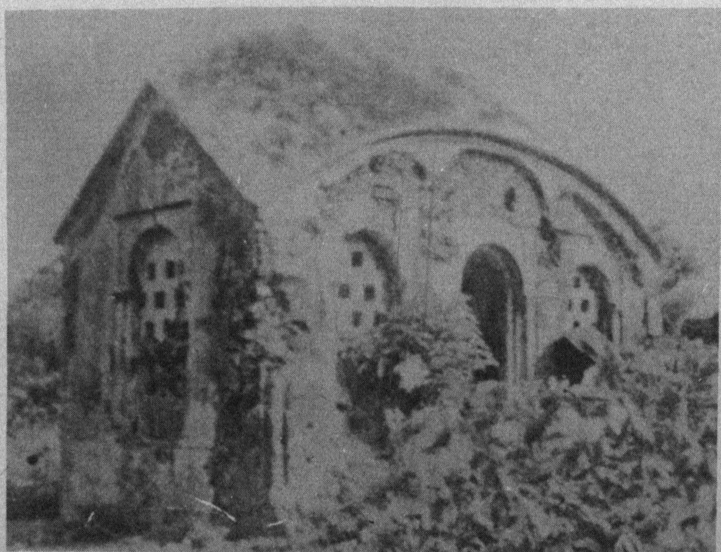
বর্ধমানের ইতিহাস - যৎকিঞ্চিৎ

সুকুমার সেন

সেকালেব সুহ্মভূমি অর্থাৎ দুহাজার বছর আগেকার বর্ধমান মানে পশ্চিম বঙ্গ । বাংলাশের ইতিহাস কিছু কিছু লভ্য হয়েছে আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে থেকে । তার আগেকার খবর দেশের নামটি ছাড়া কিছু পাবার যো নেই । পরেকার খবর কয়েক শতাব্দী ধরে পাবার উপায় নেই, তবে প্রত্নবস্তু পাওয়া গেলে তার উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া যাবে । আপাততঃ গুপ্ত রাজাদের শাসনকাল থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতা খুলতে হয় । মনে রাখতে হবে যে কালের কথা বলছি সেকালে কোন রকম জেলা বিভাগ ছিলনা । তখন অর্থাৎ ৪০০ খ্রী থেকে বাংলাদেশ দুটি বৃহৎ খন্ডে বিভক্ত ছিল উত্তর ও দক্ষিণ । খন্ড দুটির মধ্যেকার ভেদরেখা ছিল ভাগীরথী । উত্তর প্রদেশের প্রধান নগর পুন্ডবর্ধন-ভুক্তি । দক্ষিণ প্রদেশের প্রধান নগর বর্ধমানের নাম অনুসারে এ দেশের নাম হয়েছিল বর্ধমান ভুক্তি । (নগর এখনকার বর্ধমান নয় ।) ইতিহাসগ্রাহ্য দলিল পত্রে এই বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ পাওয়া গেল প্রথম ষষ্ঠ শতাব্দের একটি ভূমিদান পত্রে । কিন্তু তার আগেকার কথা কিছু বলা আবশ্যক ।

বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশ ও তৎসংলগ্ন ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে খুব পুরানো স্থান । প্রাগিতিহাস ও প্রত্ন-ইতিহাসের দিক দিয়েও এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বের প্রমাণ মিলেছে । দুর্গাপুরের পশ্চিমে দামোদরের কাছে নাডহা গ্রামে এমন কিছু প্রত্নবস্তু মিলেছে যাতে করে মনে হয় এ অঞ্চলে আর্যভাষীদের আগমনের অনেক কাল আগে থেকেই মানববসতি ছিল । কিছুদিন আগে দুর্গাপুরের কাছে দামোদরেব বাঁধের জন্য ভিত খুঁড়তে গিয়ে অনেক কিছু প্রত্নবস্তু মিলছে বলে শুনেছি । সেগুলির পরিচয় প্রকাশিত হলে এ দেশের প্রত্ন-ইতিহাসের আরো কিছু মালমশলা হাতে আসবে বলে আশা করা গিয়েছিল । কিন্তু সেগুলির আর হদিস নেই ।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এ দেশের উল্লেখ নেই । অন্তত পক্ষে এদেশের যে নাম আমরা জানি সুহ্ম তার উল্লেখ নেই । তবে অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে "বঙ্গ" জাতির উল্লেখ আছে। জৈনদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে ভগবান মহাবীরের "লাঢ়" (রাঢ়) দেশে ভ্রমণ প্রসঙ্গে যা "সুব্ভ ভূমি" ও "বজ্জভূমি" বলে উল্লিখিত তা আমরা "সুহ্মভূমি" ও বজ্রভূমি" (বা বাহ্যভূমি) বলে মনে করি । আগেই বলেছি, সুহ্ম মোটামুটি আধুনিক বর্ধমান ডিভিসনের পুরানো নাম । বজ্রভূমি তা হলে এখনকার সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর (আগেকার ঝাড়িখন্ড) হতে পারে । কিন্তু এখানে একটু বলবার আছে । "লাঢ়" যদি রাঢ় হয় তবে সে প্রসঙ্গে "সুহ্ম" "বজ্র" বিভাগ অসমীচীন । তবে যদি সুহ্ম মানে দক্ষিণরাঢ় আর বজ্র মানে পাহাড়ে অঞ্চল বোঝায় তা হলে চলে ।

মোট কথা এটা ঠিক যে মহাবীর এদেশে এসেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের বেশ প্রসার হয়েছিল । অনেকে মনে করেন বর্ধমান নামটিতে জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমানস্বামীর নামস্মৃতি রয়েছে । (এখানে একটা কথা জানা আবশ্যক । দামোদর এবং তার শাখা প্রশাখার উপত্যকা ভূমিই ছিল সেকালের সুহ্মভূমির মধ্যস্থান । প্রাচীন বর্ধমান শহর অবশ্যই দামোদর অথবা তার শাখা প্রশাখার তীরে অবস্থিত ছিল । এখনকার বর্ধমান শহর দামোদরের তীরবর্তী নয়, দামোদরের শাখা বাঁকা নদীর তীরবর্তী । একদা এই বাঁকা দিয়েই দামোদরের এক

প্রধান এবং বারমাস স্থায়ী স্রোত বইত। সুতরাং প্রাচীন বর্ধমান বাঁকার অথবা তার শাখা বেহুলা অথবা সমান্তরাল শাখা খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করতে হয়। শব্দ বিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন বর্ধমান নামটির আধুনিক রূপ হওয়া উচিত বড়আন্ বা বড়োয়াঁ। বড়োআঁ নামে গ্রাম এখনও বিদ্যমান। এ গ্রাম যে বেশ প্রাচীন তা ধর্মপূজা পদ্ধতি থেকে জানা যায়।)

মহাবীর যে "লাঢ়" দেশে ভ্রমণ করেছিলেন সে লাঢ় গুজরাটের "লাট" নয়, বাঙ্গলার রাঢ়। মহাবীর উত্তর - পূর্ববিহারের লোক। তিনি প্রব্রজ্যা নিয়ে পূর্বভারতেই ভ্রমণ করেছিলেন, ভারতবর্ষের অপরান্তে নয়। পাল রাজাদের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে দুটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়, উত্তর-রাঢ় এবং দক্ষিণ-রাঢ়। এই বিভাগের মধ্যেকার সীমারেখা কী ছিল তা ঠিক করে বলা যায় না তবে আধুনিক কালে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়ের ব্যবহারিক সংজ্ঞা বিচার করলে মনে হয় এখনকার অজয়ের উত্তরে উত্তর-রাঢ় ও দিক্ষণে দক্ষিণ -রাঢ়। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে অজয়ের গতি প্রকৃতি কি রকম ছিল তা জানা নেই। দামোদরের গতি-প্রকৃতি অনেকটা বোঝা যায় এখানকার ভূসংস্থান ও ছোটখাট শাখানদীর খাত অনুসারে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে উত্তর রাঢ়ের অবস্থা উন্নততর হতে থাকে, এবং এই সময়েই সুহ্মদেশের শেষ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মনে হয়, তখন দামোদরই উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের ছেদ রেখা ছিল। সামাজিক খুঁটিনাটিতে ও কথ্য ভাষার ঢঙ থেকে দামোদরের-এখনকার নয়, যখন দামোদর কালনার কাছ বরাবর গঙ্গার সঙ্গে মিশত, তখনকার দামোদরের-দুতীরের পার্থক্য এখনও খুব দুর্লক্ষ্য নয়।

"রাঢ়" কথাটি অনেক পন্ডিত জাতিবাচক বলে মনে করেন। কিন্তু রাঢ় নামে কোন জাতির খোঁজ পাওয়া যায়নি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে চোয়াড় জাতির সঙ্গে "রাঢ়" এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন।

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।

কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥

উড়িয়া ভাষায় "রাঢ়" মানে বর্বর, নিষ্ঠুর। আধুনিক বাংলায় "রেঢ়ো" রোঢ় অঞ্চলবাসী) শব্দটির অর্থও ভালো নয়। চৈতন্যের সময়ে রাঢ় দেশ বলতে উত্তর-রাঢ় বোঝাত এবং তখন এ অঞ্চল খুব সভ্য অথবা উন্নত বলে পরিগণিত ছিল না। নিত্যানন্দের জন্মভূমি বলে এবং চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভগবদ ভক্তি বিহ্বল হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দিন কয়েক রাঢ় দেশে ঘুরেছিলেন বলে বৈষ্ণব কবিরা লিখেছিলেন, "ধন্য রাঢ় দেশ"।

ইতিহাসে ফিরে আসা যাক।

বাঁকুড়ার অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর এক বিধস্ত গুহার গায়ে তিন ছত্র পুরানো লেখা আছে। লেখার উপরে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রও আঁকা আছে। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুষ্করণার রাজা চন্দ্রবর্মা এই গুহা উৎসর্গ করেছিলেন, এই কথা লেখা আছে। পশ্চিমবঙ্গে এইটি সব চেয়ে প্রাচীন দলিল। অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হয় ৩৫০ থেকে ৪০০ খ্রী মধ্যে লেখা হয়েছিল। চন্দ্র বর্মার রাজধানী পুষ্করণা এখন পোখরনা পলাশডাঙ্গা গ্রাম, দামোদরের দক্ষিণ তীরে, শুশুনিয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে। তখন এখান দিয়ে দামোদরের কোন শাখা প্রবাহিত ছিল। রাজা সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে উল্লিখিত প্রথম দুই রাজা।

তার পরে যে ঐতিহাসিক দলিল মিলছে তা প্রায় দেড় শ দুশ বছর পরেকার। প্রায় বছর তিরিশ আগে গলসী থানার মল্লসারুল গ্রামে পুরানো পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে একখানি উৎকীর্ণ তাম্রফলক পাওয়া যায়। এটি এক নবাগত ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পাট্টা। ভূমি দিচ্ছেন মহারাজ বিজয়সেন, মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের "উপরিক" অর্থাৎ মহাসামন্ত। বংলা দেশে গুপ্তরাজাদের অধিকার লুপ্ত হলে পর স্থানীয় একাধিক স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোপচন্দ্র ও এই রকম একজন বড় রাজা। তবে এঁর রাজ্যসীমা সঙ্কীর্ণ ছিল না। কেননা ফরিদপুরেও এঁর অধিকারের সাক্ষ্য-সূচক তাম্রপট্টলিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু ছোট রাজা বিজয়সেনের কোন কিনারা হচ্ছে না। মনে হয় এঁর বংশ বেশ কিছুকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে - বর্ধমানের পশ্চিম ও উত্তর অংশে - রাজত্ব করেছিল এবং হয়তো এই বংশেরই পিতৃভূমি বলে সেনভূম পরগনার নাম। একাদশ শতাব্দীর শেষে যে বিজয়সেন (হেমন্তসেনের পুত্র, সামন্তসেনের পৌত্র) পাল রাজাদের পর প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের অধিকার পেয়েছিলেন তিনি এই বংশেরই সন্তান। মঙ্গলকোটে সুলতান হোসেন শা নির্মিত পুরানো মসজিদের দেওয়ালে গাঁথা এক পাথরের টুকরোয় যে "শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি" লেখাটুকু পাই তা লক্ষ্মণসেনের কোন বংশধর হওয়া সম্ভব। লক্ষ্মণসেন নোদিয়া থেকে পালিয়ে বর্ধমান ভুক্তির কোন স্থানে এসে জীবনের বাকি কদিন কাটিয়ে গেলেন। সেখানে তার বংশধরের স্বাধীন অধিকার আরও প্রায় শতখানেক বছর ছিল।

মল্লসারুল তাম্রপট্ট থেকে সেকালের টুকিটাকি কথা কিছু জানতে পারি। প্রথমতঃ, সেকালের রাজারা জমির মালিক ছিল না। জমির মালিক ছিল দখলদার, কিন্তু ভূমি হস্তান্তর করতে হলে অনুমতি লাগত বীথী-অধিকরণের অর্থাৎ স্থানীয় পঞ্চায়েতের। এইখানে সেকালের প্রশাসনিক ভূমিবিভাগের কথা বলা প্রয়োজন। দেশ বলতে "ভুক্তি"। ভুক্তি কয়েকটি "বিষয়" বা "মন্ডল" এ বিভক্ত। বিষয় বা মন্ডল আমাদের জেলার মত। তাপর "বীথী" আমাদের সাবডিভিসনের মত। শেষের দিকে বীথীর স্থানে "চতুরক" (অর্থাৎ চৌকি) পাওয়া যায়। আলোচ্য দলিলে রাজা বিজয়সেন টাকা দিয়ে আট বিঘা জমি কিনে নিয়ে "বহ্বৃচ" অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে দিচ্ছেন যাতে তিনি নির্বিবাদে পঠন - পাঠন যজন-যাজন-অতিথি সৎকার ইত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত কাজে নিরত থাকেন।

দ্বিতীয়ত, সেকালের দেশশাসন ও রাজস্বসংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অনেক পদবীর উল্লেখ। এর মধ্যে কিছু কিছু পদ আছে যার উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায়নি। যেমন, "কার্তাকৃতিক", "ঔর্ণস্থানিক", "হিরণ্যসামুদায়িক", "পত্তলক", "আবসথিক", "দেবদ্রোণীসম্বদ্ধ"। কার্তাকৃতিক - যিনি কৃতকে অকৃত করতে পারেন অর্থাৎ Appellate Authority ; ঔর্ণস্থানিক - যিনি উর্ণস্থানের (যেখানে পশমের বা রেশমের সূতা উৎপন্ন বা বিনিময় হয়) অধ্যক্ষ। (এ শব্দটির আসল অর্থ ও তাৎপর্য ঐতিহাসিকরা এখনও লক্ষ্য করেন নি। এদেশে সিল্কের চাষের প্রাচীনত্ব এবং তাহাতে রাজস্ব উৎপত্তির ইঙ্গিত এখানেই পাচ্ছি। ঔর্ণস্থানিক তাহলে - Superintendent of Production and Marketing)। তখনকার দিনে নদীর বালি থেকে সোনা সংগ্রহ করা হত। যিনি বা যাঁরা সেই ব্যাপারে রাজার বা অধিকরণের তরফে অধ্যক্ষতা করতেন তিনি বা তাঁরা "হিরণ্য সামুদায়িক" বলে মনে হয়। "পত্তলক" বোধ হয় গুজরাটী পটেল, গ্রামের বা বীথীর Notary। আবসথিক বোধ হয় বাসিন্দা ব্রাহ্মণদের নেতা। দেবমন্দিরের সম্পত্তির যিনি তদারক করতেন সেই কর্মচারীই সম্ভবত দেবদ্রোণীসম্বদ্ধ বলে উল্লিখিত।

তৃতীয়ত, কয়েকটি উপাধি বা পদবী থেকে তখনকার ভদ্রলোকের কাজের বা জীবিকার পাওয়া যাচ্ছে। "অগ্রহারীণ" যিনি রাজপ্রদত্ত ভূমি (অগ্রহার) ভোগ করতেন। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন অব্রাহ্মণও আছেন। "খাড়গি" বোধ হয় সেনানায়কের পদবী। "বহনায়ক" যিনি বণিক-সার্থবাহের নেতা।

চতুর্থত, কতকগুলি গ্রামের নাম পাচ্ছি যে নামের গ্রাম এখন পর্যন্তও রয়েছে। যেমন,

"গোধগ্রাম" পরে গোহগ্রাম, আধুনিক গোগাঁ (গুহগ্রামরূপে সংস্কৃতায়িত)।

"বক্ষকত্তম" (> বক্কত্তঅ) আধুনিক বাকতা।

"কোড়ডবীর" (> কোড্ডইর) , আধুনিক কোড্ডে

"অধকরক" (> অদ্ধঅরতা), আধুনিক আদ্রা।

"কপিস্থবাটিক" (> কইথআডঅ), আধুনিক কইতাড়া।

"মধুবাটক" (> মহুআডঅ), আধুনিক মওড়া।

"খন্ডজোটিকা" (> খান্ডজোডিঅ), আধুনিক খাঁড়জুলি।

"শাল্মলিবাটক" (> সিম্মলিআডঅ) আধুনিক সিমলাড়া (সিমলুড়)

"বিন্ধ্যপুর" (> বিঞ্চউর) আধুনিক বিজুর।

পঞ্চমত, প্রদত্তভূমির চৌহদ্দি ঠিক করে দেওয়া হত মাপজোপের পর এখানকার মতই কীলক (pillar) গেড়ে। বৎসস্বামীকে যে ভুঁই দেওয়া হয়েছিল তার কীলকে পদ্মবীজের মালা আঁকা ছিল।

মল্লসারুল শাসনপট্টের পরে এদেশের যে দলিল মিলেছে যেগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দের সেন রাজাদের দেওয়া ভূমিদানপত্র। ইতিমধ্যে রাঢ়দেশে স্থানে স্থানে, বিশেষ করে বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলি জেলায়, শাস্ত্রাধ্যায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁরা ধীরে ধীরে ধনে মানে ক্ষমতায় দশের ও দেশের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। রাজশক্তিকে তাঁরা ইচ্ছামত পরিচালিত করবার শক্তিও লাভ করেছেন। রাঢ়ের ব্রাহ্মণের এই মর্যাদা বাংলা দেশের এবং বাংলার বাইরেও স্বীকৃত হয়েছিল। কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দক্ষিণরাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলগর্বের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত আছে। মল্লসারুল তাম্রপটে শ্রীবর্ধমানভুক্তির বিশেষণ আছে। "সততধর্মক্রিয়া বর্ধমানা"। সেন রাজারা রাঢ়ের লোক। বংশের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ও স্বদেশের গুণবর্ণনায় বল্লালসেন তাঁর এক ভূমিদানপট্টে কাটোয়ার কাছে ঝামটপুরের পাশে নৈহাটীতে প্রাপ্ত বলেছেন - অর্থাৎ তাঁর সভাকবিকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন - এই কথা।

বংশে তস্যাভ্যূদয়িনি সদাচারচর্যানিরূঢ়ি -

প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতগুণৈ র্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ

শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ

কীর্তুল্লোলৈ, স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ।।

অর্থাৎ-তাঁর (চন্দ্রের) উন্নতিশীল বংশে রাজপুত্রেরা (রাউতরা) জন্মেছিলেন। সদাচারচর্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ প্রখ্যাত রাঢ়াকে তাঁরা অসম্ভাবিত গুণ ও চারিত্র দ্বারা ভূষিত করেছেন। বিশ্বে সতত অভয় বিতরণে অকৃপণতার জন্য তাঁরা যশস্বী। তাঁদের কীর্তিসমুদ্রের ঢেউ আকাশকেও ধুয়ে দিয়েছে।

গুপ্ত রাজাদের সময় থেকে পাল রাজাদের সময় পর্য্যন্ত উপনিবেশী ব্রাহ্মণদের গঙ্গাতীরে বাস করবার দিকে প্রবল কোন ঝোঁক দেখা যায়নি । গঙ্গার বা অন্য নদীর কাছাকাছি অথচ তীর হতে একটু দূরে তাঁদের উপনিবেশ হত । তার কারণ বোধ হয় বন্যার উপদ্রব । সেন রাজাদের সময়ে বোধ হয় গঙ্গা ও দামোদরের উপদ্রব অনেকটা সংযত হয়েছিল এবং বর্ধমান ডিভিসনের নদী সংস্থান অনেকটা স্থিরত্ব পেয়েছিল । ইতিমধ্যে দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্রাহ্মণমতের প্রভাব জনগণের মনে দৃঢ়তর হয়েছে । তার ফলে গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং গঙ্গাতীরবাসের মর্যাদা বেড়েছে । বোধ করি এই সব কারণে (এবং গমনাগমনের সুবিধার জন্য) গঙ্গাতীরবাসের দিকে ব্রাহ্মণদের বেশি ঝোঁক পড়েছিল। বল্লালসেন অনেক সদাচারী ব্রাহ্মণকে গঙ্গাতীরে বাস করিয়েছিলেন । ব্যারাকপুরে প্রাপ্ত তাঁর তাম্রপট্ট থেকে জানতে পারছি যে রাজমহিষী বিলাসদেবীর তুলাপুরুষ দানের দক্ষিণারূপে ভাটপাড়ায় ("শ্রীপৌন্ডবর্ধনভুক্ত্যন্তাপাতি খাড়ীবিষয়ে ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া গ্রামে") উদয়করদেবশর্ম্মাকে ভূমিদান করেছিলেন । মুসলমান-অধিকার শুরু হবার পরেও একজন রাজা, দনুজমর্দন, একাধিক প্রবীণ ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে গঙ্গাতীরে বাস করিয়েছিলেন ।

রাঢ়ের অনেক পুরানো গ্রামের ঐতিহ্যে প্রাচীন দেবতার স্মৃতি বিজড়িত । সেকালে দেবদ্বিজ নিয়েই ছিল গ্রামের মর্যাদা । দ্বিজের সন্ধান পাই ভূমিদান-পত্রে আর রাঢ়ী বামুনের "গাঁই" নামে যা প্রায়ই পদবীতে পরিণত । অনেক গাঁয়ে দেবতা এখনো আছেন, অনেক গাঁয়ে না থাক্‌লেও নামে বা স্মৃতিতে রয়েছেন, আবার কোন কোন গাঁয়ে স্মৃতিটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে । এমনি লুপ্তস্মৃতি দু-একটি গ্রামের নাম ও গ্রাম্যধিষ্ঠিত দেবতার ছবি মিলেছে অতার্কিতভাবে । নেপালে পাওয়া কয়েকটি অতি প্রাচীন (খ্রী একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে লেখা) বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্রের পুঁথিতে স্থানীয় বৌদ্ধ দেবদেবীর ও পীঠের নাম ও চিত্র আছে । তার মধ্যে রাঢ়ে পাই - কন্যারাম, রামজাত ও বৈত্রবনা গ্রামে লোকনাথ, তাড়িহা গ্রামে তারা, অনুল্লিখিত গ্রামে ধর্মরাজিক চৈত্য, আর লুতু গ্রামে বজ্রাসন । এসব গ্রাম আছে কিনা জানি না । হয়তো কোন কোন গ্রামের সঙ্গে নামে মিলবে । কিন্তু এখনো যেমন তখনো তেমনি একাধিক গ্রামের একই নাম ।

সেকালের অর্থাৎ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ একটি বৌদ্ধবিহার - পান্ডুমান বিহার - বর্ধমান জেলার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে অনুমান হয় । সম্ভবত মেমারির কাছাকাছি পাঁড়ুই গ্রাম নাম এই স্মৃতির রেশ রেখেছে । পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যমান প্রাচীনতম মন্দির আজাপুর দেউলিয়ার দেউল - কোন জৈন অথবা বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ হওয়া সম্ভব ।

দু-একটি প্রাচীন দেবতার খোঁজ যে পাওয়া যায়নি এমন নয় । তুর্কী অভিযানের মুখে সেকালের কোন সমৃদ্ধ দেউল-দেহারা পরিত্রাণ পায়নি । ত্রিবেণীর নিকটে সপ্তগ্রামের কাছাকাছি কোন স্থানে বিরাট দেবমন্দির ছিল, তার কোন চিহ্ন এখন নেই, তবে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে ওখানকার একটি প্রাচীন সমাধিসৌধের গায়ে । পুরানো দেবমন্দিরের গায়ে কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা বর্ণনাময় প্রস্তরচিত্র ছিল । সে পাথরগুলিকে মূর্তি চেঁচে ফেলে দেয়াল গাঁথায় কাজে লাগানো হয়েছিল । মূর্তিগুলির নীচে চিত্র-পরিচয় লেখা ছিল সেগুলি সব চেঁচে ফেলা হয় নি । তার থেকেই বোঝা গেছে যে মন্দির ভেঙ্গে পাথর নেওয়া হয়েছিল । মনে হয় এই মন্দির বিষ্ণু-মন্দির ছিল এবং তাতে আদিবরাহের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল । আরো মনে হয় লক্ষ্মণসেনের প্রধান সভাকবি ধোয়ী তাঁর পবনদূতে সে কথা বলে গিয়েছেন ।

তস্মিন সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাৎ বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ ।

অর্থাৎ - সেখানে সেনবংশভূপতি যেন সাক্ষাৎ কমলাপতি দেব মুরারিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন ।

লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত আদিবরাহের দেবরাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মহাসামন্তচূড়ামণি বটু দাস । এঁর পুত্র শ্রীধর দাস যে কবিতা-সংকলন বইটি করেছিলেন সদুক্তিকর্ণামৃত নামে, তাতে আদিবরাহের সেবক বটু দাসের প্রশংসা আছে । সে প্রশংসা - শ্লোকও সমসাময়িকদের রচনা । তার মধ্যে আর একজন বিখ্যাত কবি মহামন্ত্রী উমাপতি ধর আর একজন ধর্মাধিকরনিক মধু ।

যে গ্রামীণ সংস্কৃতি বাংলা দেশকে অন্যান্য প্রদেশে থেকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করেছিল তার একটা বিশেষ প্রকাশ দেখি গ্রাম্যদেবতার প্রাধান্যে । একদা পশ্চিমবঙ্গে এমন সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল না যেখানে কোন গ্রামদেব বা গ্রামদেবী (অথবা গ্রাম দেব ও দেবী) গ্রামের অধিদেবতা বলে গণ্য না হতেন । এখন এই ব্যাপার শুধু বর্ধমান বিভাগের কোন কোন গ্রামে দেখা যায় । রাঢ়ের গ্রামের অধিদেব ছিলেন ধর্ম্ম (ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্মঠাকুর) আর অধিদেবী ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী যিনি নানাস্থানে নানারূপ নানা নাম ধরে, আছেন - কোথাও কেতকা, কোথাও মনসা বা বিশালাক্ষী। একদা কোথাও চণ্ডী বা ষষ্ঠী কোথাও মনসা বা বিশালাক্ষী। একদা ধর্মরাজই প্রধান গ্রামদেবতা ছিলেন (এবং কোন কোন গ্রামে এখনও আছেন), কেননা তিনি রাজশক্তির প্রতীক । এই প্রসঙ্গে মল্লসারুল তাম্রপট্টের উপরে মহারাজা বিজয়সেনের সীল আছে । সেই সীলে যে মূর্তি আঁকা আছে তাহা ঐতিহাসিকরা বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি বলে মনে করেন । আমি অন্যত্র দেখিয়েছি যে তা নয়, মূর্তি ধর্মের । তাম্রপট্টে প্রথম শ্লোকে এই ধর্মঠাকুরেরই বন্দনা আছে । ধর্মঠাকুরের মূর্তিকে সীল রূপে ব্যবহার করায় এদেশে পরবর্তিকালে ধর্মঠাকুরের প্রভাব প্রতিপত্তির ঐতিহাসিক সমর্থন রয়েছে ।

ধর্মপূজার প্রধান পীঠস্থান বর্ধমান জেলা যার মাঝখান দিয়ে দামোদরের প্রাচীন ও নবীন খাতগুলি বয়ে গিয়েছে । ধর্মঠাকুরের উপাসকদের কাছে দামোদরের মহাত্ম্য গঙ্গারও বাড়া । তাঁরা বলেছেন, "সত্যের গঙ্গা দামোদর", "আদ্যের গঙ্গা দামোদর" । ধর্মপ্রজার ঐতিহ্যে যে বল্লুকা নদীর কথা পাই সে তা দামোদরেরই প্রাচীন খাত । এই প্রাচীন খাতের উপরেই হাজার বছর আগেকার বর্ধমান শহর ছিল । ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন অনুসরণ করে সে বর্ধমান শহর এখন বড়োয়াঁ গ্রামে পরিণত । এইখানে প্রাচীন বল্লুকানদীরতীরে ধর্মঠাকুরের বিখ্যাত মন্দির ছিল । এই স্থানকে লক্ষ্য করেই ধর্মঠাকুরের উপাসকেরা বলে গেছেন,

বর্ধমান দেশ ভাই সবাকার নাভি ।

ধর্মঠাকুরের কামিনী কেতকা-মনসারও প্রধান পীঠস্থান বর্ধমান । আমি চম্পাইনগর কসবার কথা তুলছি না । চাঁদো-বেহুলার স্মৃতিকল্পনা বাংলা-বিহার-আসামের অনেক স্থানেই জাগাবার চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু সব মনসামঙ্গল কাব্যেই বেহুলার ভাসানের যে যাত্রাপথ বলা হয়েছে তা দামোদরেরই পুরানো খাত অনুসরণে । স্থানে স্থানে এই খাত-পরম্পরার বিভিন্ন নাম-খড়ি, বাঁকা (বাঁকা

দামোদর), ভালকো (বল্লুকা) বেউলো (বল্লুকার রূপান্তর) ইত্যাদি । লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে বাঁকাভালকোর উপরে অথবা আশপাশেই মনসাপূজার আধুনিক পীঠস্থানগুলি অবস্থিত । যেমন- কেজ্যা, মন্ডলগ্রাম, হাসনহাটি, নারিকেল ডাঙ্গা ইত্যাদি । এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে এখনও মনসার (জগৎগৌরী নামে) পূজা গ্রামের প্রধান উৎসব রূপে গা মনসার ঝাঁপান বর্ধমান জেলার প্রায় সর্বত্র একটি প্রধান গ্রাম-উৎসব ছিল । দেড়শ দুশ বছর আগেকার একটি ঝাঁপান মেলার বর্ণনা আছে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীতে । জৌগ্রামের কাছে এই ঝাঁপান মেলা বস্‌ত । হাওড়া বর্ধমান রেলপথে এইখানে কিছুদিন আগে স্টেশন খোলা হয়েছে, তার নাম ঝাঁপান-ডাঙ্গা । সুপ্ত স্মৃতি গ্রামের নাম নিয়ে বেঁচে ছিল, এখন টাইমটেবিলে উঠে স্থায়ী হল । চিরস্থায়ী বলতে ভরসা হয় না, যে গতিতে এখন ঘনঘন স্থাননাম বদলাচ্ছে ।

রাঢ়ের প্রাচীন স্থাননামে পুরানো দেবতার স্মৃতি ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে এখন বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে । ইঁদাস নাম ধরে এখন কে ইন্দ্রাবাসে পৌঁছবে ভাষাতাত্ত্বিক ছাড়া ? ধর্মের দেহারা ছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছিল ধর্মাবাস", এখন হয়েছে ধামাস । নামটি থেকে এখন ধাম মনে পড়ে, ধর্ম নয় ।

গ্রামদেবদেবী ও তাঁদের বাৎসরিক ও সাময়িক উৎসবের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করেই এ দেশের লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল । ধর্মের গাজন, মনসার ঝাঁপান, চন্ডীর ব্রত, শিবের চড়ক- এই সব উৎসব উপলক্ষ্যে সেকালে যাত্রা নাটগীত হত এবং তাতে গ্রামে সর্বসাধারণের সমান অধিকার থাকত। যাঁরা নাটগীত করতেন তাঁরা বন্দনায় স্থানীয় দেবদেবীর উদ্দেশে নতি জানাতেন । যে গ্রামে গাওনা হত সে গ্রামের দেবতাকে অবশ্যই বন্দনা করতে হত, যেখানে গান হত সেখানের ঠাকুরকে তো বটেই । গায়কদের নানা স্থানে গাওনায় যেতে হত, তাই তাঁদের বাঁধাবন্দনা-পালায় দেশের প্রায় সব জাগ্রত স্থানীয় দেবদেবীর নামমালা গাঁথা থাকত । একে বলা হত দিক্‌বন্দনা । প্রাচীন পুথির দিগ বন্দনা থেকে লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় দেবদেবীর পরিচয় সূত্র এবং তা অনুসরণ করে ইতিহাসের বস্তু উদ্ধার করা এখনো সম্ভব ।

আমাদের সেকালের কবি গায়কদের দিগবন্দনায় মুসলমান পীরও উপেক্ষিত হন নি । বাংলা দেশের দুটি প্রাচীন ও প্রধান পীরস্থান এই রাঢ় দেশেই । একটি পান্ডুয়ায় সুফীখাঁর দরগা আর একটি আরামবাগে পীর ইস্‌মাইলের দরগা । আগে আরও কিছু দরগা ছিল, তার মধ্যে একটি শিলিমপুরে বাবা খাঁর দরগা । বলা বাহুল্য দরগাগুলি সব সমাধিস্থান ।

দিক্‌বন্দনার কিছু নমুনা দিই ।

বর্ধমানে বন্দো দেবী সর্বমঙ্গলা
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা।
মাথায় মল্লিকা চাঁপা সাজানো প্রচুর
আদ্যের দেহারা মায়ের বন্দো বিক্রমপুর ।
রাজবলহাটে বন্দো শ্রীরাজবল্লভী
গায়ের বরণ যেন বৈকালের রবি ।
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি
আম্বুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী ।

কালীঘাটের কালী বন্দো বেতাতে বেতাই
একমন হয়ে বন্দো আমতার মেলাই।
বন্দনা বন্দিতে ভাই না করিহ হেলা
জুঝাটির ধর্ম বন্দো খাজুরের তলা।
বন্দিব বড়খাঁ গাজী রিসিবাটি গাঁ
নিজবাটি বন্দিব পেঁড়োর শুতি গাঁ
ত্রিপিনির ঘাটে বন্দো দফর গাঁ গাজী
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয় কাজী।
জাড়গ্রামের কালুরায় বন্দো সাবধান
গবপুরে বন্দো বাপা স্বরূপনারায়ণ।
রামনাম স্মঙরণে উদ্ধার হয় জীব
জোড়হাতে বন্দ্যা গাইব তাড়েশ্বরের শিব।
কোটশিমুলে বন্দি গাইব ঘোড়া সহিদ পীর
যার নাম স্মরণে রণে হয় বীর!
গোতানের বটেশ্বরীর বন্দিনু চরণ
অগ্নিমুখা হব বন্দো বাসা পলাশন।
কামালপুরে বন্দিয়া গাইব চন্দ্রমুখী
জলের ভিতরে দেবী জলে ধিকি ধিকি।
পীর পাগাম্বর বন্দো আছে যতগুলি
মান্দারন গড়েতে বন্দিব পীরিসমালি।

স্থানীয় দেবদেবীর এই নামাবলী কীর্ত্তন রাঢ়ের ধর্মমঙ্গল চন্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল গায়ক-কবিদের এক বিশিষ্টতা। ধর্মমঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি দুজনই-রূপরাম চক্রবর্তী ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দক্ষিণ-রাঢ়ের এবং বর্ধমান জেলার লোক।

কোন কোন গ্রামবেতার পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার লুকিয়ে আছে যা ভালো ভাবে অনুসন্ধান করলে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কিছু সমস্যা পূরণ করতে পারে। ক্ষীরগ্রামের দেবী খুব প্রাচীন। এখানে যে প্রাচীন মন্দির ছিল তার যৎকিঞ্চিৎ ধংসাবশেষ মাত্র আছে। সম্প্রতি নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে ক্ষীরগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য বর্ণনা উপলক্ষ্যে যোগাদ্যার পূজাবিষয়ে লিখেছেন - "অদ্যাপি ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যাবাটীতে প্রতি সংক্রান্তির সন্ধ্যায় দেবীর আরতির পর একটি অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে বলে গুয়া ডাকা। মন্দিরের দক্ষিণপশ্চিমস্থ একটি ক্ষুদ্র বেদীতে ঘট স্থাপন করিয়া পুরোহিতের ও যুগাদ্যাবাটীর ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর (দারোগা) সাক্ষাতে মালাকর পান ও সুপারি লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্লুতস্বরে ডাকে- "ফোপল মশায়ের গুয়ো" "ভরতদত্ত শাশমল্লের গুয়ো" "নাসগাঁয়ের আগুরি কেউ আছো" এই রূপে কুসুমগ্রাম, এড়োর ও মাঝগাঁয়ের আগুরিদের আহ্বান হয়। "এমনিভাবে আহ্বান করে পান সুপারি দেওয়া সেকালের সম্ভ্রান্তসভায় সম্মান দেখাবার এক পদ্ধতি ছিল। কাউকে কোন গুরু কার্য্যের ভার দিতে হলে তার হাতে

পান-সুপারি দেওয়া হত । তাই চন্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেবতা যখন হনুমানকে রাতারাতি দেউল তুলে দিতে আদেশ করছেন তখন তাকে পান বা পান-সুপারি দিচ্ছেন । যে সব ব্যক্তির বা পদের নাম করা হয় তাঁরা একদা পূজা অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন । আশে পাশে গ্রামের অগ্রহার-ভোগীদেরও কাজের ভার দেওয়া হত । এবং সেইজন্যে সম্মান দেখানো হত । এখন কাজও নেই - আছে গুয়া ডাকা, এখন তার অর্থও কিছু নেই ।

যোগাদ্যার বৎসরিক পূজায় একদা নরবলি দেওয়া হত । বৈশাখ মাসে বা তার আগে গাঁয়ে কোন অজানা অতিথি বা বেগানা লোক এলে খুব আদর যত্ন করে রেখে দেওয়া হত । সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা হত "মেরেয়া" অর্থাৎ নরবলির পশু । শুনেছি ক্ষীরগ্রামে বৈশাখ মাসে আত্মীয় কুটুম্ব বা অতিথি এলে যেতে দেওয়া হয় না । এ ব্যবহারে মেরেয়ারই স্মৃতিরেশ কালোচিত পরিবর্তন পেয়েছে ।

ক্ষীরগ্রামের নিকটস্থ মাঝিগ্রামেও একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হয় গ্রামদেবতার বার্ষিক অনুষ্ঠানে । এখানে প্রধান গ্রামদেব "দেউল-ঠাকুর" অর্থাৎ ধর্ম । এখন ভাঙ্গা দেউলের স্তূপের উপর বিরাজ করে এই নাম সার্থক করেছেন । প্রধান গ্রামদেবী শাকম্ভরী - আসলে মনসা । এখানকার বার্ষিক পূজার মধ্যে একটা প্রধান অনুষ্ঠান হচ্ছে দেব-দেবীর বিবাহ । সে বিবাহ অনুষ্ঠান অর্ধপথেই রয়ে যায়। এর মধ্যে কী যে ইতিহাস লুকোনো আছে বুঝতে পারি না । গভীর রহস্যও থাকতে পারে ।

কিছুকাল আগে আউসগ্রাম অঞ্চলে "পান্ডুরাজার ঢিবি" খুঁড়ে সেখানে মানব নিবাসের খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বলে শুনেছি । আরও শুনেছি পানাগড়ের অতিদূরে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । এও শোনা কথা । তাই কিছু বলতে পারা গেল না ।

[বর্ধমান সম্মিলনী 'হীরকজয়ন্তী স্মরণিকা' (১৯৭৩) থেকে প্রবন্ধটি লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত হলো]

বর্ধমান দর্শন : ভূতাত্ত্বিকের চোখে

বিকাশ রায়

প্রকৃতি ভূগোলের সীমা মানে না। সাা পৃথিবী জুড়ে যে সৃষ্টির লীলা চলছে তারই একটা অংশ আমরা বর্ধমান জেলার মধ্যে দেখতে পাই। ভারতবর্ষের মানচিত্রে বর্ধমান জেলার সীমারেখা প্রায় পূর্বপ্রান্তে হলেও গঠনের দিক থেকে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে এর অবস্থান। বর্দ্ধমান জেলা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১৮ মিটার (দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে) থেকে প্রায় ১২৫ মিটার (উত্তর পশ্চিম প্রান্তে) উঁচুতে বিরাজমান। অর্থাৎ বর্ধমান জেলার ঢাল উত্তর পশ্চিম (চিত্তরঞ্জন / বরাকর) থেকে দক্ষিণপূর্বে (কালনা / মোলানপুর)। উত্তর প্রান্তে দিয়ে অজয় নদী এবং দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে দামোদর নদ প্রবাহিত। এছাড়া এই দুই প্রধান জলধারার শাখা বা উপনদী কুনুর, খড়ি, বাঁকা, বেহুলা, দেবখাল প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন জায়গা দিয়ে বয়ে চলেছে। সব নদী বা উপনদী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ভাগীরথী নদীতে মিশে বয়ে চলেছে।

বর্ধমান জেলার মোটামুটি দুই রূপ। উত্তর পশ্চিম প্রান্ত পাথুরে অঞ্চল। মাটির ঢাকনা সরে গিয়ে অপাবৃত পাথরের ছোট বড় টিবি বা ছোট ছোট পাহাড়ের আকারে বিরাজমান। এই রূপ প্রধানত দুর্গাপুর পর্যন্ত দেখা যায়। তারপর থেকে কালনা, উচালন, মোলানপুর পর্যন্ত শুধু মাটি পুরানো এবং নূতন মাটি দিয়ে গড়া প্রায় সমতল ভূমি। বর্ধমান জেলার স্তরায়ণতত্ত্ব মোটামুটি ভাবে গ্রানিটযুক্ত আর্কিয়ান শিলা (বয়স ২৫০ কোটি বছর প্রায়), কয়লাযুক্ত গন্ডোয়ানা শিলা (৩৫ থেকে ২৯ কোটি বছর), নুড়ি ও বালির স্তর (৮ থেকে ১ কোটি বছর), ল্যাটেরাইট বা লাল মাটি কাঁকড় (দশ লক্ষ বছর) এবং পুরানো মাটি (সাড়ে পাঁচ হাজার বছর) ও নুতন মাটি (৮৫০ বছর থেকে আজ পর্যন্ত)। উত্তর পশ্চিম প্রান্তে গ্রানাইট যুক্ত পাথর ছাড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে কয়লাযুক্ত গন্ডোয়ানা শিলা বা অঙ্গার যুগের শিলা। অঙ্গার যুগের সূচনা হল এক ব্যাপক আলোড়নের মধ্যে দিয়ে। এই আলোড়নের উৎস তরলিত ভূসভ। এই আলোড়নের ফলে কয়েকটি বড়ো বড়ো ফাটল সৃষ্টি হল এবং ফাটলের দরুণ রচিত হল কয়েকটি বিস্তীর্ণ গহ্বর। জলে ভরে গেল এই সব গহ্বর এবং ফলে সৃষ্টি হল কয়েকটি হ্রদের।

এই সব হ্রদের মধ্যে স্তরে স্তরে জমতে থাকে নদীবাহিত বালি, কাদা ও গাছপালার অবশেষ। এহেন ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে পলি সঞ্চয়কে 'গন্ডোয়ানা'র শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং এই অঞ্চল সমেত এই পলিযুক্ত সমগ্র পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হয় "গন্ডোয়ানাল্যান্ড"। গন্ডোয়ানা শিলাস্তরগুলির একেবারে নীচে বরফের স্বাক্ষর আছে। অর্থাৎ প্রায় উনত্রিশ কোটি বছর আগে প্রথম পলি সঞ্চয়ের সময় সমস্ত গন্ডোয়ানাল্যান্ড ছিল তুষারে আচ্ছন্ন - অনেক জায়গায় স্তূপীকৃত বরফ হিমবাহের মত প্রবাহিত হয়েছিল। হিমবাহের স্বাক্ষর আছে একেবারে নীচের পলির মধ্যে জমা পাথরের কুচির গায়ে। তুষার শীতল পরিবেশের মধ্যে সঞ্চিত পলির মধ্যে জল বা বাতাসের ক্রিয়ায় উদ্ভূত রাসায়নিক ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। পাশ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রানিট থেকে বিশ্লিষ্ট ফেল্‌সপার প্রায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়েছে এই পলির স্তরে।

তুষারযুগের অবসানে বরফ গলে অসংখ্য নদীনালা সৃষ্টি করে এবং গন্ডোয়ানা অঞ্চলের হ্রদগুলো জলে ভরে ওঠে কানায় কানায়। হ্রদে চলে পলির সঞ্চয়। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে বালি ও কাদা। বালি ও কাদা, কাদা ও বালির পর জলের স্রোতে ভেসে আসতে থাকে গাছপালার অবশেষ। ঘন বনে আচ্ছন্ন ছিল সমস্ত গন্ডোয়ানা

অঞ্চল। নদীনালার স্রোতের বেগে অথবা বন্যার জলের তোড়ে গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে বাহিত হয় জলের ধারায়। জলের স্রোতের ক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট হয়ে তারা হ্রদের মধ্যে জমতে থাকে। হ্রদের মধ্যে বালি ও কাদার স্তরের সঙ্গে জমাট বাঁধে গাছের পাতা, ডালপালা ও গুঁড়ির ভগ্নাংশ। অক্সিজেন এর সহযোগিতা থাকলে রাসায়নিক ক্রিয়া বিনাশ কে করে ত্বরান্বিত। কিন্তু জলের মধ্যে অক্সিজেন তেমন সক্রিয় নয়। কাজেই জলে সঞ্চিত উদ্ভিদদের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন অতি ধীরে, অতি সুক্ষ্মভাবে চলতে থাকে। গাছের পাতা, ডালপালা, মূল ও কান্ড সব একাকার হয়ে যায়। পাতা থেকে মুছে যায় তার সবুজ রঙ, মূল ও কান্ডের মূল উপাদানগুলির ভারসাম্য হারিয়ে যায়। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় উপাদানগুলি ক্রমশঃ উবে গিয়ে অঙ্গারকে মুক্তি দেয়। অঙ্গার স্থিতিশীল, কিন্তু বায়বীয় ও জলীয় উপাদান খোঁজে বস্তুর সীমা থেকে মুক্তি। অঙ্গারকে ঘিরে থাকা বায়বীয় উপাদানের আবরণ উন্মোচিত হয়। এই উন্মোচনকে প্রেরণা দেয় অঙ্গার (পীট) = এর উপর জমতে থাকা বালি ও কাদা মাটির চাপ। চাপ থেকে তাপের সৃষ্টি হয় ভূগর্ভের তাপের সঙ্গে তা যুক্ত হয়ে বাষ্পীয় বা বায়বীয় উপাদানগুলিকে উবে যেতে সাহায্য করে। এমনি করে অঙ্গার ক্রমশঃ ব্যক্ত ও মুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে পীট থেকে লিগনাইট (অর্ধপরিণত কয়লা) জাতীয় কয়লার। তারপর আরও চাপ এবং তাপ বাড়তে থাকায় লিগনাইট ক্রমশঃ পরিণত হয় 'বিটুমিনাস' বা সাধারণ কয়লায় । কয়লায় পূর্ণতম পরিণতি ঘটে অ্যানথ্রাসাইট জাতীয় কয়লার মধ্যে এবং তা ঘটে অনুরূপ ভাবে চাপ ও তাপ বাড়ার মধ্য দিয়ে। গন্ডোয়ানা অঞ্চলে সঞ্চিত গাছপালার অবশেষ কয়লার স্তরে রূপান্তরিত হতে কত কোটি বছর সময় লেগেছিল তা জানা কঠিন। কারণ উদ্ভিদের স্তরের কয়লার স্তরে রূপান্তরের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় অনুকরণ কোন গবেষণাগারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া যে ঘটনা ঘটতে কোটি কোটি বছর লেগে যায় সে ঘটনাকে পরীক্ষামূলকভাবে ঘটানোর প্রয়াস কোন বিজ্ঞানীই করতে পারেন না। রাণীগঞ্জ আসানসোল ও তার চারপাশের অঞ্চল জুড়ে একটা সমুদ্রোপম বিস্তীর্ণ হ্রদের মধ্যে স্তরে স্তরে জমছিল যে পলি ও উদ্ভিদের স্তর তা কালক্রমে জমাট বেঁধেছিল বেলেপাথর, কাদাপাথর ও কয়লায় এবং তাদের সৃষ্টি হতে প্রায় কুড়ি পঁচিশ কোটি বছর লেগে গিয়েছিল। তাদের একেবারে নীচের দিকে তুষারের চিহ্নযুক্ত অঙ্গারহীন বেলেপাথর, কাদাপাথর ও শিলা খন্ড যুক্ত কাদা পাথরের স্তর আছে।

তারপর প্যালিওজোয়িক (এখন থেকে ঊনত্রিশ কোটি বছর) অধিকল্প বা 'এরা অবস্থান হয়ে শুরু হয়েছে মেসোজোয়িক অধিকল্প (প্রায় আঠারো কোটি বছর এর মেয়াদ)। গন্ডোয়ানা হ্রদে পলি জমার পালা চলে এখন থেকে চৌদ্দ কোটি বছর আগে পর্যন্ত। উদ্ভিদ সঞ্চয়ের পালা শেষ হবার পরও বিস্তৃর্ণ পলি যে কি বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হয়েছিল তা আমরা পাশেই পাঞ্চেৎ ও বিহারীনাথ পাহাড়ে গেলে দেখতে পাই। গন্ডোয়ানা হ্রদে পলি জমতে শুরু করেছিল প্রায় ঊনত্রিশ কোটি বছর আগে হ্রদ শুকিয়ে গেল আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ একটানা প্রায় উনিশ কোটি বছর ধরে চলেছিল গন্ডোয়ানার পলি ও উদ্ভিজ্জের সঞ্চয়। সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে জমাট বাঁধার পালা চাপ ও তাপের ক্রিয়ায়। অবশেষে গন্ডোয়ানা হ্রদ যখন শুকিয়ে যাবার উপক্রম হল, তখন প্রবল আলোড়নে বিক্ষুদ্ধ হল গন্ডোয়ানার স্তরগুলি এবং শুরু হল ভূগর্ভস্থ তরলিত ম্যাগমার (তেরলিত শিলাপুঞ্জ) আত্মপ্রকাশ আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়ে। কয়লা ও সংশ্লিষ্ট শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে এই ম্যাগমা জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলার আকার নিয়েছে। রাণীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রে কয়লা ও তার সঙ্গে স্তরীভূত শিল্পকে বিদীর্ণ করে বিরাজ করছে ডলারাইট,

মাইকাপেরিজোইট বা ল্যাম্প্রোফায়ার নামক আগ্নেয় শিলা। এই সব আগ্নেয় শিলা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদগারের রন্ধ্রপথগুলিতে জমাট বেঁধে আছে। ক্রিটেশাস (১৪ কোটি বছর পূর্ববর্তী যুগ) যুগে সংঘটিত এই আগ্নেয় শিলার সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটল মেসোজোয়িক অধিকল্পের।

তারপর শুরু হল নতুন অধিকল্প, যার নাম ট্যার্শারি (আট থেকে এক কোটি বছর পর্যন্ত এই অধিকল্পের বিস্তার)। বর্দ্ধমান জেলায় এই অধিকল্পের ওপরের দিকের কিছু শিলাস্তরে আংশিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে আছে। তাদের অধিকাংশই নুড়ি ও বালির স্তর। এই অধিকল্পের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুরো অঞ্চল জুড়ে পলি, বালিমাটি সব জমা যেন বন্ধ হয়ে গেল এবং শুরু হোল অবক্ষয়ের পালা। তাপ এই অঞ্চলে বাড়তে আরম্ভ করলো। পৃষ্টস্থলগুলো পুড়ে লাল হয়ে গেল। যদিও এই কার্যক্রমের বয়স সঠিক জানা যায় না তবুও মোটমুটিভাবে ধরা যায় দশলাখ বছর আগে। বর্ধমান জেলার অনেকাংশে এর স্বাক্ষর এখন দেখা যায়, বাঁকুড়ার সাথে লাগা জায়গাগুলো, গন্ডোয়ানার পৃষ্ঠস্থলগুলো, মানকর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল এবং ঝাড়গ্রামে গেলেই দেখা যায়।

বর্ধমান জেলার যে দুটি রূপের কথা বলা হয়েছিল তার অপরটি দক্ষিণপূর্বপ্রান্ত এই ট্যার্শারী অধিকল্পে বঙ্গোপসাগরের জলে নিমজ্জিত। নুড়ি ও বালিতে তখন ভরে উঠছে আর সমুদ্র যেন আস্তে আস্তে পিছিয়ে চলেছে। গভীর নলকূপ করতে গিয়ে অনেকেই এই নুড়ি বালির সন্ধান পেয়েছেন জেলার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের বিভিন্ন জায়গায়। এই সামান্য জমাট বাঁধা নুড়ি, বালি ও কাদার স্তর বিরাজ করছে এই সব প্রান্তে আর তাদের ওপড়ে পড়েছে মৃত্তিকার প্রলেপ। এই মৃত্তিকা বয়ে নিয়ে এসেছে নদী। এখানে বঙ্গভূমির উৎপত্তি একটু বলে নেওয়া ভাল। প্রায় সারে পাঁচ হাজার বছর আগে গঙ্গা ও পদ্মার অববাহিকা অর্থাৎ গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল ছিল বঙ্গোপসাগরের আওতায়। তখন রাঢ়ের মালভূমি (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান মেদিনীপুর), রাজমহল পাহাড় ও শ্রীহট্টের পাহাড়ী অঞ্চল ছুঁয়ে যেত বঙ্গোপসাগরের জল।

হিমালয় পর্বত থেকে নেমে উত্তর ভারতের সমতলভূমি ধুয়ে গঙ্গা নদীর জলের ধারা সমুদ্রের বিপুল জলরাশিতে লীন হত তার সাথে সাথে চলতো অবক্ষয় ও সঞ্চয়ের পালা। হিমালয় থেকে বিশ্লিষ্ট শিলা চূর্ণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল নদী খাতে অবক্ষয় জাত বালি ও মৃত্তিকা কণা। নদীর জলের ক্ষুরধারায় তারা সূক্ষ্মতর কণায় পরিণত হত। যাকে বলে 'পলি মাটি' , জলের ধারায় জলের মতই তরলিত হয়ে বাহিত হত সমুদ্র অভিমুখে । সমতল ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে স্তিমিত হত নদীর বেগের আবেগ। তারপর শুরু হত পলিমাটির সঞ্চয়। নদীখাত বেয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমিত, কেবলমাত্র স্থূলতর শিলাচূর্ণ বা বালি ও পলির কণা নদীর স্তিমিত স্রোতের সুযোগ নিয়ে জমতে থাকত। সূক্ষ্মবালি বা পলির কণা নদী সমুদ্র মোহনা পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত জলের ধারার সঙ্গেই মিশে থাকত। নদী সমুদ্রে লীন হওয়ার পর শুরু হত তাদের সঞ্চয়। সমুদ্রের অগাধ জলরাশির অন্তরালে এর সঞ্চয় বহু শতাব্দী ধরে চলে। তারপর ধীরে ধীরে জলে মধ্যে থেকে মাথাচারা দিয়ে উঠেছিল এই বিশাল ব-দ্বীপ, যার নাম দেওয়া হয় বঙ্গভূমি। নদী থেকে উৎপন্ন কাজেই বঙ্গভূমি সত্যিকারেই নদীমাতৃক দেশ। জলের মধ্য থেকে তার উত্থানের পরও সৃষ্টির পালা শেষ হয়নি। নদীখাত বেয়ে পলিমাটির সঞ্চয় চলতেই থাকে বলে নদীখাতের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসে। পুরানো খাত ভরাট হয়ে গিয়ে নতুন খাত সৃষ্টি হয় এবং নদীর ধারার মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়।

বর্ধমান জেলার বেশ কিছুটা অংশ অনুরূপ ভাবে এবং ছোট নাগপুরের মালভূমি বা মালভূমি সন্নিহিত উঁচু ভূমিতে উৎপন্ন অজয় ও দামোদরের জলধারায় নিয়ে আসা অবক্ষয় জাত বালি ও মৃত্তিকা কণায় গড়ে উঠেছে। ভাগীরথী ও হুগলীর পশ্চিম তীরে দামোদর ও অজয় নদীর অববাহিকা বা রাঢ়ভূমির অংশ বিশেষ। এখানে ঘটেছে মাটির প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন পলিমাটির সাদাটে ধুসর রঙ এখানে বাদামী রক্তাভায় রূপান্তরিত। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার লোহাযুক্ত ল্যাটেরাইট এবং রকমারি শিলার স্তর থেকে বিযুক্ত লোহা এখানকার মাটিতে এসে মিশেছে। লোহার প্রলেপ মাখানো পলি মাটির পাশাপাশি রয়েছে পাথরের স্তরের অবক্ষয় জাত রুক্ষ বেলে মাটি। বর্ধমান জেলার নদীগুলি বর্ষায় কিছুটা উত্তাল হয়ে উঠলেও তাদের মধ্যে তেমন উদ্দাম আবেগ নেই যা তাদের নির্দিষ্ট খাত থেকে বিচ্যুত করতে পার। তার সাথে পড়েছে মানুষের হাত যা তাদের নির্দিষ্ট খাতে বাঁধতে চেষ্টা চলছে।

নদীগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জেলার গ্রাম, শহর ও কৃষিকর্মের ক্রমবিকাশ। কাজেই নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে সঞ্চয় করতে হবে নুতন প্রাণের আবেগ। যে সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নদীর অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকারক তাদের ভাল ভাবে নিয়ন্ত্রণ দরকার।

গ্রন্থপঞ্জী : কৃষ্ণাণ এস (১৯৬৮) ভারতবর্ষ এবং বর্মার ভূতত্ত্ব

: সঙ্কর্ষণ রায় (১৯৭৯) ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা

: গোপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩৭৭) ভূবৈজ্ঞানিক পরিভাষা

E. H. Pascoe (1914) Petroleum Occurences of Assam and Bengal.

সংযোজন :

বর্ধমানের নদনদী

বর্ধমান জেলার নদ্‌নদী : ভাগীরথী, দামোদর, বরাকর, মুন্ডেশ্বরী, বাঁকা, বেহুলা, গাঙ্গুর, কানা, কানা দামোদর, অজয়, কুনুর, খড়গেশ্বরী, ব্রাহ্মণী, দ্বারকেশ্বর, শিবা, খুদিয়া, নুনিয়া, বাবলা, তমলা, সিঙ্গারণ, চাঁদা, খন্ডেশ্বরী, গৌরী, দেবখাল, ইলসরা, ঘিয়া, হরিণখালি, কামাখ্যা খাল, সাইনী, পাঠাননালা, ভনওয়ারখাল, কুন্তি, কামালের খাল, কাঁটাখাল প্রভৃতি। এ ছাড়াও অসংখ্য খাল বা কাঁদর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এই নদনদীগুলির মধ্যে দামোদর অত্যন্ত প্রাচীন নদ এবং বাকি অধিকাংশই হল বর্ষাতি নদনদী। নদী-বিজ্ঞানীদের মতে দামোদর ভাগীরথীর থেকেও প্রাচীন। অতীতে খড়ির প্রবাহ ধরে দামোদর কাটোয়ার পথে প্রবাহিত হত এবং কালনা, ত্রিবেণী ও উলুবেড়িয়ার ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হত। সব প্রাচীন নদনদীর মতই দামোদর বারংবার তার প্রবাহপথ বদলে নিয়েছে। দামোদরের নিম্নপ্রবাহে অর্থাৎ সমভূমিতে এর ঢালের গড় কিলোমিটার প্রতি ৮ ইঞ্চি এবং এই অসম অনুপাতে ঢালের কারণে দামোদর বারবার তার গতিপথ পালটেছে। বেহুলা, বাঁকা, গাঙ্গুর, খড়গেশ্বরী প্রভৃতি শাখাগুলি দামোদরের মূলধারা থেকে অনেকদিন হোল বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দামোদরের প্রাচীন ধারা, উইলিয়ম উইলকক্সের মতে, একদা বর্ধমান পেরিয়ে ২৪ পরগনা ও যশোরের পথে বঙ্গোপসাগরে পতিত হত। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখী ধারা প্রাচীন দামোদরকে দুভাগে বিভক্ত করে দেয় পূর্বভাগ যমুনা এবং পশ্চিমভাগের নাম গাঙ্গুর-

বেহুলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই পথে এখনও প্রচুর ছোট ছোট নদীখাতের সন্ধান পেয়েছেন নদী বিজ্ঞানীরা।

বর্ধমান জেলার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে গেলে আমাদের এইসব নদনদী বিশেষতঃ দামোদরের প্রবাহপথ ধরে এগোতে হবে কারণ প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল নদনদীর তীরবর্ত্তী ভূমিতেই। এখনও পর্যন্ত এজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে উৎখননের ফলে যে সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সবকটিই বিভিন্ন নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। দামোদরের তীরে বীরভানপুর ও ভরতপুর, অজয়ের তীরে পান্ডুরাজার ঢিবি, কুনুরের তীরে মঙ্গলকোট কয়েকটি উদাহরণমাত্র।

উল্লেখ ঃ 'বর্ধমানের নদনদী' – যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, 'বর্ধমান হেরিটেজ' এর সিম্পোসিয়াম এর সুভেনির-এ (১৯৮৯) প্রকাশিত প্রবন্ধ ।।

বর্ধমান রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত

নীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

১৬৫৭ থেকে ১৯৫৫ প্রায় তিনশ বছর বর্ধমানের ইতিহাসের সঙ্গে বর্ধমানের রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত একাকার হয়ে আছে। এই সময়কালের ইতিহাস আর রাজ-পরিবারের ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। কিভাবে রাঢ়বাংলার মধ্যমণি বর্ধমানে একটি জমিদারী বংশ প্রতিষ্ঠা পেল এবং ইতিহাসের নানা উত্থানপতনের মধ্যে সুদীর্ঘ তিনশ বছর টিকে রইল সে ইতিহাস কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এখানে সংক্ষেপে সে কাহিনী আমরা জেনে নেব।

সূচনাপর্ব : বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষদের প্রথম যিনি সুদূর লাহোরের কোটলা মহল্লা থেকে এসে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে দক্ষিণপূর্ব কোণে বৈকুণ্ঠপুর বেলেরা অঞ্চলে, অধুনা-লুপ্ত বল্লুকা নদীর তীরে স্থিত হলেন তাঁর নাম সঙ্গম রায় (রাই)। তিনি তীর্থ করতে পুরীধামে এসেছিলেন, ফেরার পথে বর্ধমানে এসে এতদঞ্চলের বাণিজ্যের সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হলেন। তখন নিকটস্থ দামোদর নদে বজরা, নৌকায় সাজানো পণ্যের সম্ভার। তদুপরি বর্ধমানের উর্বর জমি তাঁকে টানল। সে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা। ১৬১০ সালে তিনি এসেছিলেন। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা ছিল সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকেই শুধু নয় —"... Bengal was economically, perhaps the most flourishing province in the whole of India ... Almost every year a large number of Persians, Abyssians, Arabs, Chinese, Turks, Moors, Jews, Georgians, Armenians and merchants from some other parts of Asia poured in Bengal" (R. C. Mazumdar, History of the Freedom Movement in India, Vol. – 1) সঙ্গম রায়ও থেকে গেলেন। ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগী হলেন।

আবুরাম ও বাবুরাম : সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়, তদীয় পুত্র আবুরাম রায়ের আমলে এই পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেল। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রেরিত বাংলার সুবেদার কুতুবউদ্দীনের সঙ্গে বর্ধমানের বিদ্রোহী ফৌজদার শের আফগানের যুদ্ধ। এ হল ১৬১৪ সালের ঘটনা। যুদ্ধ শের আফগানের পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটে শের আফগান পত্নী মেহেরউন্নিসা দিল্লীর সম্রাজ্ঞীপদে আসীনা হন নূরজাহান রূপে। ইতিহাসের এ এক করুণ কাহিনী। শের আফগানের সমাধি বর্ধমানের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান এখন ইতিহাসের মূক সাক্ষীরূপে।

আবুরাম রায় বর্ধমানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। তাঁর সময়ে সম্রাট শাহজাহানের মোগলবাহিনী পূর্ববাঙলায় বিদ্রোহদমনের উদ্দেশ্যে বর্ধমানের পথে ঢাকা যাত্রার পথে এখানে ছাউনী ফেলেন। মোগলবাহিনীর রসদে টান পড়লে আবুরাম রসদ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। এই সহায়তার জন্য মোগল সম্রাট ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বর্ধমান রেকাবী বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। পরিবর্তিত হলো বংশের ধারা বণিক থেকে রাজকর্মচারী রূপে।

[ঘোড়সওয়ারের ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদির বাজার কে রেকাবী বাজার বলা হোত। বর্তমানে যেখানে নূতনগঞ্জ বাজার ?]

আবুরাম রায়েব পুত্র কিষাণবাবু, বাবুরাম নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে তিনি লক্ষ টাকার বিনিময়ে বর্ধমান এবং ইব্রাহিমপুর আদি তিনটি পরগণার জমিদারী পেলেন। সূচনা হলো জমিদারী এস্টেটের।

জমিদারী পর্ব : বাবুরাম রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় পিতার এস্টেটের উত্তরাধিকারী হলেন। তাঁর কাটানো শ্যামসায়র আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ঘনশ্যামের পুত্র কৃষ্ণরাম রায়। কৃষ্ণসায়র তাঁরই কাটানো, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে কৃষ্ণরাম সমগ্র বর্ধমান পরগণার জমিদার ও চৌধুরী হলেন। শের আফগানের বিদ্রোহের পর মোগল সম্রাট-রা এই প্রদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করে স্থানীয় শাসকের হাতে জমিদারীর ভার অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখন হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছে। ঔবঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। এই সুযোগে চিতুয়া, বরদার (বর্তমানে মেদিনীপুরের অন্তর্গত) জমিদার শোভা সিংহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ-র সহায়তার বর্ধমান আক্রমণ করলেন। বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ এই বিদ্রোহ দমনে কোনো চেষ্টাই করলেন না। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম রায় এই বিদ্রোহ দমনে সম্রাটের পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম পরাজিত ও নিহত হলেন। পুরনারী সহ অনেকেই শোভা সিংহ কর্তৃক বন্দী হন। পুরনারীগণ সম্ভ্রম রক্ষার্থে জহরব্রত পালন করেন। রাজকুমারী সত্যবতীর সম্ভ্রম হানির চেষ্টা করলে সত্যবতী শোভা সিংহকে হত্যা করেন। পরে ছুরিকাঘাতে আত্মঘাতিনী হন। অতঃপর রহিম খাঁ বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম ঢাকায় পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। বিদ্রোহ সারা বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা হুগলী অবরোধ করলে ডাচেরা দুটি গানবোটের সাহায্যে তাদের বিতাড়িত করে।৵এই সময় ঔরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র আজিম-উন-শানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান। তাঁর আগমনের পূর্বেই ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁন রাজমহলে বিদ্রোহীদের দমন করেন। জগৎরাম, জবরদস্ত খাঁকে সাহায্য করেন। বিদ্রোহীরা বর্ধমানে পৌছালো। আজিম-উন-শান এদের অনুসরণ করেন। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদর এলাকায় 'মুলকাঠি' তে আবার যুদ্ধ হোল। পরাজিত রহিম খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করলেন। আজিম-উন-শান সৈয়দ আনোয়ার এবং খাজা আবুল কাশেম নামে দুই সেনাপতিকে পাঠালেন। ধুরন্ধর রহিম খাঁ উভয়কেই গুপ্ত হত্যা করলেন। এরপর মোগলবাহিনী রহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করলেন। বিদ্রোহ দমিত হলো। জগৎরাম পৈতৃক জমিদারী ফিরে পেলেন।

মোগলবাহিনীকে সহায়তা করায় খুশি হয়ে ঔরঙ্গজেব জগৎরামকে নতুন ফরমান প্রদান করেন এবং জমিদারীর এলাকা বৃদ্ধি পায়। জাহানাবাদ (বর্তমানে আরামবাগ), চম্পানগরী এবং পান্ডুয়ার জমিদারী বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হল। জগৎরাম গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত হন ১৭০২ খৃষ্টাব্দে।

জগৎরামের দুইপুত্র কীর্তিচাঁদ এবং মিত্ররাম রায়। কীর্তিচাঁদ জমিদারীর ভারপ্রাপ্ত হলেন এবং পুরনো শত্রু শোভা সিংহর ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ এবং বিষ্ণুপুরের রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। হিম্মৎ সিংহ কে কীর্তিচাঁদ স্বহস্তে নিহত করেন। বর্ধমানের জমিদারী বিস্তৃত হয় চন্দ্রকোনা, বরদা (ঘাটাল), চিতুয়া, ভুরশুট, মনোহরশাহী পরগণা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের এবং তাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহর ফরমান বলে এই সময় বর্ধমান জমিদারী বিশাল

আকার ধারণ করে। এই সময় মোট ৫৭ টি পরগণা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপরের পঁচিশ বৎসর মারাঠা শক্তির উত্থানের পর্ব। মারাঠা ঝটিকা বাহিনী উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার 'বর্গীর হানা'র কথা সকলেই জানেন। কীর্তিচাঁদকে বর্গী হানার মোকাবিলা করতে হয়। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলার নবাব তখন আলীবর্দ্দী খাঁ।

কীর্তিচাঁদ বর্ধমান জমিদার বংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ পুরুষ। শুধু জমিদারী বিস্তার এবং যুদ্ধ বিগ্রহ নয় তার কীর্তি বিস্তৃত হয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মন্দির নির্মাণ, পুকুর কাটানো, রাস্তাঘাট তৈরী, শিক্ষার প্রসার সব ব্যাপারেই তিনি মনোযোগী ছিলেন। কাঞ্চন নগরে কুটির শিল্পে তাঁরই উদ্যোগ ছিল, রাণীসায়র তাঁর সময়েই কাটানো। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর সভাকবি, ছিলেন। বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্য শ্রী ধর্মমঙ্গল রাজকবি ঘনরামের রচনা। কীর্তিচাঁদকে এই বংশের কীর্তিমান পুরুষরূপে চিহ্নিত করা হয়।

রাজবংশের সূচনা : কীর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেন রায়। পিতা জীবিত থাকতেই তিনি মোগল সম্রাটের নিকট হতে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সেলিমাবাদের ইন্দ্রায়ণ পরগণা এবং মান্দারনের মন্ডলঘাট পরগণার জমিদারী পান। ইনিই প্রথম 'রাজা' উপাধি ও খিলাৎ উপাধি পান। তখনকার দিনে জমিদারের কাজ ছিল খাজনা আদায় করা এবং ফৌজদারের কাজ ছিল আইনশৃংখলা বজায় রাখা। মোগল সম্রাট এই দুই ক্ষমতাই বর্ধমান রাজাকে প্রদান করেন। চিত্রসেন পিতার জীবিতকালেই জমিদারী পরিচালনা করেন এবং বাহুবলে গোপভূম জয় করেন। সেনপাহাড়ী দুর্গ তারই নির্মিত। চিত্রসেনও বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁর সভাকবি ছিলেন বাণেশ্বর যাঁর রচনা 'চিত্রচম্পু' বর্গী আক্রমণের প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে গ্রাহ্য। চিত্রসেন বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান চিত্রসেনের মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর খুল্লতাত মিত্ররাম রায়ের পুত্র তিলকচাঁদ রাজগদীতে বসেন এবং মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ ফরমান জারি করে তা অনুমোদন করেন।

বর্গীর হাঙ্গামায় বর্ধমান তখন বিপর্যস্ত। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য। বর্ধমান শ্মশানে পরিণত। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মারাঠাদের সঙ্গে অসম্মানজনক সর্তে (চৌথ আদায় দেবার করারে) সন্ধিচুক্তি করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলশক্তি ক্ষীয়মান, বাংলার নবাবের অক্ষমতা প্রকট, বর্গীর আক্রমণে জনজীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত - বুদ্ধিমান বেনিয়া ইংরেজ যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বহু লোকক্ষয় এবং অর্থক্ষয়ের পর বাংলার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হন। দিল্লীর মোগল সম্রাটের শাসন শিথিল হয়ে পড়ছে - ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিলকচাঁদ বাদশাহী ফরমান পেলেন। তার দুই বৎসর পর ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিলকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ বাধে। বিষয় সম্পত্তি এবং বকেয়া খাজনা। বৃটিশরা তিলকচাঁদের কলিকাতার সম্পত্তি মেয়র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করেন। বিরক্ত তিলকচাঁদ তার এলাকায় বৃটিশদের ব্যবসা বন্ধ করে দেন। অবশেষে নবাবের মধ্যস্থতায় একটা মীমাংসা হয়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মারা যান। এর পরের ইতিহাস ভারতের আগামী দু'শ বছরের রাজনীতির গতিসূত্র নির্দ্ধারণ করে দেয়।

পলাশীর যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বর্ধমান :

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদৌল্লার পতনের পর ব্রিটিশ ক্রীড়নক নবাব মীরজাফর ১৭৫৮ তে বর্ধমান চাকলার কিছু অংশ ইংরেজকে দিলেন খাজনা (Revenue) আদায় করার জন্য। ১৭৬০ সালে মীর কাসিম মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম সহ

চাকলা বর্ধমান কোম্পানীকে দেওয়ানী স্বরূপ দান করলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, " ... *for defraying the expenses of English troops employed in the defence of country." (History of the Freedom Movement in India. Page - 12, Vol. - 1).* বর্ধমানের রাজকোষ তখন প্রায় শূন্য। বর্গীর হাঙ্গামায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এর উপর মীর কাসিম ধার্য বিপুল কর (খাজনা) দেবার ক্ষমতা তিলকচাঁদের ছিল না। তিলকচাঁদ কোম্পানীকে তার দুরবস্থার কথা জানালেন। কোম্পানীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিলকচাঁদের সেনাবাহিনীর ইতঃস্তত খন্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। প্রায় বিদ্রোহ বলা চলে। ১৭৬০ সালের জুলাই মাসে রাজার সৈন্য ২০০ জনের কোম্পানীর সিপাই বাহিনীকে পরাস্ত করেন। ঐ বৎসর নভেম্বরে মীর কাসিম কোম্পানীকে জানাচ্ছেন যে বীরভূম এবং বর্ধমানের রাজারা দশ থেকে পনের হাজার সেনা নিয়ে একটি যৌথ বাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং তাঁরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। কোম্পানী খবর পেয়ে মেজর হোয়াইট (Major White) এর নেতৃত্বে সেনা পাঠালেন। ২৯শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্রোহ দমিত হল। ক্ষণস্থায়ী এই বিদ্রোহে মারাঠা সেনাপতি শিউভাট এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের মদত ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে উপযুক্ত সময় আসেনি এই অজুহাতে শাহ আলম পিছিয়ে যান। বীরভূমের রাজা আসাদউজজামান সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিন্তু 'ফকির' ও 'সন্ন্যাসী' দের নিয়ে গড়া রাজসৈন্য (বর্ধমান রাজার) বর্ধমানের দক্ষিণে সঙ্গতগোলার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। যুদ্ধজয়ী ইংরেজ কিন্তু তিলকচাঁদের সঙ্গে সন্ধি করলেন — " The English, however, perhaps wisely, chose to look upon the Raja as still their friend and continued him in the Zamindari on terms much below the real revenue due to want of money and other reasons" (IBID ... Page - 59, Vol. - 1). বেনিয়া ইংরেজ তখনও 'বণিকের মানদন্ড' পুরোপুরি ত্যাগ করে 'রাজদন্ড' অধিকার করার কথা তেমনভাবে ভাবছে না। তাই তিলকচাঁদের সঙ্গে সন্ধি করছে তারা।

তিলকচাঁদ কিন্তু টাকা দিতে পারলেন না। কোম্পানী তখন বর্ধমানের জন্য 'রেসিডেন্ট' পদ সৃষ্টি করে জনস্টনকে প্রথম রেসিডেন্ট সুপারিনটেন্ডেন্টে করে পাঠালেন। ১৭৬০ সালে কোম্পানীর অধিকারে আসার সময় বর্ধমানের রাজস্ব ধার্য হয়েছিল ৩১,৭৫,৩৯১ সিক্কা টাকা। তিনবছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১,৭২,০০০ সিক্কা টাকায়। জনস্টন খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে জমিদারীর কিছু অংশ নীলামে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে হুগলী ও বর্ধমান জেলায় কয়েকটি নূতন ভূস্বামী পরিবারের সৃষ্টি হলো। বর্ধমানে এই সর্বপ্রথম নীলাম পরবর্তী কালে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে প্রভাবিত করে।

মনসবদারী : ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তিলকচাঁদ চার হাজারী মনসবদার এবং ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ৫ হাজারী মনসবাদারী প্রাপ্ত হন এবং ৩ হাজার অশ্বারোহী সহ বন্দুক রাখার ও রণবাদ্যের অনুমতি পান। সম্রাট তাঁকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তী বংশধরগণ এই উপাধি ব্যবহার করে আসছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সন) বাংলাদেশ চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে যা পরিচিত। বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যান। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তিলক চাঁদের মৃত্যু হয়। বর্ধমান রাজবংশের একটি অধ্যায় শেষ হয়। এরপর বর্ধমানের রাজপরিবার আর কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেন নি।

জনস্টনের পর মি হে এবং মি বোল্টস্ বর্ধমানের রেসিডেন্ট সুপরিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হয়ে আসেন কিন্তু খাজনা আদায় বাড়ে না। জমিদারীর অংশবিশেষ নীলামে বিক্রী হতে থাকে এবং সুপারিনটেন্ডেটরাও নানা রকম দুনীতিতে জড়ান। *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বর্ধমান জেলাকে শ্মশানে পরিণত করে দেয়।* W. W. Hunter-এর 'Annals of Rural Bengal' বইতে এই সময়ের দুর্ভিক্ষপীড়িত বর্ধমানের যে ছবি পাওয়া যায় তা অত্যন্ত নির্মম এবং করুণ। তিলকচাঁদ বর্গীর আক্রমণ এবং মন্বন্তরের কাহিনী বিবৃত করে কোম্পানীকে জানান যে খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়।

দুর্যোগ : ১৭৭০ এ এই জটিল ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাজকোষ শূন্য রেখে তিলকচাঁদ মারা যান এবং তাঁর নাবালক পুত্র তেজচাঁদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তেজচাঁদের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী অভিভাবিকা হন। তেজচাঁদকে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাছে অর্থসাহায্য চাইতে হয়। লালা উমিচাঁদ তখন রাজ এস্টেটের দেওয়ান। বর্ধমান জেলা প্রধান গ্রাহাম ব্রজকিশোর নামে একজন শঠ ও দুর্বৃত্ত লোককে রাজপরিবারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ব্রজকিশোর তেজচাঁদকে কার্য্যতঃ বন্দী করে রাখেন এবং মহারানী বিষ্ণুকুমারীর কাছ থেকে রাজার শীল জোর করে নিয়ে নেন। ব্রজকিশোর এই রাজশীল ব্যবহার করে যথেচ্ছাচার করতে থাকেন, রাজকোষ আদায়ে অত্যাচার প্রজাপীড়ন বাড়তে থাকে। বিষ্ণুকুমারীকে অপদস্থ করার জন্য হেস্টিংস - বন্ধু বারওয়েল তাঁর নামে কুৎসা রটালেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে বিষ্ণুকুমারী কাউন্সিল-এ গ্রাহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি জমিদারী থেকে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। গ্রাহাম ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। কাউন্সিলের বৈঠকে হেস্টিংস গ্রাহামকে সমর্থন করেন। তিলকচাঁদের সঙ্গে হেস্টিংস এর শত্রুতা ছিল। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস-এর বিরোধীদের সন্দেহ ছিল যে স্বয়ং হেস্টিংসও ব্যক্তিগত ভাবে গ্রাহামের আত্মসাৎ করা টাকার ভাগ পেয়েছেন। কিন্তু গ্রাহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। তাঁকে শুধুমাত্র ভৎর্সনা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৭৭৬ থেকে ১৭৭৯ - এই তিনবছর সময় বর্ধমানের জমিদারী কার্য্যত গ্রাহাম ও ব্রজকিশোরের হাতে ছিল। ১৭৭৯-এ তেজচাঁদ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে জমিদারীর অধিকার ফিরে পান।

যুবক তেজচাঁদ ছিলেন উচ্ছৃংখল স্বভাবের। অসৎ ও উচ্ছৃংখল স্তাবকবৃন্দ তাঁকে সঙ্গ দিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং পরে গ্রাহাম ব্রজকিশোরের শঠতায় রাজকোষের অবস্থা পূবেই ভালো ছিল না । এখন আরও খারাপ হলো । সরকারের খাজনা বাকী পড়ল । আদায়ের দায়ে তেজচাঁদ গৃহবন্দী হলেন তবুও অবস্থার উন্নতি হ'লো না । অথচ ইংরেজের টাকা চাই-ই । জমিদারী নিলাম হতে থাকল । সিঙ্গুরের দ্বারিকানাথ সিংহ, ভাস্তারার ছকু সিংহ, জনাইয়ের মুখার্জি, তেলেনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা হুগলীর এক বিরাট অংশ কিনে নিলেন । ১৭৯০ - এ দশবছরের বন্দোবস্তে (decennial Settlement) - রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহারাজার কর প্রচুর ধার্য্য করলেন । ১৭৭১ থেকে ১৭৯২ পর্যন্ত অবাধে প্রজা উৎপীড়ন ও অত্যাচার চলতে থাকে । কিন্তু জমিদারীর অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ হতে থাকে ।

১৭৯৩ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বর্ধমান রাজপরিবার মুক্তি পায় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর থেকে। ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। ১৭৯৩-এ রেগুলেশান - ১ বলে সমস্ত পুলিশী

ক্ষমতা সরকারে ন্যস্ত হয়। বর্ধমান জমিদারীর খাজনা নির্ধারিত হয় ৪০ লক্ষ টাকা এবং ১ লক্ষ টাকা পুলবন্দী কর ধার্য হয়। (৪০ লক্ষ ১৫ হাজার ১০৯ সিক্কা টাকা এবং ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭২১ সিক্কা টাকা পুলবন্দী বা বাঁধ মেরামত বাবদ)। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্ষম রাজা পুনরায় রাজমাতাকে রাজকার্য পরিচালনার ভার দিলেন। কিন্তু রাজার স্বভাবে পরিবর্তন না হওয়ায় এস্টেটের কোনো উন্নতি হলো না। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আরো কিছু মহাল বিক্রী হলো। বিষ্ণুকুমারী মারা যান ১৭৯৮-এ। তেজচাঁদ অতঃপর সংযত হন এবং রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

পত্তনি প্রথার সৃষ্টি : বর্ধমানের জমিদারীর আয়তন নীলাম বিক্রীর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অনেক সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। তেজচাঁদ বাদবাকি এস্টেটকে রক্ষা করার জন্য পত্তনি প্রথার প্রচলন করেন। বাংলা দেশের ভূমিব্যবস্থায় পত্তনি প্রথা বর্ধমানের অন্যতম অবদান। এই প্রথার মাধ্যমে সমগ্র জমিদারীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এক একজন বিত্তশালী লোককে বার্ষিক নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ইংরেজ সরকার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে পত্তনি প্রথাকে আইনের স্বীকৃতি দেন। পত্তনি প্রথা বর্ধমান - জমিদারীকে রক্ষা করে এবং কালক্রমে বর্ধমান রাজপরিবার যে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী জমিদারবংশরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে তার মূলেও এই পত্তনি প্রথা।

মহারাজ তেজচাঁদ আটবার বিবাহ করেন - তার মধ্যে একমাত্র নানকী কুমারীর গর্ভে তাঁর একমাত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তেজচাঁদ বহু জনহিতকর কাজ করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর অর্থানুকূল্যে এবং আগ্রহে বর্ধমানে বহু পাঠশালা, টোল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। কমলসায়র তাঁর আমলেই কাটানো হয়। শেষ বয়সে তিনি শাক্ত ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং সাধক কবি কমলাকান্তকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন। শুধু বর্ধমান নয় হুগলী জেলারও অনেক জনহিতকর কাজে তিনি অর্থব্যয় করেন। চুঁচুড়ার ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন তাঁরই কীর্তি, 'কুন্তীনালার' সেতু তাঁরই অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮১৭) Charles-Du- Bordicux কে Principal করে বর্ধমানে একটি কলেজ শুরু করেন। ১৮৩১-এ বর্ধমান রাজ এস্টেটের সীমানা নির্ধারিত হয় পূর্বে গঙ্গার পশ্চিমসীমানা দক্ষিণে কংসাবতী ঘাট, উত্তরে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণপ্রান্ত এবং পশ্চিমে পূর্ব পঞ্চকোট। ১৮৩২ সালে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। তেজচাঁদের জীবিত কালেই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধান অথবা মৃত্যু হয়েছিল সে রহস্য কখনই সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় নাই। প্রতাপচাঁদ একাধারে কুস্তিগীর, দক্ষ তীরন্দাজ, বিদ্যাবুদ্ধিতে বিচক্ষণ, উচ্ছৃঙ্খল এবং যথেচ্ছচারী ছিলেন। পিতা জীবিত থাকাকালীনই তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্যের ভার পান। তাঁরই উদ্যোগে Regulation VIII of 1819 পাশ হয়। এই Regulation- এর বলে পত্তনিপ্রথা আইন সিদ্ধ হয় এর খসড়া প্রতাপ চাঁদের তৈরী। এর আগে খাজনা বাকি পড়লে পত্তনিদারের বিরুদ্ধে defaulcation এর মামলা করা যেত না। ১৮২১ সালে প্রতাপ চাঁদ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন। ১৪ বছর পর একজন প্রতাপচাঁদের আবির্ভাব হয়। পরাণচাঁদ কাপুর তখন রাজএস্টেটের ম্যানেজার। এই প্রতাপচাঁদকে জাল প্রতাপচাঁদ প্রতিপন্ন করা হয় এবং এই খানেই সঙ্গম রায় পরিবারের সমাপ্তি। প্রতাপ চাঁদের কাহিনী এখনও রহস্যাবৃত। বর্ত্তমান রাজপরিবারের উত্তর পুরুষরা অথবা অন্যকেউ এ রহস্যের জাল এখনও উন্মোচন করেন নি।

দত্তক প্রথা শুরু : মহতাব বংশ শুরু

পরাণচাঁদ কাপুর (কপুর) ছিলেন তেজচাঁদের অন্যতমা মহিষী কমলকুমারীর ভাই। কমলকুমারীর পরামর্শে তেজচাঁদ পরাণচাঁদের পুত্র চুনীলাল কাপুরকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। পরাণচাঁদই নাবালক চুণীলালের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে চুনীলাল কাপুরের নাম পরিবত্তির্ত হয়ে মহতাব চাঁদ (বা মহাতাপ) হয়ে গেছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মহাতাব চাঁদ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে রাজসিংহাসনে বসেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক মহাতাবের মহারাজাধিরাজ উপাধি অনুমোদন করেন। মোগল সম্রাটের বদলে এবার থেকে বৃটিশ সরকার উপাধির স্বীকৃতি দিতে শুরু করলেন। বর্ধমান রাজবংশের আনুগত্যের গতিও ভিন্নমুখ হলো। বৃটিশের সঙ্গে মহতাবচাঁদ সুসম্পর্ক বজায় রাখলেন। ১৮৫৫ সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭-র সিপাই বিদ্রোহের সময়ে তিনি বৃটিশকে সর্বপ্রকার সহায়তা করলেন। পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে Indian Legislative Council এর অতিরিক্ত মনোনীত সদস্য নিযুক্ত করলেন। বাংলাদেশে মহতাবচাঁদই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে এই সম্মান দেওয়া হলো। (১৮৬৪ সালে) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার সূত্রে অস্ত্র রাখার অনুমতি পান। তাঁর নামের আগে সম্মানসূচক His Highness যুক্ত হলো এবং ১৩-তোপের সম্মানাধিকারী হলেন। শুরু হলো এক নতুন যুগের। মহতাবচাঁদ দীর্ঘ ৩৭ বছর রাজত্ব করার পর ১৮৮১ সালে মারা যান। মহতাবচাঁদের আমলে বর্ধমান জমিদারীর সীমানা বিস্তৃত হয়। উড়িষ্যার কুজঙ্গ এবং মেদিনীপুরের সুজসুখা জমিদারী তিনি কিনে নেন। তার অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন - যা আজ মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে।

মহতাবচাঁদ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তেজচাঁদ যে Anglo-vernacular স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাঁকে আরও উন্নত করে হাইস্কুলে পরিণত করেন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। বর্ধমানে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। বর্ধমান ও কালনায় দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাঁরই আগ্রহে। বিদ্যাসাগর মহতাব চাঁদ কে 'First man of Bengal' বলে সম্মান জানিয়েছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ধমানে আসেন এবং মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মসমাজ শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে তা পরিচিত হয়। এখানে 'ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল' নামে একটি বালকবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কালক্রমে যা বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে তাঁর ঝোঁক ছিল। তাঁর Joint Manager এবং Private Secretary ছিলেন D. Miller. রামায়ণ এবং মহাভারতের সংস্কৃত থেকে বাংলার অনুবাদ করানো তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রায়ই তাঁর অতিথি হতেন। এ ছাড়াও বহু পন্ডিত, মৌলভী ও শিক্ষককে নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতি সাধনার সকল দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল এবং উদারহস্তে তিনি সহায়তা করতেন এসব কাজে। মহতাবচাঁদ প্রজানুরঞ্জক এবং উদারমনা ছিলেন। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পোষাকে আচরণে এমনকি তাঁর নামেও (মহতাব বা মহাতাপ - পারসী শব্দ) তাঁর এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ভাগলপুরে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

মহাতাব বংশের সূচনা : আবারও দত্তক : অপুত্রক মহাতাব চাঁদ তাঁর শ্যালক বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দেকে দত্তক গ্রহণ করেন। নামকরণ হয় আফতাব চাঁদ মহতাব। (পরে 'মহতাব' উপাধি বা Surname এই রাজপরিবার পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করে)। আফতাব চাঁদ ১৮৮৫ সালে অল্পবয়সে

মারা যান। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। লাকুড্ডিতে জলকল নির্ম্মিত হয় তাঁরই সহায়তায়। রাজ লাইব্রেরীরও তিনিই নির্ম্মাতা। আফতাব চাঁদও অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুযায়ী জমিদারীর ভার ন্যস্ত হয় Court of Wards- এর উপর । তিনি তাঁর স্ত্রী বিনোদয়ী দেবীকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বনবিহারী কাপুরের ছেলে বিদনবিহারী কাপুরকে বিনোদয়ী দেবী দত্তক নেন। এ নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা প্রচুর হয়। যাইহোক ১৬ বছর Court of Wards এর তত্ত্বাবধানে থাকার পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বিজনবিহারী কাপুর নাম বদল করে বিজয়চাঁদ মহতাব নামে রাজসিংহাসনে আরোহন করেন। বিজয়চাঁদই এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। লর্ড কার্জন তখন বাংলার দন্ডমুন্ডের কর্ত্তা। এদেশে ইংরেজ শাসন জাঁকিয়ে বসেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৮৮৫ সালে। বর্ধমানের শান্ত জনজীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায় নি। সুশিক্ষিত বিজয় চাঁদ বংশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে মিত্রতা সম্বন্ধ বজায় রাখতে যত্নবান হলেন। ১৯০৪ সালে কার্জন বর্ধমানে এলেন। তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'কার্জন গেট' নির্মিত হয় 'স্টার অফ্ ইন্ডিয়া' গেটের অনুকরণে। ১৯০৬ সালে বিজয়চাঁদ ইউরোপ ভ্রমণে যান। ফিরে এসে ইংরাজীতে Impression নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৯০৮ সালে লর্ড মিন্টোর কাছ থেকে মহারাজাধিরাজ খেতাব বংশানুক্রমে ব্যবহারের অনুমতি পান। ১৯০৮ সালে কলিকাতার 'ওভারটুন' হলে তদানীন্তন গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে জনৈক বিপ্লবী যুবকের গুলির হাত থেকে রক্ষা করেন। সরকার তাঁকে এজন্য K. C. I. E. এবং Indian order of Merit (class III) সম্মানে ভূষিত করেন।

বিজয়চাঁদ ইংরেজের পরম মিত্র হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেস এবং গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। বর্তমান মহারাজকুমার ডঃ প্রণয় চাঁদ মহতাবের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে তিনি ইংলন্ডে গিয়ে একস্থানে ভারতবর্ষকে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত করে Federation of Greater Britain করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত তিনি Bengal Legislative Council সদস্য ; ১৯০৯ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত Imperial Legislature Council এবং ১৯১৮ থেকে ১৯২৪ বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকির রায় এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে তিনি কংগ্রেসী আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নানাভাবে সহায়তা দিতেন। অর্থাৎ স্বাজাত্যবোধ তাঁর প্রবল ছিল। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন বর্ধমান আসেন তিনি তাঁর থাকার ব্যবস্থার তদারকী করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু যখন (১৯২৮) বর্ধমানে আসেন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে বক্তৃতা করতে বিজয়চাঁদ তাঁকেও অভ্যর্থনা জানান।

বিজয়চাঁদ মহতাব দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর বর্ধমান রাজ বংশের প্রধান হিসাবে ভারতেতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণে জমিদারী পরিচালনা করেন। ১৯০২ থেকে ১৯৪১ (বিজয়চাঁদের মৃত্যু) বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালীর জাতীয়তাবোধকে তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। পরে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পরে। শান্ত বর্ধমানেও রাজনীতির অস্থিরতা অনুভূত হতে থাকে। বিজয়চাঁদ সুশিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তি ছিলেন। মহতাব বংশে তিনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পুত্র উদয়চাঁদ প্রথম গ্রাজুয়েট। বাংলা, ইংরাজী এবং

সংস্কৃত ভাষা বিজয়চাঁদ সযত্নে শেখেন। তিনি সুবক্তা, বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্টপোষক ছিলেন। দেশের পরিবর্ত্তনশীল রাজনীতির গতিপ্রকৃতি তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি তাঁর পরোক্ষ সমর্থন ছিল।

ব্যক্তি বিজয়চাঁদ নানা জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বিজয়গীতিকা, ত্রয়োদশী (কাব্য), রণজিৎ (নাটক), মানস-লীলা (বিজ্ঞান-নাট্য), Meditation, Impression প্রভৃতি কুড়িটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয় তাঁরই অর্থসাহায্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়। রাজকলেজ কে তিনি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করেন। শুধু বর্ধমান নয় কলকাতার শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও বিজয়চাঁদেব আবদান অসামান্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধু এটুকু বলা যাক যে বিজয়চাঁদ ছিলেন একজন বর্ণময় পুরুষ, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ, শিক্ষাসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এবং রাজনীতি সচেতন ভূস্বামী। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তিনি উদয়চাঁদ এবং অভয়চাঁদ নামে দুই পুত্রকে রেখে মারা যান।

১৯৪১ সালে ভারতবর্ষ এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন চলছে। দেশব্যাপী ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা কারারুদ্ধ। আর কিছুদিন পর গান্ধীজি 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' -র সঙ্কল্প উচ্চারণ করবেন, দেশ উত্তাল হবে। বর্ধমান জেলাও তখন আন্দোলন সত্যাগ্রহ স্বদেশীতে চঞ্চল। বৃটিশ রাজশক্তি সম্ভবতঃ বুঝতে পারছেন যে ঘরে ফেরার সময় হলো। এই অবস্থায় উদয়চাঁদের অভিষেক অনুষ্ঠান যে জাঁকজমক করে হতে পারে না তা বোঝা যায়।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ : নতুন যুগের সূচনা :

এর পরের ইতিহাস আর রাজপরিবারের ইতিহাস হতে পারে না। দেশব্যাপী স্বাধীনতার আকাঙ্খার বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইংরেজসৃষ্ট রাজা, জমিদার ভূস্বামীরা সযত্নে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। বিজয়চাঁদ এবং উদয়চাঁদ স্বাধীনতার আবেগের সঙ্গে খানিক যোগাযোগ রেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু ততদিনে কংগ্রেসী চিন্তায় জমিদার বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এদেশে ভূমিব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৫৫ সালে উদয়চাঁদ চেষ্টা করেছিলেন এই পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজে মানিয়ে নিতে। ১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস তাকে প্রার্থী করে কিন্তু তিনি পরাজিত হন কমুনিষ্ট প্রার্থী বিনয় চৌধুরীর কাছে। এক অর্থে এই ফলাফল পরিবর্ত্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিনয় চৌধুরী প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন উদয়চাঁদ ছিলেন ১৬৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান জমিদার বংশের শেষ উত্তরাধিকারী। এভাবেই প্রায় তিনশ বছরের একচ্ছত্র জমিদারীর অবসান হয়। বর্ধমান নতুন যুগে প্রবেশ করে।

উল্লেখ :

১। History of the Freedom Movement in India, Vol. I ;
R. C. Mazumdar.

২। বর্ধমান রাজ কলেজ শতবর্ষ ।। ১৮৮১ - ১৯৮১

৩। Freedom Movement in Burdwan, Burdwan District Congress Centenary Celebration Committee (1985)
৪। বর্ধমান রাজ : আব্দুল গণি (ফার্মা কে, এল, এম)
৫। রাজাধিরাজ : ভোলানাথ মোহান্ত ।
৬। Indian History . Kaley
৭। সাক্ষাৎকার : ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাব (বর্তমান মহারাজকুমার)

সংযোজন : ১

রাজবংশলতিকা : (১৬১০-এ সঙ্গম রায় বর্ধমানে আসেন। আবু রায় চৌধুরী খেতাব পান ১৬৫৭ সালে। ১৯৫৫-তে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ)
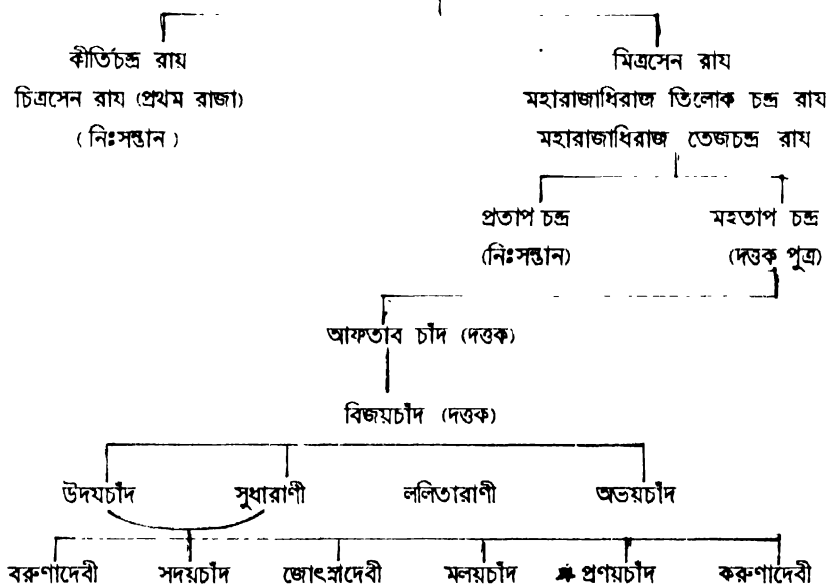
* (Dr. P. C. Mahatab বর্তমান মহারাজকুমার)

(খ) জেলা বর্ধমান : ভাঙাগড়ার ইতিহাস :

১৭৬০ - 'চাকলা বর্ধমান' কোম্পানীর হাতে তুলে দেন নবাব মীর কাসিম। চাকলা বর্ধমানে তখন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পরগণা, হুগলী ও বীরভূমের বহু অঞ্চল যুক্ত ছিল।

১৮০৫ - আসানসোলের কিছু অংশ, পরগণা সেন পাহাড়ি ও সেবগড় এবং পরগণা বিষ্ণুপুর বর্ধমান থেকে পৃথক হয় এবং 'জঙ্গল মহল' নামে নূতন জেলা সৃষ্টি হয়। ১৮৩৩ সালে আবার এই অঞ্চল বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮২০ - তে, হুগলী এবং ১৮৩৫-৩৬ এ বাঁকুড়া জেলা গঠিত হয। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়াব কিছু অংশ বর্ধমানে ফিরে আসে এবং জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) হুগলীর সঙ্গে যুক্ত হয। এরপর থেকে জেলার সীমানা প্রায অপরিবর্ত্তিত রযেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর রেনেল এর জরিপ অনুসারে জেলার আযতন ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল এবং গ্রামের সংখ্যা ৮ হাজাব।

(গ) বর্ধমান জমিদারীর আয়তন ছিল আনুমানিক ৪১০০ বর্গমাইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর (১৭৯৩) জমিদারীব বার্ষিক আয ছিল ৮০ লক্ষ টাকা (আনুমানিক) এবং খাজনা ৪৫ লক্ষ টাকা (মতান্তরে ৪০ লক্ষ টাকা - ২ লক্ষ পুলবন্দী)। জমিদাবী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার সময় পর্যন্ত খাজনাব পরিমাণ আব বাড়েনি।

বাবুরায়ের সময বর্ধমান পরগণাব বার্ষিক বাজস্ব ছিল - ১,০০,২৬২ টাকা (সিক্কা)

সংযোজন - ২

বর্ধমানের রাজ পরিবার : ইতিহাসের পদচিহ্ন ধরে :

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে পাঠান সেনাপতি বখতিয়াব খিলজি (মহম্মদ ঘোবীব সেনাপতি) নবদ্বীপ জয করেন এবং তাঁব অনুচরেরা বর্ধমান জেলার কাঁকসা, চুরুলিযা প্রভৃতি অঞ্চল জয করেন। তখন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন। ১২০৬ সালে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত বাংলাদেশ পাঠান অধিকারে। ১৩৩৮ সালে মহম্মদ তুঘলক নিজেকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন এবং ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের বঙ্গবিজয পর্যন্ত এ প্রদেশে পাঠান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্যের সূচনা ১৫২৬-এ প্রথম পানিপথেব যুদ্ধের পর থেকে। এর পঞ্চাশ বছব পর আকবরের সেনাপতি ও রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডবমল পাঠান শাসক দাউদ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং বর্ধমান সহ বাংলাদেশেব এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মোগল শাসনাধীন হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এ অঞ্চলে মোগল শাসন নিষ্কন্টক ছিল না। বাবোভুঁইয়ার কাহিনী সর্বজন বিদিত। ১৫৭৪ থেকে ১৬৫৭ প্রায় আশী বছব বাংলাদেশের সঙ্গে বর্ধমানও অস্থির রাজনীতির আবর্ত্তের মধ্যে দিযে অতিবাহিত করেছে। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি, আলীবর্দ্দী বা সিরাজউদৌল্লার শাসন বর্ধমান মেনে নিয়েছে এমন অকাট্য প্রমাণ মেলে না। এই ৮০ বছর বর্ধমান শাসিত হয়েছে দিল্লী নিযুক্ত ফৌজদারদের মাধ্যমে যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পাঠান। মনে হয় ১৫৯০ এর মধ্যে বর্ধমানে মোগল শাসন পাকাপোক্তভাবে কায়েম হয়েছে। 'আইন-ইআকবরী' (১৫৯০) তে বর্ধমানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে 'মহাল' অথবা 'পরগণা' এবং সরকার শরিফাবাদ হিসাবে এবং রাজস্ব নির্ধারিত হচ্ছে ১,৮৭৬,১৪২ দাম (আকবরশাহী মুদ্রা)।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান ইতিহাসের সেই করুণ বিয়োগান্ত নাটকের ঘটনাস্থল। শেরআফগান নিহত হলেন এবং মেহেরউন্নিসা নুরজাহান হয়ে দিল্লীর সিংহাসন আলো করতে গেলেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের অনির্বাণ কামনার বলি হলেন বর্ধমানের ফৌজদার। ১৬২৫-এ জাহাঙ্গীরপুত্র খুরম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং উড়িষ্যা দখল কবার পর বর্ধমান দুর্গ দখল করেন। ততদিনে লাহোরের কোটলী মহল্লার ক্ষত্রী রাজপুত সঙ্গম রায় দীর্ঘ তীর্থযাত্রা সমাপনান্তে শহরের অনতিদূরে বল্লুকা নদীতীরে বৈকুণ্ঠপুরে এসে বসবাস

শুরু করেছেন (১৬১০) । এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও তেজারতি কারবারে স্থিত হয়েছেন। এর পরে সঙ্গম রায়ের উত্তর পুরুষেরা কিভাবে 'বণিকের মানদন্ড' ছেড়ে 'রাজদন্ডের' অধিকারী হলেন সে ইতিহাস আগেই বর্ণিত হয়েছে। এ ইতিহাস হয়তো চমকপ্রদ নয় কিন্তু এক অধ্যবসায়ী ধনী পরিবারের রাজা হয়ে ওঠার কাহিনী প্রায় ৩০০ বছর ব্যাপী বর্ধমান ইতিহাসের সম্পৃক্ত হয়ে ওঠার কাহিনী হিসাবেও তা জানতে ইতিহাসের ছাত্রদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক।

বর্ধমান রাজপরিবারের কাহিনীকে অকিঞ্চিৎকর বলে নস্যাৎ করে দেবার একটা ঝোঁক আছে অনেকেব মধ্যে। কিন্তু ইতিহাস ব্যক্তিগত পছন্দের মূল্য দেয় না। বাংলাদেশের তথা পূর্বভারতের ভূমি ব্যবস্থায় বর্ধমানের এই পরিবারের বিশেষ অবদান আছে। ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজ এদেশের জমিতে মধ্যস্বত্ত্বভোগী এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভবে সাহায্য করে। পত্তনি প্রথার মাধ্যমে এই ভূমি ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদানের কৃতিত্ব বর্ধমান রাজপরিবারের। ১৭৯৩ এর ১ নং রেগুলেশান অনুযায়ী জমিদাররা বার্ষিক এক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। সমগ্র বাংলাদেশে এই রকম জমিদারের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। এর আগে সূর্যাস্ত আইন, দশশালা বন্দোবস্ত নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, জমিতে মালিকানাস্বত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে যা এদেশে আগে ছিল না। ইংরেজ তার নিজের দেশের ভূমিব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুরোপুরি সফল হয় নি। বর্ধমানের রাজপরিবার পত্তনি প্রথা সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থায় অনেকগুলি 'থাক' বা পর্য্যায় সৃষ্টি করলেন। পত্তনিদার-দরপত্তনিদার-সে-পত্তনিদার দরদরপত্তনিদার-সে-দরপত্তনিদার - এই ক্রমে অসংখ্য মধ্যস্বত্ত্বভোগী ভূস্বামীর সৃষ্টি হল। চৈত্র কিস্তির সময় অনেক পত্তনিদার খাজনা দিতে না পারায় মধ্যস্বত্ত্ব হারিয়ে ফেলতেন। মূলতঃ এদের 'কর্জ' দেবার জন্য বর্ধমানে মাড়োয়ারী আসেন। বর্ধমানের শহরের ভূতোরিয়া পরিবার সর্বপ্রথম এখানে আসেন। এরা টাকা ধার দিয়ে বহু পত্তনিদারকে রক্ষা করেন কিন্তু নিজেরা সরাসরি জমিতে যান নি। এভাবে অসংখ্য 'জমিদার' এবং 'তালুকদারের' সৃষ্টি হয়। বর্ধমানের অধিকাংশ 'জমিদার' আসলে পত্তনিদার এরা - রাজকোষে খাজনা আদায় দিতেন। ১৮১৯ সালে পত্তনিপ্রথা আইনের স্বীকৃতি পায় এবং সমগ্র বাংলাদেশে এই প্রথার প্রচলন হয় - বৃহৎ জমিদার বংশ গুলি রক্ষা পায় এবং দেশজুড়ে অসংখ্য ছোটবড় 'জমিদার' সৃষ্টি হয়।

বর্ধমানের জমিদারের রাজা এবং মহারাজা উপাধিপ্রাপ্তির ইতিহাস পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সবকটি রাজবংশের ইতিহাস (লক্ষ্মণসেনের পর থেকে) এই। বর্ধমান রাজবংশের আরও কিছু বিশিষ্টতার কথা বলা প্রয়োজন। এরা আদিতে ছিলেন বহিরাগত। পাঞ্জাবী রাজপুতক্ষত্রী। দত্তকপুত্ররাও তাই। ধর্ম বিশ্বাসে এরা ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন যদিও বাংলাদেশের প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তার মিল ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ এদেঁর কুলদেবতা। লক্ষ্মীনারায়ণ অর্থ্যাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কিন্তু নিজেদের ধর্মবিশ্বাস প্রজাদের উপর কখনও চাপিয়ে দেন নি। সকল ধর্মকে সমান উৎসাহ দিয়েছেন। স্থানীয় ধর্মীর মনোভাব ও সংস্কৃতি চেতনার সঙ্গে কখনও বিরোধে যান নি এঁরা। পত্তনিপ্রথা সৃষ্টি করে সরাসরি খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিজেদের হাতে রাখেন নি। ফলে প্রজাপীড়নের অংশীদার হতে হয়নি। কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলেছেন বরাবর। দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারীর সময় প্রজাদের সহায়তা করেছেন। শিক্ষাসংস্কৃতির প্রসারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। জলাশয় নির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্ম্মাণ এবং মন্দির মসজিদ নির্ম্মাণে সহায়তা করেছেন। আর একটা কথা। বর্ধমানে এরা নিজেদের 'বংশ' সৃষ্টি করতে উৎসাহ দেখান নি। পত্তনিদারদের মধ্যে রাজবংশের কেউ ছিলেন না। আসলে এরা নির্বিবাদে থাকতে চেয়েছেন বরাবর। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর তাই এদের বংশধররা প্রায় নীরবেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পেরেছেন। বর্ধমানে 'ফিউডাল' বা 'সামন্ততান্ত্রিক' বংশের অবশেষ যে

তেমনভাবে নেই তার কারণ এই। যদিও এরা আসলে সামন্তই ছিলেন। এ জেলায় সামন্তপ্রথা-র অবশেষ খুঁজতে হবে পত্তনিদারদের মধ্যে।

আর একটা কথা। বর্ধমান যে ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি - তার অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ এই যে বর্ধমান রাজপরিবাব সকল দিক রক্ষা করে যতদূর সম্ভব প্রজানুরঞ্জন করে চলেছিলেন। স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে তাই বৃহত্তর স্বাধীনতার আবেগ সৃষ্টি হয়নি এখানে।

রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা 'বর্ধমান'

গোপীকান্ত কোঙার

সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক ধারণা ছাড়া কোন জাতির ইতিহাস বা সংস্কৃতিকে জানা প্রায় অসম্ভব। আবার যুগে যুগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদ-নদীর গতিপথের পরিবর্তন, লোকালয় বা জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, দেশের সীমারেখার পরিবর্তন বিষয়টিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে।

বর্তমানকালে ব্যবহারিক দিকটির বিচারে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ় এর বিভাজক হিসাবে সাধারণতঃ অজয় নদকে ধরা হয়। আবার অনেকে কাটোয়া মহকুমার একাংশকে উত্তর রাঢ়ের মধ্যে দেখতে চান। সেদিক থেকে খড়ী নদী উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের বিভাজক। আসল কথা হলো দেড় হাজার বছর আগে অজয়ের গতি-প্রকৃতি কেমন ছিল সে নিয়ে সংশয় বা বিতর্ক থেকে যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায় দক্ষিণ রাঢ় ছিল অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী অধিকাংশ অঞ্চল। সুতরাং বর্ধমান ভুক্তির মধ্যে পড়ে রাঢ় অঞ্চল। গঙ্গার উত্তর ভাগেও পড়ে রাঢ় দেশের বিস্তৃতি।

অনেকে 'রাঢ়' শব্দটির জাতিবাচক অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাঢ় নামের কোন জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'রাঢ়' বিশেষণটি চোয়াড় জাতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়" ।।

চৈতন্যদেব ছিলেন উত্তর রাঢ়ের এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভগবানের চিন্তায় ও ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে রাঢ় দেশে কয়েকদিন ঘুরেছিলেন। সেটিকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব কবিরা লিখেছেন "ধন্য রাঢ় দেশ"। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পাদস্পর্শে বর্বর ও নিষ্ঠুর মানুষেরা ধন্য হয়েছিল।

রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা বর্ধমান এর অবস্থানগত গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অজয়, দামোদর, ভাগীরথী, বাঁকা, কুনুর, খরগেশ্বরী, বেহুলা, বল্লুকা, গঙ্গুড়ী ইত্যাদি নদ-নদী বেষ্টিত ও বিধৌত বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলভুক্ত এই জেলা। পশ্চিমবাংলার মালভূমি ও সমতল ভূমির মিলনস্থল হিসাবে পূর্বে সমতল ভূমির আর্য সভ্যতা ও পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সভ্যতার মিলন, মিশ্রণ ও সংঘাত ঘটিয়েছে এই জেলা। জেলার নামটি নিয়ে বহু কাহিনী ও প্রবাদ শোনা যায়। অনেকে মনে করেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান এর নাম থেকেই বর্ধমান নামটি হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন বর্ধমান হলো 'বোড়ো-ডোমন' বা 'ব্রডমন' কথাটির সংস্কৃত রূপ। কিরাত বোড়োগণের অস্থিস্তূপ বা অস্থল বা আস্থিক গ্রামের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান। অর্থাৎ আদিম অধিবাসীদের মৌলিক নাম থেকে বর্ধমান নামটি হয়েছে। জেলাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দুশো কিলোমিটার এবং প্রস্থে প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার, আবার জেলার পশ্চিমদিকে আসানসোল মহকুমায় এটি প্রস্থে গড়ে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার মাত্র।

রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন নগরী, জনপদ ও দেব-দেবীর মূর্তি, মন্দির, মসজিদ, পুষ্করিণী ইত্যাদির যেটুকু ইতিহাস আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তা ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য খুবই অপ্রতুল । যা কিছু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তার থেকে অনুমান নির্ভর অগ্রসর হওয়া মাত্র। আর একটি কথা, যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে বর্তমানের মতো জেলা বিভাজন ছিল না। তবুও আলোচনার সুবিধার্থে

এখানে কেবলমাত্র বর্তমান বর্ধমান জেলার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

গলসীর কাছে মল্লসারুল গ্রামে ডঃ সুরেশচন্দ্র রায় আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজা বিজয় সেনের তাম্রপট্ট শাসনে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ রয়েছে। উক্ত শাসনপট্ট থেকে পণ্ডিতগণ এ পর্যন্ত যা আবিষ্কার করেছেন তা থেকে জমির মালিকানা, ভূমি হস্তান্তর, রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি এবং উপাধি বা পদবি ও স্থান নাম থেকে মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্ক অনেকটাই অনুমান করা যায়। রাঢ়ের ব্রাহ্মণদের খ্যাতি ও মর্যাদা বাংলা এবং বাংলার বাইরেও স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁরা রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তিলাভ করেছিলেন। সেন রাজারা ছিলেন রাঢ়ের লোক, তাদের প্রখ্যাত গুণ ও চরিত্রের কথা কাটোয়ার কাছে ঝামটপুরের পাশে নৈহাটিতে প্রাপ্ত এক ভূমিদান পট্টে পাওয়া গেছে।

আউসগ্রাম অঞ্চলে অজয় নদের তীরে "পাণ্ডুরাজার ঢিবি" নামক স্থানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরাতন মেহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতার সমসাময়িক বলে মনে করা হচ্ছে) সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যা আরও বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

মোঙ্গলকোটে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সেখানে বহু নিদর্শন মিলেছে। এখানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জেলার জামালপুর থানার মসাগ্রামে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের মুদ্রা থেকে অনুমান করা হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন ছিল।

জেলার প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে জৌগ্রামের মন্দির, আজাপুরের দেউল- জৈন প্রভাব সম্পৃক্ত এ দাবী করা যেতে পারে। জৌগ্রামের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত জলেশ্বর নাথের প্রাচীন মন্দির জৈন রীতিতে তৈরী বলে পণ্ডিতগণ দাবী করেন। মহাবীর তাঁর রাঢ় চারিকায় জৌগ্রামে আসেন এবং এখানে তিনি কেবল জ্ঞান লাভ করেন এ দাবী পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন জনপদ হিসাবে অম্বিকা-কালনার নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য যুগে এবং চৈতন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্যে ও জীবনচরিতগুলিতে 'আম্বিয়া' বা 'আম্বুয়া' নামের উল্লেখ রয়েছে। আরও অতীতে কালনায় জৈন তন্ত্রাচারের প্রাধান্য ছিল বলে অনুমান করা হয়। জৈনদের উপাস্যদেবী অম্বিকা আজ দুর্গায় রূপান্তরিত হয়েছেন। আবার শুধু জৈন, শৈব, বৈষ্ণব সাধকই নয়, মুসলমান পীর গাজীরাও কালনার মাটিকে সাধনক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তার কিছু নিদর্শন শিলালিপিতে পাওয়া যায় এবং আংশিকভাবে আজও লোকমুখে শ্রুত হয়। ধর্ম সাধনার কেন্দ্র হিসাবে এর খ্যাতি আজও প্রায় অবিসংবাদিত। সুতরাং কালনার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এক দৃষ্টান্ত।

জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা দেব-দেবীর মন্দির, মন্দির পাত্রে ফলক বা লেখা, মূর্তি ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ইতিহাসের দলিল বলা চলে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে বিশেষভাবে অন্বেষণ ও বিচার বিশ্লেষণের, বরাকরের দেউল, কল্যাণেশ্বরীর মন্দির, ডিসের গড়ে পীরের দরগা, জামালপুরে বুড়োরাজ, ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলাপীঠ, বাঘনাপাড়া, কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, দেনুড় ইত্যাদি স্থানে বৈষ্ণব সাংস্কৃতির নিদর্শন ; কালনা ও বোহারে মুসলমান সংস্কৃতির নিদর্শন ; মণ্ডলগ্রাম, নারকেলডাঙ্গা, পাঁড়ুই, চোতখণ্ড ইত্যাদি স্থানে মনসা পূজার নজীর ; মেমারী, মন্তেশ্বর, ভাতাড়, পূর্বস্থলী ইত্যাদি অঞ্চলে 'কালুরায়', 'কটারায়',

'বাঁকুড়ারায়', 'সুন্দররায়', 'মামদোরাজ', 'বুড়োরাজ' ইত্যাদি নামে ধর্মরাজ পূজার নজীর রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন স্থানে 'বর্ধমানেশ্বর' (বর্ধমান), 'গাজনেশ্বর' (কুড়মুন), 'দক্ষিনেশ্বর' (রোয়ান), 'রুদ্রশিব' (এরুয়ার), 'ন্যাংটেশ্বের' (বোবলাডিহি), 'সিদ্ধিনাথ' (রঘুনাথপুর), 'শৈলেশ্বর' (চৈতন্যপুর), 'সোমনাথেশ্বর' (গুসকরা), 'বিল্বেশ্বর' (বিল্বেশ্বর), 'কালরুদ্র' (নৈহাটী), 'লোচনেশ্বর' (রসুইখণ্ড), 'রাঘবেশ্বর' (খুদকুড়ি), 'গোপেশ্বর' (বাঘনাপাড়া), 'বুড়োশিব' (কেডুই), 'রত্নেশ্বর', (কাটোয়া), 'ঘোষেশ্বর' (পানুঘাট), 'ভুবনেশ্বর' (কাঁকসা), 'জটাধারী' (বেরুগ্রাম), 'নীলকন্ঠ' (খান্দরা), 'চন্দ্রচূড়' (কন্যাপুর), 'মানিকেশ্বর' (সুন্দরচক) ইত্যাদি বিবিধ নামে শিবপূজার আধিক্য এবং উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। শিবের গাজনে বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ব্রত পালন আর্য-আর্যেতর ধর্ম-চিন্তা ও বিশ্বাসের মিশ্র রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে।

আদিম মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে জেনে অথবা না জেনে পূজা করেছে ; যুগের পরিবর্তনে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, সমাজ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হলেও কালী ও বিভিন্ন শক্তি দেবীর পূজা করে চলেছে। শক্তি সাধক কমলাকান্ত এই জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী, রটন্তীকালী, শ্যামাকালী, সিদ্ধেশ্বরী কালী, দক্ষিণা কালী, ডাকাতে কালী ইত্যাদি নামে কালীপূজা এবং দুর্গা, মহিষমর্দিনী, জয়দুর্গা, যোগাদ্যা, অন্নপূর্ণা, কন্দেশ্বরী, চতুর্মুখী, তারাখ্যা, গজলক্ষ্মী, গন্ধেশ্বরী, সরস্বতী, বাসন্তীদেবী, গঙ্গাদেবী কল্যাণেশ্বরী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ও মূর্তিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে শক্তিদেবীর পূজা-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যা বিচিত্র সমাজ ও সংস্কৃতির সন্ধান দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই আবার গ্রামদেবী বা লোকদেবী হিসাবে পূজিতা।

রাঢ় বাংলায় মনসা পূজার ইতিহাসও খুবই প্রাচীন, জগৎগৌরী, বিষহরি, পাণ্ডুলাক্ষী, বাসরীমাতা, মনুই, কংকনাগ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ও মূর্তিতে এবং অনেকক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কোথাও কোথাও লোকদেবী বা গ্রামদেবী হিসাবে (কোন কোন স্থানে মনসার ঝাপান উৎসব সহযোগে) পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; বিশেষতঃ বেহুলা, গঙ্গুড়ী, বল্লুকা ইত্যাদি নদী বিধৌত অঞ্চল কেজা, সাহানুই, হাটগোবিন্দপুর, মণ্ডলগ্রাম, সাঁপাড়, টুপগ্রাম, পাঁডুই ইত্যাদি স্থানের কথা উল্লেখের দাবী রাখে।

বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে বর্ধমানের ইতিহাস বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, অগ্রদ্বীপ, বাঘনাপাড়া ইত্যাদি ভাগীরথীর তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চল বৈষ্ণব কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। দেনুড়, ঝামটপুর, কুলীনগ্রাম, উজানিনগর, কোগ্রাম, দামিন্যা ইত্যাদি স্থানগুলি জেলার বৈষ্ণবতীর্থ হিসাবে আজও সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও কবি মালাধর বসু, কেশবভারতী, গোবিন্দ দাস, নরহরি সরকার, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গৌরীদাস, প্রেমদাস, রাজবল্লভ, জ্ঞানদাস প্রমুখ ব্যক্তিদের নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। জেলার বিভিন্ন স্থানে আজও বিভিন্ন তিথি বা নির্দিষ্ট দিনে বৈষ্ণব উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কেতুগ্রাম থানার দধিয়া বৈরাগী তলায় গোপালদাস বাবাজীর তিরোধানকে কেন্দ্র করে একমাস ব্যাপী যে উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলা প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা সত্যিই উল্লেখের দাবী রাখে।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাংলার যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তা বাঙালীর সমাজ, মন, ধর্মীয় চেতনা ও জীবনপ্রবাহ আলোড়িত করেছিল। সেই সঙ্গে মুসলমান সুলতান ও সুবাদার বা বিভিন্ন মুসলমান শাসক গোষ্ঠী যখন এদেশে এসেছেন তখন তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পীর, ফকির, সুফী, সাধক ও উলেমাদের ধর্মপ্রচারে সাহায্য করেছেন। অবশ্য মধ্যযুগে মুসলমান শাসন কালের আগেও বহু বিদেশী মুসলমান ধর্মপ্রচারক এদেশে এসেছেন। মধ্যযুগে যে সমস্ত পীর, পীরানি বা বিবির স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করে তা আজও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান পালন ও মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে সাক্ষী হয়ে রয়েছে। অপরদিকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং সেক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক মিশ্রিত সংস্কৃতির সন্ধান মেলে। জেলার এরুয়ার গ্রামের বহু মুসলমান আজও তাদেরকে ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে মনে করেন এবং পাশাপাশি বসবাসকারী হিন্দুদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গী হয়ে সম্প্রীতি রেখে চলেছেন। রাইগ্রামে পীর গোঁড়াচাদের মন্দিরে গিয়ে হিন্দু মেয়েরা প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠান পালন করে, আবার জেলায় মিশ্র জাতির লোকের সন্ধানও মেলে। মোঙ্গলকোট থানায় কৈচরের কাছে পটুয়ারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, এদের অনেকের নাম রাম, লক্ষ্মণ, কানাই, বলাই ইত্যাদি ; আবার অনেকের নাম রহিম, মুশা ইত্যাদি। উভয় সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও প্রথা মেনে চলে। দিনে বিবাহ হয়, মেয়েরা শাঁখা-সিন্দুর পরে, মৃতদেহ কবর দেয়। সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

জেলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের দ্বারা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও মেলা সংখ্যায় কম হলেও গুরুত্বের দিক থেকে আলোচনার দাবী রাখে। কুচুট, বৈদ্যপুর, রামচন্দ্রপুর (সোলানপুর), দামোদরপুর (জামুরিয়া), নিয়ামতপুর ইত্যাদি স্থানে সাঁওতালদের উৎসব-অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য সুপ্রচুর।

গ্রামদেবতা বা দেবীর পূজা-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পালনের মধ্যে ও মন্দির স্থাপত্যে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। স্থানাভাবে কয়েকটি উল্লেখ প্রয়োজন মনে করছি।

ক্ষীরগ্রামের প্রাচীন দেবী যোগাদ্যার মন্দির বর্তমান ধ্বংস প্রায় অবস্থায় রয়েছে। দেবী মূর্তিটি সারা বছর গ্রামের ক্ষীরদীঘিতে ডোবানো থাকে। প্রতি বছর বৈশাখ সংক্রান্তিতে দেবী মূর্তি তুলে এনে পূজো হয় ও বিরাট মেলা বসে। দেবী যোগাদ্যার মূর্তি ও দেবীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতির ও গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির অনুষ্ঠানাদি এক বিচিত্র সংস্কৃতি ও গোষ্ঠী ভাবনার সমন্বয় যা সুপ্রাচীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্ধান দেয়। দেবীর সেবাইত উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দত্ত ও সামন্ত পরিবার এবং ডোম। পূর্বে দেবী পূজায় নরবলি হতো, আজও পূজার শেষে দেবীকে জলে ডুবিয়ে রাখার ঠিক আগে ডোম নিজে একটি পাঁঠা কেটে সেটির রক্ত দেবীর মুখে লাগিয়ে দিয়ে বলেন - "নে মা নররক্ত নে" এটিকে 'মেরুয়া কাটা' বলে। এহলো আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্তরে এসেও আদিম কৌম সমাজের লৌকিক প্রথার রেশটুকু ধরে রাখার অদম্য প্রয়াস। পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ডোম, হাড়ী, বাগদি (কুশমেটে বাগদি, তেঁতুলে বাগদি, চুনারী বাগদি), চর্মকার কুম্ভকার, গোপ, ধীবর, কর্মকার সূত্রধর, নাপিত, মালাকার, শঙ্খকার, ব্রাহ্মণ (নিগনের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, শকদ্বীপীয় গ্রহচার্য, বর্ণ ব্রাহ্মণ, ভাণ্ডারী ব্রাহ্মণ, নরসোনার চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, ইট্রার রায় চোধুরী ব্রাহ্মণ),

ভট্টাচার্য (মেড়তলার ভট্টাচার্য, দোনার ভট্টাচার্য) ; আগুরিদের মধ্যে সামন্ত মহাশয়, দত্ত মহাশয়, রায় রায়ান বংশ, চৌধুরী বংশ, মন্দ্ল বংশ, ছোট রায় এবং সাঁইয়েরা ইত্যাদি প্রায় তিরিশটির বেশী বিভিন্ন জাতির ও বংশের বিভিন্ন গ্রামের লোকদের দেবী পূজায় কাজ নির্দিষ্ট রয়েছে। এই সব পরিজন নিয়ে দেজীর বিশাল গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যেটিকে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বলতে কোন বাধা নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ধ্বংসাবশেষ এর মধ্যে ঐতিহ্যের নজির আজও অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে 'গুয়া ডাকা' 'ক্ষীর-কলমের জল সিঞ্চন', 'চ্যাঙ-ব্যাঙ', 'মালাকারের বিয়ে', 'মাঝ নেওয়া', 'উপলপূজা', 'মামা-ভাগ্নের হাল-লাঙ্গল', 'ময়ূর নাচ', 'পাট নড়ানো', 'ডোম চোয়াড়ী' ইত্যাদি বিবিধ ক্রিয়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যেখানে নির্দিষ্ট জাতির লোকদের ভূমিকা পালনের কথা বলা হয়েছে। তবে বর্তমানের অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীনভাবে হয়ে থাকে। যেমন দেবীর 'গুয়া ডাকা' অনুষ্ঠান হলো প্রতি সংক্রান্তির সন্ধ্যায় আরতির পর দত্ত মশাই মালাকারকে নির্দেশ দেন পান ও সুপারি নিয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যক্তিদের ডাকা বা আহ্বান জানানোর জন্য। এরপর মালাকার উচ্চেস্বরে পরপর নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকতে থাকেন - কোশল মশাই (ডোম), তারপর ভরত দত্ত শাম মন্দ্লব, তারপর এরুয়ার, নাসিগ্রাম, কুসুমগ্রাম, কুড়মুন, কলিগ্রাম এর আগুরি কেউ আছেন কিনা (পৃথক পৃথক ভাবে ও ক্রমান্বয়ে আহ্বান জানাতে হবে)। শেষে ঢাকী ঢাক বাজিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ ঘোষণা করে। উক্ত অনুষ্ঠান সামাজিকভাবে সম্মান দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বর্ধমান জেলার আনগুনা, দেরিয়াপুর, সাঁকটয়া, বোকড়া, পাঁইটা, সেরপুর, উঁচালন, কেন্দুড়, সরঙ্গা, খাঁপুর, সড্যা ইত্যাদি স্থানেও দেবী যোগাদ্যার পূজা হয়। তবে এগুলিতে বাৎসরিক পূজা হয় ক্ষীর গ্রামের বাৎসরিক পূজার পূর্বদিন।

মণ্ডলগ্রামে জগৎগৌরী দেবীর (মনসা) বাৎসরিক পূজার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পার্শ্ববর্তী বামুনিয়া গ্রামে দেবী মূর্তিটি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেবীর সঙ্গে জরৎকারুমুনির (একটি প্রস্তরখণ্ড) বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু বিবাহ হয় না। ভেঙ্গে যায়। অনুরূপ অনুষ্ঠান মাঝিগ্রামে শাকম্ভরী দেবীর (মনসা) বাৎসরিক পূজার সময় শিবের সঙ্গে বিবাহের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু শেষ হয় না। এই সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ উৎসবের মধ্যে গভীর রহস্য বা ইতিহাস লুকিয়ে থাকাটা বিচিত্র নয়।

পূর্বস্থলী থানায় জামালপুরে বুড়োরাজের বাৎসরিক পূজায় বলি প্রদত্ত পাঁঠা বা মুড়ি কেড়ে নেওয়ার জন্য যে লড়াই বা মারামারি হয় তা বিশেষ ইঙ্গিতবাহী, বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে একটি বিরাট মেলাও বসে। আসলে দলবদ্ধভাবে মারামারির মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে বুড়োরাজের পূজাকে কেন্দ্র করে বীরত্বের বা লাঠিখেলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়া। রাঢ়ের ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের আধিক্য রয়েছে এবং তারা ধর্মরাজকে বীর যোদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাছাড়া বুড়োরাজকে নিয়েও সংশয় থেকে যায়। ইনি শিব না ধর্মরাজ। বুড়ো শিবের 'বুড়ো' আর ধর্মরাজের 'রাজ' নিয়ে হয়েছে 'বুড়োরাজ '। আসলে রাঢ়ের তথাকথিত অনুন্নত সমাজের গণদেবতা ধর্মঠাকুরকে হিন্দুরা আত্মসাৎ করতে গিয়ে এ ধরণের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাই বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় আর কোথাও শিবের পূজা না হলেও উক্ত তিথিতে বুড়োরাজের পূজা হয়। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে বৈশাখী পূর্ণিমা মূলতঃ ধর্মরাজ পূজার তিথি। আবার অন্যান্য জায়গায় ধর্মঠাকুরের সেবাইত ডোমপণ্ডিত, বাগদি প্রভৃতি তথাকথিত অনুন্নত জাতির

লোকেরা হলেও এখানে বুড়োরাজের (যেটিকে ধর্মরাজ বলতে কোন অসুবিধা নেই) সেবাইত ব্রাহ্মণরা। পূজানুষ্ঠানের মধ্যেও আপোসমূলক সংস্কৃতির নিদর্শন মেলে। দেবতার পূজার নৈবেদ্যের মাঝে একটি দাগ টেনে দেওয়া হয় - অর্ধেক শিবের আর অর্ধেক ধর্মরাজের, ছাগবলির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের একপাশে হাড়িরা শুয়োর বলি দেয়, মুসলমানরাও পাঁঠা মানত করে। এককথায় রাঢ়ের প্রাচীন ও প্রধান লোকদেবতা বা গ্রামদেবতা ধর্মরাজ পরবর্তী কালে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের দেবতা হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম বা সংস্কৃতি কোন বিরোধের মধ্যে না গিয়ে দূরদর্শিতা ও উদারতার মধ্যে দিয়ে আপোস করেছে। এই সাংস্কৃতিক সমস্যা কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। জনপদ ও তার পারিপার্শ্বিক জন সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বা যোগাযোগ দিয়ে তা বিচার করতে হবে।

কুড়মুন গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে ঈশানেশ্বর শিবের গাজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্মশান সন্ন্যাসীদের সত্যিকারের নরমুন্ডু নিয়ে নৃত্য এবং এর প্রারম্ভিক ক্রিয়াকর্ম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির সন্ধান দেয়। পার্শ্ববর্তী পলাশী গ্রামেও নরমুণ্ডু নৃত্য হয়। উৎসব ও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জাতির লোকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাঢ়ীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তথাকথিত অনুন্নত জাতির আপোস মনে করতে কোন অসুবিধা নেই। সন্ন্যাসীদের 'মুখোশ নৃত্য', 'থাকা' (মাটির তৈরী বিভিন্ন পুতুলের সাহায্যে কোন ঘটনাকে তুলে ধরা), 'খেস্যাগান' (খানিকটা কবিগানের মতো) ইত্যাদি এমন অনেক বিষয় গাজন উপলক্ষে রয়েছে যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনুধাবনযোগ্য।

মানকর স্টেশন থেকে কিছুটা নিয়ে অমরাগড় গোপভূম নামে পরিচিত। রাঢ় অঞ্চলে গোপ ও সদ্‌গোপদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মকর্মের সঙ্গে এ অঞ্চলের ইতিহাস জড়িত। আজ অমরাগড়ে গড়, দুর্গ, রাজবাড়ী না থাকলেও হাতিশালা, ধনাগার, মরাইতলা, ভাল্লুকশালা ইত্যাদি নামের মাঠ রয়েছে যার অনেক জায়গায় উঁচু ঢিবিও রয়েছে। এগুলির আসল রহস্য কেবলমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণে মিলতে পারে। বহু পুরাতন দেব-দেবীর মন্দির ও মূর্তি রয়েছে এবং সেগুলিই আজ প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সাক্ষী। পার্শ্ববর্তী স্থান কাঁকসা ও ভালকীর নামও এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া রাঢ় বাংলার এই জেলাটিতে বহু স্থান রয়েছে যেগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নজির এবং এখানকার মানুষের ধর্ম-কর্ম ও ঐতিহ্যপূর্ণ বিশেষত্বের মধ্যে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা পূজা, শুশুনিয়া তারিক্ষী মাতার পূজা, এরুয়ার গ্রামে দক্ষিণাকালী পূজা, কেতুগ্রামে বহুলাপূজা, বরাকরের দেউল, আসানসোলে ঘাগর বুড়ীচণ্ডী পূজা, বোড়ো গ্রামে বলরামের পূজা, চোৎখণ্ডে ঝাপান উৎসব ইত্যাদি এবং ঐতিহাসিক মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র মোঙ্গলকোট ; ভাস্কর প্রাচীন গ্রাম দাঁইহাট ও পাতুনের ঐতিহ্য ; অম্বিকা কালনার নিকটবর্তী বাঘনাপাড়ার গোস্বামী পরিবারের বৈষ্ণব সাংস্কৃতির ঐতিহ্য ; ক্ষীর গ্রাম, কেতুগ্রাম, মাঝিগ্রাম ইত্যাদি তান্ত্রিক পীঠস্থান বেষ্টিত শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণব সংস্কৃতির বিস্তৃতি ; কুলীনগ্রামে বৈষ্ণবকবি মালাধর বসু ও দামিন্যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে যা এখানে স্থানাভাবে সম্ভব হলো না।

এক কথায় রাঢ় বাংলার ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, বল্লুকা, বেহুলা, খড়ি, কুনুর, বাঁকা, মইয়া ইত্যাদি নদ-নদী বিধৌত এই অঞ্চলটি বহু মূল জাতি, গোষ্ঠী,

সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন সামাজিক কাঠামো দান করেছে। সমাজের বিভিন্ন দিক যা ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেছে, ঐশ্বর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়েছে। একদিকে যেমন এক-একটি দেব দেবী তাঁর পরিজন গোষ্ঠীকে নিয়ে এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে (আগেই বলা হয়েছে), অপরদিকে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য, আদিবাসী প্রভৃতি ধর্মের বা সম্প্রদায়ের লোকেরা আপোস ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এক নতুন সংস্কৃতির সন্ধান দিয়েছে। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষের সাহিত্যধর্ম, দৈনন্দিন আচার-আচরণ, সংস্কার, নৈতিকজীবন, কর্তব্যবোধ ইত্যাদি প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। ধর্মের বিভিন্নতা ও সংমিশ্রণের দিক থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের ধর্মসাধনা ও তৎপরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশ কিছুকাল বিস্তার লাভ করে। পাল ও সেন যুগে তন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব এ অঞ্চলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। একদা মোঙ্গলকোট, বোহার ইত্যাদি স্থানগুলি ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কালনা, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, দেনুড়, বাঘনাপাড়া ইত্যাদি স্থানগুলি বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। এ সবই উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ জোগায়।

বর্তমানে বর্ধমান জেলাটিতে হিন্দু, অহিন্দু, অধহিন্দু, আদিবাসী, বাঙালী-অবাঙালী ইত্যাদি জাতির লোকদের একত্র বসবাস এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো বাংলার একটি অন্যতম জেলা হিসাবে পরিচিত করে তুলেছে। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে রানীগঞ্জ, আসানসোল ইত্যাদি স্থানে কয়লা খনিগুলি কয়লায় সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলের পাশাপাশি এলাকায় দুর্গাপুর, বার্ণপুর, হীরাপুর, কুলটী ইত্যাদি স্থানে নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। জেলার পূর্বাঞ্চল বা সদর, রায়না, জামালপুর, মেমারী ভাতাড়, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী, কালনা ইত্যাদি থানা এলাকায় কৃষিক্ষেত্রগুলি বর্ধমান জেলা তথা বাংলাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। আবার গ্রামভিত্তিক এই জেলাটিতে কৃষিনির্ভর মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য অপ্রতুল। এরা মোটামুটিভাবে অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছেন মধ্যবিত্ত। এছাড়া চাষের কাজে দিনমজুর হিসাবে যারা জীবিকা উপার্জন করেন তাদের অর্থনৈতিক জীবন অতি সাধারণ ও দীন। শহরাঞ্চলে মালিকশ্রেণীর জীবনে রয়েছে আর্থিক প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের আধিক্য ; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী অনাড়ম্বর, আমোদ ও উত্তেজনাবহুল, অপরিণামদর্শী, অমিতব্যয়ী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। এছাড়া ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল, উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী ইত্যাদি ব্যক্তিদের নিয়ে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক জীবন প্রবাহিত হয় শান্তিপূর্ণভাবে হিসাব-নিকাশ, বিচার-বিবেচনা, মিতব্যয়িতা ইত্যাদির মাধ্যমে।

স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের গতানুগতিক জীবনপদ্ধতির পরিবর্তন সমাজ সচলতা প্রমাণ করে। সমাজ কোন সময়েই স্থিতিশীল থাকে না। জ্ঞাত যা অজ্ঞাত কারণে সমাজ কালের গতিতে, বিরামহীনভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই উপরোক্ত অর্থনৈতিক কাঠামোয় বর্তমানে যে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সেখানে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে। পেশাগত কারণে, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি কারনে জাতিভেদ প্রসার গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে, অবশ্য এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নগর সভ্যতার অবদান বিশেভাবে উল্লেখ্য। হোটেল বা রেঁস্তোরায় খাওয়া-দাওয়া, কলকারখানায় একত্র কাজ করা, বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীদের সঙ্গে চলাফেরা ও কথা বলা, কার্য-উপলক্ষে বাইরের সহকর্মীদের সঙ্গে মেলা-মেশা

ও সংঘ-সমিতি গঠন ইত্যাদির প্রভাব, পারিবারিক খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্ম সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনকে প্রভাবিত করেছে।

জেলার শহরগুলি বেশীর ভাগ শিল্পাঞ্চলে এবং কর্মচঞ্চল শহরের আধুনিক শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার স্পর্শে শহরের জনজীবন অনেকাংশে বাহ্যিক শিষ্টতাভিত্তিক আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে গ্রাম্য জীবনে বিরাজ করে অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ, আবেগময়, জীবন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, অবশ্য কৃষিজীবি মানুষের গতানুগতিক সংস্কৃতি বর্তমান শিল্প ও যন্ত্রসভ্যতার আঘাতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, আধুনিক সাহিত্যাদর্শ, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা, অন্যান্য উন্নতমানের সুযোগ সুবিধা এবং জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণগুলির পরিবর্তনের আবশ্যকতায় সামাজিক কাঠামো ও তজ্জনিত মানসিকতার পরিবর্তনে সংস্কৃতির ধারাটি উত্থান-পতন, জোয়ার-ভাঁটার মধ্যে দিয়ে ক্রম বিবর্তনের পথে গতিশীলতা লাভ করে। সুতরাং প্রবহমান বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন এনেছে। অবশ্য স্মরণীয়, উক্ত পরিবর্তনের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে, বৈষম্যমূলক আচরণ, সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক সংবাদপ্রচার, অশ্লীল সাহিত্যসৃষ্টি, অশোভন ও বিকৃত রুচিসম্পন্ন আমোদ-প্রমোদ ও চিত্র প্রকাশ ইত্যাদি যুবসমাজকে এক অপসংস্কৃতিপূর্ণ পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টায় সুস্থ সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়, অপসংস্কৃতি বা কুসংস্কারপূর্ণ অসঙ্গত জীবনপ্রবাহের পরিবর্তে পরমতসহিষ্ণু ও উদার সংস্কৃতির স্রোতধারা কাম্য।

সংযোজন : ।। বর্ধমান জেলার মেলা : কিছু তথ্য ।।

বর্ধমান জেলায় সারাবছর ধরে অসংখ্য মেলা ও পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট মেলার সংখ্যা ৩৬৪টি। সবথেকে বেশী মেলা হয় মাঘমাসে - ৬৮টি। সবথেকে কম অগ্রহায়ণ মাসে - ৭টি । পৌষ থেকে চৈত্র - এই চারমাসে ১৮৭টি অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী মেলা হয়। বৈশাখ থেকে আষাঢ় এই চারমাসে ১৩৬টি এবং বাকী ৪ মাসে ৩৮টি মাত্র মেলা হয়। এই মেলাগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন। ১ দিন থেকে ১৫।২০ দিন পযন্ত মেলার অবধি। জনসমাগম ৫০০ থেকে ৩০।৪০ হাজার পর্যন্ত। নীচে বর্ধমানের কোথায় কতগুলি মেলা হয় তার বিবরণ দেওয়া হোল। বন্ধনীর মধ্যে মেলার সংখ্যা উল্লেখ করা হোল।

১। কেতুগ্রাম (১৯টি)। ২টি ছাড়া সবকটি প্রাচীন। উল্লেখযোগ্য : দধিয়া গ্রামের বৈরাগী তলার মেলা ১৫দিন ধরে চলে। শ্রী গ্রামের গাজনের মেলা ১০দিন, উদ্ধারণপুরের উত্তরায়ণ উৎসব ৭ দিন চলে।

২। কাটোয়া (২৩টি) । ২টি ছাড়া সবকটি প্রাচীন। পুঁইনি-র শিবরাত্রির মেলা ৮।১০ দিন, চন্দ্রপুরের মাঘী পূর্ণিমা, অগ্রদ্বীপের বারুণীস্নান - ৭ দিন চলে।

৩। মঙ্গলকোট (১৭টি)। সবকটি প্রাচীন। পলসোনার ঝাড়েশ্বরীপূজা - ৭ দিন, বাকলডিহির শিবরাত্রি মেলা - ৭দিন, মঙ্গলকোট এর পীরসাহেবের মেলা - ৭ দিন। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মেলা ৭ দিন চলে।

৪। মন্তেশ্বর (১৮টি)। ২টি ছাড়া সবকটি প্রাচীন । রায়গ্রামের গোরাচাঁদ মেলা - ৭ দিন। লোহারের দোলযাত্রা মেলা ৪ দিন, ভেলিয়ার রক্সাশরীফেরমেলা - ৪ দিন।

৫। পূর্বস্থলী (৬ টি)। প্রাচীন । জামালপুরের বুড়োরাজ মেলা বিখ্যাত। ১০।১২ দিন চলে।

৬। কালনা (৩০টি)। ৪।৫ টি বাদে সবই প্রাচীন। সিঙ্গারকোন দোলযাত্রা ১২ দিন, বাঘনাপাড়ার মহামহোৎসবমেলা - ৪ দিন।

৭। মেমারী (৩২টি)। ৫।৬ টি ছাড়া প্রাচীন। ঘোষ পাঁচসে - অন্নপূর্ণা পূজা ১০ দিন। ইছাবাচার ধর্মরাজ উৎসব ৩ দিন।

৮। জামালপুর (৩০টি) । ২০ টি প্রাচীন। কুলীনগ্রামের মদনগোপাল ঠাকুরের মেলা ২০ দিন, জাউগ্রামের শিবরাত্রি ৭ দিন। বোড়োবলরাম - বলরামের চক্ষুদান ১০।১২ দিন, সিয়ালী-কালীপূজা - ৭ দিন।

৯। রায়না (৩০টি)। মাধবডিহি আহরচণ্ডী - ৫ দিন। খৃষ্টেনন্দপুর মনসাপূজা - ৭ দিন।

১০। খন্ডঘোষ (২২)। কৈয়রের ঝুলনযাত্রা - ৪।৫ দিন। খেজুরহাটী জাহাঙ্গীর পীরের উরস - ৪ দিন চলে।

১১। বর্ধমান - (১৭টি) । কুড়মুনের গাজন ৭ দিন, কলিগ্রামের জয়দুর্গা পূজা ৩।৪ দিন। রায়ান শিব চতুর্দ্দশী - ৪ দিন, শহরের ঝুলন - ৫ দিন, নেড়োদিঘীর পীরের উরস - ৫ দিন।

১২। ভাতাড় (১০)। বামসোর পীরের মেলা - ৪ দিন। মুরাতিপুর ফকিরের মেলা - ৪ দিন। নুনারী - ফকিরসাহেবের মেলা এবং ভাতাড়ের লক্ষ্মীজনার্দ্দন মেলা - ৪ দিন। মাহাতার গোবিন্দ জিউর মেলা - ৭ দিন।

১৩। গলসী (১৬)। ইরকোনা শ্রীপঞ্চমী - ৭ দিন, রামগোপালপুরের আনন্দমেলা ৩ দিন, পুরসার পীরসাহেবের মেলা - ৪ দিন, আদরার মহোৎসব - ৮ দিন।

১৪। আউশগ্রাম (২২)। সর-দোলযাত্রা ১১ দিন। এড়াল কালীপূজা - ৭।৮ দিন। সুয়াতা - বহমান পীরের উরস - ৪।৫ দিন। পান্ডুক মহোৎসব - ৫ দিন।

১৫। কাঁকসা থেকে সালানপুর পর্যন্ত মেলার সংখ্যা ৬১টি। অর্থাৎ শিল্পাঞ্চলে মেলার সংখ্যা কম। এই অঞ্চলে গোষ্ঠাষ্টমী - ঝুলন ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে মেলা হয়। ফরিদপুরের ইছাপুরের গাঙ্গপূজা, শিয়ারসোলের রথযাত্রা উল্লেখযোগ্য।

সূত্র : অশোক মিত্র ; পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পার্বণ (৫ম খণ্ড ১৯৮২)

আগ্রহীরা ডঃ গোপীকান্ত কোঙারের 'বর্ধমান জেলার মেলা : সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' বইটি দেখতে পারেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মত বই ।।

বর্ধমানের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জনসংখ্যার বিন্যাস

ভব রায়

বাঙালীর সভ্যতা বা বঙ্গসংস্কৃতি বয়সে ঠিক কতটা প্রাচীন ? সত্যি বলতে কি - এ সম্পর্কে সুনিদ্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছাতে পারেন নি সমাজতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিকেরা। অবশ্য শুধু বাঙালী কেন - পৃথিবীর কোন জাতির সভ্যতার ইতিহাসের চুলচেরা, সঠিক বয়স-নির্ধারণ হয়তো বাস্তব কারণেই সম্ভব নয়। তাই, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালীর সভ্যতার ইতিহাস বলতে এ তাবৎ আমরা যা জেনেছি, তা মোটামুটিভাবে বিগত দু হাজার বছরের ইতিহাস, যা মোটামুটি তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সমর্থিত ও স্বীকৃত। কিন্তু দু হাজার বছরের আগে কি আমাদের এই বঙ্গদেশের মাটিতে মানুষের সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল না ? অবশ্যই ছিল এবং ঘটনা হল - দু হাজার বছরের আগে - বহু আগে সেই পুরাতন প্রস্তর যুগ বা হিমযুগ-পরবর্তী প্রাগৈতিহাসিক আমলেও আজকের পশ্চিমবাংলা বা বঙ্গ নামে এই দেশটিতেও ছিল মানুষের বসবাস যার অজস্র প্রমাণ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেছে। এখানে মনে রাখতে হবে, সেই প্রাচীন আমলে অর্থাৎ আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে সারা দেশে কোন রকম জেলা-বিভাগ ছিল না। ভাগীরথী, বা দামোদরের মত বড়-বড় নদ-নদী বিভিন্ন অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করতো। এই কারণে, বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর বিবর্তনমূলক ইতিবৃত্ত জানতে হলে সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাসের পাতা তন্নতন্ন করে ওল্টালেও কিন্তু আজকের বর্ধমানের হুবহু মানচিত্রটিকে আমরা খুঁজে পাবনা। অবশ্য, বল্লাল সেনের আমল থেকে 'বর্ধমানভুক্তি' নামে চিহ্নিত একটি অঞ্চলের কথা জানা যায়, যা এখনকার বর্ধমানের সমার্থক নয়, বরং বলা যায়, এই বর্ধমান ভুক্তি আসলে ছিল ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের এক বিস্তৃততর অঞ্চল (এখনকার বর্ধমান জেলা সহ) এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চল সাধারণভাবে 'রাঢ়-অঞ্চল' নামেই অধিকতর পরিচিত হয়েছিল।

যাই হোক, বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস জানার জন্য আপাতত আমরা এখনকার বর্ধমান জেলার ছবিটিকেই চোখের সামনে রাখবো এবং হাল আমলে এই জেলায় বসবাসকারী জনসাধারণের সূত্র ধরেই আমরা তাদের সমাজতাত্ত্বিক ইতিবৃত্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করবো। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। ঠিক এই মূহুর্তে আপাতদৃষ্টিতে 'বাঙালী' হয়তো একই ভাষাভাষী, এক অভিন্ন জাতিসত্ত্বা হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল-নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বাঙালী এক সংকরজাতি- বহু জাতি, উপজাতি, স্থানীয়-বহিরাগত মানবজাতির অজস্র শাখা-প্রশাখার রক্তের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব ঘটেছে। তাই, আজকের সমগ্র পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত বহু জনগোষ্ঠীর সদৃশ অস্তিত্ব যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে বর্ধমানের পটভূমিতে, তেমনি মূলত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বেশ কিছু স্বতন্ত্র, পৃথক জাতি বা সম্প্রদায়কেও আমরা খুঁজে পাব এই জেলার মাটিতে।

বিগত একশ বছর ধরে বর্ধমান জেলার পটভূমিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে যে জাতি বা সম্প্রদায়গুলির নাম প্রধানত উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল- বাগদী, সদগোপ, আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয়, আদিবাসী-উপজাতি, ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, তিলি ও মুসলমান। বলা বাহুল্য, আদিবাসী ও মুসলমানদের বাদ দিলে উপরোক্ত জাতিগুলি অধুনা মূলতঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসাবে পরিচিত। কিন্তু, এখানে মনে রাখা

প্রয়োজন, বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা কালে সর্বাগ্রে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাসঙ্গিকতাও উল্লেখ্য, জৈনগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ ' সূত্রের মাধ্যমে একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বর্ধমান অঞ্চল পরিক্রমা করেছিলেন এবং তৎকালীন 'রাঢ়বাসীরা' তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাবসুলভ উদার ও অহিংস ভাবাদর্শ এই অঞ্চলের এক শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত কিছুকালের জন্যেও যে জৈনধর্মের প্রসার ঘটেছিল এটাই স্বাভাবিক। আবার মহাবীরের অন্য নাম 'বর্ধমান' অনুসরণেই বর্ধমান শহর বা জেলার নামকরণ-স্থান-নাম সম্পর্কিত এটাই সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রচলিত অভিমত। এছাড়াও, বর্ধমানের বহু স্থানে জৈনধর্মের স্মৃতিবাহী তীর্থঙ্করের প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে, বরাকর অঞ্চলের একটি মন্দিরে ও আরও দু-এক জায়গার প্রাচীন মন্দিরে জৈন সংস্কৃতির প্রভাবও সুপরিস্ফুট। এসব থেকেই এই অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা আরও যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এমন কি, আজও আসানসোলের কাছাকাছি দু-চার জায়গায় একটি বিশেষ উপাধিযুক্ত বেশ কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা নিজেদের প্রাচীন জৈন বংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন।

বিগত দুহাজার বছরের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা দেখতে পাই, তিনশ খৃষ্টাব্দ থেকে সাতশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী গুপ্তরাজতন্ত্রের এই পর্বটি বাদ দিয়ে তার আগে ওপরে দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বিশেষকরে, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক পালরাজাদের তিনশ বছরের শাসনকালকে বৌদ্ধধর্মের চরম বিকাশের 'স্বর্ণযুগ'ও বলা যায়। বর্ধমানের মেমারী অঞ্চলে,আঝাপুরের প্রাচীন 'দেউলিয়ার দেউলে' ও বর্ধমানজেলার অন্যান্য কিছু অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষে বৌদ্ধমঠ বা বৌদ্ধবিহারের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়েছে এসব থেকে প্রমাণিত হয় এককালে বর্ধমান জেলায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। আসলে পাল আমলে বা তার পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশের ধর্মীয় প্রবাহে দেখা গিয়েছিল এক অনন্য, অভূতপূর্ব লক্ষণ-বৌদ্ধ মতবাদের মহাযান-বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতি ধারার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম-শৈব-শক্তি ধারার সমন্বয় ও সহাবস্থান, যার সর্বাধিক স্ফূরণ দেখা গিয়েছিল বর্ধমান ও সন্নিহিত রাঢ় অঞ্চলে । অথচ আশ্চর্যের ঘটনা হল-একদা বর্ধমানের মাটিতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এই বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও এই দুটি ধর্ম আজ এখানে প্রায় অবলুপ্ত। ১৯৮১-র আদমসুমারী অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাসিন্দার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৬১ ও ১৪৩২ জন ; এবং তাঁরাও সম্ভবত স্বাধীনোত্তর আমলের বহিরাগত মানুষ। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এই আপাত-অবলুপ্তির ব্যাখা হিসাবে বলা যায়, উদার, অবাধ ধর্মীয় সমন্বয় ধারায় প্রবাহিত হয়ে এই অঞ্চলে এই দুটি মতবাদ কালের বিবর্তনে চণ্ডী-মনসা-শিব-কালী ইত্যাকার আজকের লোকায়ত হিন্দুধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

যাই হোক, বর্ধমানের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-পর্য্যালোচনাকালে আপাতত আমরা আদিবাসী- উপজাতি, ব্রাহ্মণ ও গোয়ালা এই তিনটি গোষ্ঠীকে বাদ দিতে পারি, কারণ বর্ধমান জেলাভিত্তিক সংখ্যাগত বিচারে উল্লেখযোগ্য হলেও এরা একান্তভাবে বর্ধমানের স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। পশ্চিম বাংলার প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী হিসাবে আদিবাসী-উপজাতিরা যেমন পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশী ছড়িয়ে রয়েছেন, তেমনি সংকর বাঙালী জাতিসত্ত্বার উচ্চবর্ণের সদস্য হিসাবে ব্রাহ্মণরাও বিপুল সংখ্যায়

পশ্চিমবাংলার সব জেলাতেই উপস্থিত। গোয়ালা জাতিভুক্ত মানুষও পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশী ছড়িয়ে রয়েছেন। তবে, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হিসাবে এটুকু বলা যায় যে, বৈদ্য-কায়স্থ-সদগোপদের মতই বর্ধমান তথা পশ্চিমবাংলার ব্রাহ্মণজাতিও মূলত ভেড্ডিড ও অ্যালপীয় উপাদানে গঠিত—আকৃতিগতভাবে গোল ও বিস্তৃতশিরস্ক, সরু নাক ও মাঝারি উচ্চতা। রাঢ় অঞ্চলের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দাবি করেন, তাঁরা উত্তরপ্রদেশের পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর এবং আদিশূর তাঁদের কান্যকুব্জ থেকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। অতুল সুরের মতে নৃতাত্ত্বিক বিচারে এই দাবি ভিত্তিহীন কারণ দীর্ঘশিরস্ক উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিস্তৃতশিরস্ক বাঙালী ব্রাহ্মণদের জাতিগত প্রায় কোন মিল নেই। গোয়ালাজাতির নৃতাত্ত্বিক উপাদানে অ্যালপীয় মিশ্রণের (পূর্ব ইউরোপের দীনারীয় ও কতকাংশে আর্মানীয় নরগোষ্ঠীকে 'Alpine' বা 'অ্যালপীয়' বলা হয়ে থাকে।) সঙ্গে কিঞ্চিৎ আদি-অস্ত্রাল বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় ; আকৃতিগত পরিচিতি-নাতিবিস্তৃতশিরস্ক, প্রসারিত নাসা ও মাঝারি উচ্চতা।

বর্ধমান বা রাঢ় অঞ্চলের বহমান মানবধারায় প্রাচীনতম সদস্য এবং সেই সুদূর ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে আজও যারা প্রধানতম জাতি হিসাবে এই অঞ্চলে টিকে আছে, তারা হল বাগ্দী সম্প্রদায়। এই জেলার পশ্চিম অংশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে প্রাক-আর্য আমলের প্রাগৈতিহাসিক নিষাদসংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেই মৃগয়াজীবী নিষাদ-সংস্কৃতির অন্যতম উত্তরাধিকারী হল বাগ্দী সম্প্রদায় - অনেক নৃতত্ত্ববিদের এইরকম অনুমান। নৃতত্ত্বের ভাষায় বাগ্দীরা মূলত আদি অস্ত্রাল (Proto-Australoid) গোষ্ঠীভুক্ত, যদিও তার সঙ্গে অন্যান্য জাতি উপজাতির রক্তের সংমিশ্রণও রয়েছে। 'আদি-অস্ত্রাল' কথার অর্থ হল অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনেব সাদৃশ্য। যদিও নৃতত্ত্ববিদদের অন্য শিবিরের মতে, বাগ্দীরা আসলে দ্রাবিড়-নরগোষ্ঠীর বংশধর। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা মালজাতির অংশ বিশেষ। অতুল সুর লিখেছেন, 'এরা (বাগ্দীরা) ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বঙ্গদ' জাতির বংশধর কিনা তাও বিবেচ্য'। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আন্তঃজাতি অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের সূত্র অনুসারে বাগ্দী সম্প্রদায়ের আদি পিতা-ক্ষত্রিয় ও আদি মাতা - বৈশ্য। বাগ্দী জাতির মানুষেরা সাধারণত খর্বাকার, নাতিদীর্ঘশিরস্ক, নাক প্রসারিত ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ বেশ কালো ও মাথার চুল ঢেউ খেলানো। বাগ্দীদের নৃতাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে নানামুনির নানা মত থাকলেও এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই-অধুনা তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, দারিদ্রক্লিষ্ট এই বাগ্দী জাতি কিন্তু অতীতে শৌর্যে সংস্কৃতিতে এক কালে বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের দেশীয় বাঙালী রাজা-মহারাজাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-হ্রাস, উপর্যুপরি মন্বন্তর ইত্যাদি কারণে বাগ্দীদের জীবনে নেমে এসেছিল এক দারুণ বিপর্যয়। যার ফলে ক্রমক্ষয়িষ্ণু পথ ধরে নামতে নামতে আজ তাঁরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সামাজিক স্তরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পেশাগতভাবে আজ তাঁদের পরিচিতি দারিদ্ররেখার নীচের বাসিন্দা, কৃষি-মজুর, রাখাল-বাগাল, বর্গাদার ও কদাচিৎ প্রান্তিক চাষী। সেই সঙ্গে সুদূর অতীত থেকে আজও 'মৎস্যশিকার' তাঁদের উপজীবিকা। বর্ণহিন্দুদের কাছে আজও তাঁরা প্রায় অস্পৃশ্য, অথচ আশ্চর্য ঘটনা হল তাঁদের নিজেদের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে অন্য এক ধরনের জাতিভেদপ্রথা। বাগ্দীরা মোটামুটিভাবে আটটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। অবশ্য বর্ধমান জেলায় তাঁদের

চারটি উপগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এগুলি হল - (১) তেঁতুলিয়া (২) দুলে (৩) কুশমেটে (৪) মল্লমেটে অথবা মেটে।

সংখ্যাগত বিচারে বর্ধমান অঞ্চলে তথা সমগ্র বঙ্গদেশে বাগ্দীজাতির কতটা গুরুত্ব ছিল ? প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনাসূত্রে জানা যায়, মৌর্য আমল পর্যন্ত বাগ্দীরাই সমগ্র বঙ্গদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। এই প্রসঙ্গে বিগত শতাব্দীর একটি বিশেষ আদমশুমারীর পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের ক্রমোন্নত পরিবহনব্যবস্থা, বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ধারাবাহিক মাইগ্রেশনের সুবাদে আজ বাগ্দীরা পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছেন, যার ফলে বর্ধমান জেলার কোন হালফিলের আদমশুমারী থেকে তাঁদের আদি-আবাসস্থল ও নৃতাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে আজ থেকে শতাধিক বছরের আগের - ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীকে বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদেরা মাপকাটি বা প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, কারণ এ সময়ে অবস্থানগত স্থিতাবস্থা পুরোপুরি অক্ষুণ্ন ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে বর্ধমান জেলায় মোট জনসংখ্যা ছিল ২০,৩৪,৭৪৫ জন, যার মধ্যে বাগ্দীদের সংখ্যা ছিল ২, ০৫,০৭৪ জন, অর্থাৎ সেই সময়ে বর্ধমান জেলায় বাগ্দীদের অনুপাত ছিল জেলার মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশেরও বেশী। আবার ১৮৭২-র আদমশুমারীর অন্য একটি হিসাব থেকে জানা যায় সারা বাংলায় বাগ্দী-অধ্যুষিত আটটি জেলায় মোট বাগ্দী-জনসংখ্যা ছিল ৬,৪৪,১৬৮ জন। অর্থাৎ সেই আমলে বঙ্গদেশের মোট বাগ্দীদের প্রায় ৩৫ শতাংশই বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই এবং সে কারণেই সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে বর্ধমান জেলাই ছিল সর্বাধিক সংখ্যক বাগ্দীসম্প্রদায়ের বাসভূমি। এই সব তথ্য থেকে বাগ্দীদের আদি-আবাসস্থল ও তাদের বিশেষ আঞ্চলিকতার দাবিমুক্ত জেলা হিসাবে বর্ধমানকে চিহ্নিত করতে কোন অসুবিধা হয় না। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। জেলা থেকে জেলান্তরে ঘন ঘন মাইগ্রেশন প্রবণতার ফলে বর্তমানে এই জেলায় বসবাসরত বাগ্দীদের সঠিক সংখ্যাটি, আদমশুমারীর সাহায্য নিয়েও, নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে, মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ১৯৯০-এর এই প্রাক-মুহূর্তে বর্ধমান জেলায় বসবাসরত মোট বাগ্দীর অনুমানিক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। নিম্নবর্ণিত সারণী-১ থেকে বর্ধমান জেলায় মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বাগ্দীদের সংখ্যাগত ক্রমবিবর্তনের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারণী - ১

আদমশুমারি-বর্ষ	মোট জনসংখ্যা	বাগ্দীসম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যা	মোট জন সংখ্যায় বাগ্দী-জনসংখ্যার অনুপাত
১৯০১	১৫,২৮,২৯০	১,৯৭,৬২৪	১৮ শতাংশ
১৯৩১	১৫,৭৫,৬৯৯	১,৮৫,১৭২	১১ ,,
১৯৫১	২১,৯১,৬৬৭	১,৮৯,৬৭১	৮.৭৫ ,,

উপরের পরিসংখ্যানটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯০১ থেকে ১৯৫১ - মাত্র ৫০ বছরের সময় সীমায় বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যার হিসাবে বাগ্দীদের অনুপাত কমে এসেছে ৫ শতাংশেরও বেশী। বাগ্দীদের এই সংখ্যাগত ও

অনুপাতগত ক্রমাহ্রাসমান প্রবণতা থেকে যে বিশেষ লক্ষণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল অধুনা বাংলা তথা সারা ভারতব্যাপী আদিম এথনিক (ethnic) জাতিসত্ত্বাসমূহের মধ্যে যে বিলোপ-প্রবণতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, বর্ধমান তথা পশ্চিমবাংলার বাগ্দীজাতিও তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। যাই হোক, বর্ধমান জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক বাগ্দী বসবাস করলেও বর্তমানে জেলার সর্বত্র তাদের বন্টন সুষম নয়। এই জেলার পশ্চিম অংশে-আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমায় যেমন তুলনামূলকভাবে বাগ্দীদের সংখ্যা কম, তেমনি জেলার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অংশে ব্যাপক ঘনত্বে বাগ্দীরা বসবাস করেন।

বর্ধমান জেলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাগ্দীজাতির পরেই সদগোপদের স্থান। পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জাতি হিসাবে সদগোপদের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পৃথকভাবে বর্ধমান জেলার জনবিন্যাসে সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহিত তাঁদের বিরাট ভূমিকা। জাতিগত বিচারে তাঁরা অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ-করণ-কায়স্থগোষ্ঠীর প্রায় সমতুল। নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় তাঁরা বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের মতোই মূলত অ্যালপীয় উপাদান নিয়ে গঠিত। সদগোপদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সঙ্গে প্রায় সমান। এই দুই সম্প্রদায়ের মতোই তাঁরাও বিস্তৃত-শিরস্ক, কিন্তু উচ্চতায় তাঁদের তুলনায় কিছুটা খর্বকায় ও নাক ঈষৎ প্রসারিত। জাতিগত উৎসের শাস্ত্রীয় বিচারে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' প্রমাণ সূত্র অনুসারে পিতা-বৈশ্য ও মাতা-ক্ষত্রিয় ; পরাশর মতে পিতা-ক্ষত্রিয়, মাতা-শূদ্র। সামাজিকভাবে তাঁরা 'উত্তম সংকর' পর্য্যায়ভুক্ত ও 'নবশাখ' গোষ্ঠীর সদস্য। 'নবশাখ' কথার অর্থ হল যে সকল অব্রাহ্মণ জাতির হাতে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করেন । তাঁদের আদি আবাসস্থল বর্ধমান জেলা ও বর্ধমান-বীরভূমের প্রান্তিক এক কালের 'গোপভূমি'। সদগোপজাতির উৎস সন্ধানে একদিকে যেমন সংগৃহীত ঐতিহাসিকসূত্রের পরিমাণ খুবই নগণ্য, আবার অন্যদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মিথ ও জনশ্রুতির ডালপালা। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই সদগোপদের বিষয়ে কোন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করেন নি, কিন্তু বর্ধমানের সদগোপদের বিষয়ে প্রয়াত সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় ঘোষ যেন 'একাই একশ' হয়ে কলম ধরেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে বর্ধমান জেলার পশ্চিম ও উত্তর অংশে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সূত্রে যে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার অন্যতম স্রষ্ঠা, ধারক ও বাহক এই সদগোপজাতি এবং সে কারণেই এই অঞ্চল 'গোপভূম' ও সদগোপজাতিই এই অঞ্চলের গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশের পথিকৃৎ। বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার 'অমরার গড়' কে কেন্দ্র করে তিনি শুনিয়েছেন সদগোপ-রাজা মহেন্দ্রনাথ ও তাঁর মহিষী অমরাবতীর কীর্তিগাথা ও তাঁদের সুবিস্তৃত গোপসাম্রাজ্যের বিবরণী। পার্শ্ববর্তী কাঁকসা-গৌরাঙ্গপুরের ইছাই ঘোষকে তিনি বর্ণনা করেছেন উত্তর-রাঢ়ের স্বাধীন সামন্তরাজা হিসাবে এবং 'পরাক্রমশালী' সদগোপ-রাজবংশের সঙ্গে পালরাজাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র প্রমাণের চেষ্টাও করেছেন তিনি। বলা বাহুল্য, বর্ধমানের সদগোপদের এই সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য ইতিবৃত্তের সত্যাসত্য আজও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। তা সত্ত্বেও অন্তঃত এটুকু বলা যায়, বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের জাতি বিন্যাসে সদগোপ সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে এক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতি হিসাবে স্বীকৃত। বিগত দুই দশক ধরে বর্ধমান জেলার জাতিগত বিন্যাসেও তাঁদের গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রচলিত ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীটিকে পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সেই আমলে সারা বঙ্গদেশে সদগোপজাতিভুক্ত জনসংখ্যা ছিল ৬,১৬,৬৫৯ জন, যা তৎকালীন

বঙ্গদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ। আবার, এই সামগ্রিক সদগোপ জনসমষ্টির মধ্যে ১,৮৫,৮০৪ জন বাস করতেন বর্ধমান জেলায়। অর্থাৎ বঙ্গদেশের মোট সদগোপদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশই বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসরণে বলা যায়, বর্তমানে বর্ধমান জেলায় বসবাসরত সদগোপের সংখ্যা আনুমানিক আড়াই লক্ষ।

সদগোপদের পেশাগত বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের অভিমত, "সদগোপরাই পশ্চিমবাংলার পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক বলে মনে হয়।" বর্ধমান জেলার পটভূমিতে বিনয়বাবুর এই মন্তব্য অনেকটাই সঠিক ; সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজও এই অঞ্চলের সদগোপদের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের কৃষিপটভূমিতে প্রগতিশীল ও বিশেষজ্ঞ কৃষিজীবীর প্রধান স্থানটি আজও সদগোপদের দখলে। তবে, শিক্ষা ও আধুনিক কর্মজগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাম্প্রতিককালে বর্ধমান জেলাতেও সদগোপদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্ধমান জেলার মধ্যে আঞ্চলিক বন্টন সুষম না হলেও এই জেলার প্রায় সব থানাতেই কম-বেশী সদগোপদের বসবাস রয়েছে। তুলনামূলকভাবে বীরভূম-সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে আউসগ্রাম, কাঁকসা, মঙ্গলকোট, বর্ধমান শহর ও তার আশেপাশে ভাতার, মেমারী, জামালপুর থানায় সদগোপদের অধিকতর প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

বর্ধমান জেলায় আদি-আসবাসস্থল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মূলতঃ একটি মাত্র জেলাতেই নিরবচ্ছিন্ন বসবাস চরম কেন্দ্রীভূত এই ধরনের জাতিগত আঞ্চলিকতার বিরলতম দৃষ্টান্ত সম্ভবত 'আগুরী' বা 'উগ্রক্ষত্রিয়'। "আগুরী, বাগুড়ি, ধান। এই তিন নিয়ে বর্ধমান" - এই আপাতলঘু প্রবচনটিকে মোটেই অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না তথ্য ও ইতিহাসের দিকে তাকালে। সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষায় প্রচলিত ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী তৎকালীন সমগ্র অবিভক্ত বঙ্গদেশে আগুরী জাতিভুক্ত জনসংখ্যা ছিল ৬৯,৭৯১, তার মধ্যে শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই ছিল ৫৯,৮৮৭ জন আগুরীদের বসবাস। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আগুরী জাতির ৮৫ শতাংশ মানুষই বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই। বাঙালী জাতিসত্ত্বার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে অতিক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হলেও বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে আগুরীজাতিও বাগ্দী ও সদগোপদের মতোই নিঃসন্দেহে বর্ধমান জেলার প্রকৃত 'ভূমিপুত্র'।

বহিরাগত, অবাঙালী রাজাদের সঙ্গে আগুরীরা বর্ধমান তথা বঙ্গদেশে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন - এই ধরনের একটি মত প্রচলিত আছে জেলার স্থানীয় কোন কোন মহলে। বলা বাহুল্য, এই অভিমত ভিত্তিহীন, কারণ এই মতের সমর্থনে এ তাবৎ কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিনয় ঘোষ সঙ্গত কারণেই লিখেছেন, "উগ্রক্ষত্রিয়রা সম্পূর্ণ বাঙালী এবং বাংলাদেশেই তাদের বিকাশ হয়েছে," এসবের পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, কায়স্থ-সদগোপদের মতোই আগুরীরাও অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের সমতুল এবং 'উত্তম সংকর' পর্যায়ভুক্ত। বর্ধমান জেলাতে তাঁরা সামাজিকভাবে 'নবশাখে'র অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রীয় বিচারে 'সূতসংহিতা' প্রমাণসূত্র মতে তাঁদের আদি উৎস- 'করণ' পিতা ও 'রাজপুত্র'-মাতার সংমিশ্রন। মতান্তরে 'মনুসংহিতা'র বিশ্লেষণে ক্ষত্রিয় 'পিতা' ও 'শূদ্র' মাতা।

মনুর শ্লোক উদ্ধৃত করে নৃবিজ্ঞানী রিজলে আগুরীদের চিহ্নিত করেছেন - 'হিংস্রতাপ্রিয় ও নিষ্ঠুরতাবিলাসী জাতি,' যে কারণে তাঁরা 'উগ্র' বিশেষণভূষিত

'ক্ষত্রিয়'। এ কারণেই সম্ভবত তাঁরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে, 'শক্তি'র উপাসক - মহিষমর্দিনী, চামুণ্ডা, কালিকা আজও তাঁদের প্রধান আরাধ্যা দেবী। জাতিগতভাবে আগুরীদের মধ্যে রয়েছে আটটি উপগোষ্ঠী - প্রত্যেকটি উপগোষ্ঠী আবার 'কুলীন' ও 'মৌলিক' - এই দুই ভাগে বিভক্ত। তবে, বর্ধমান জেলায় আগুরীদের মধ্যে প্রধানত এই দুটি ভাগ সুত ও জানা। নিজেদের মধ্যে বর্ণগত প্রথা-প্রকরণে তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের অনেকেই সময় বিশেষে উপবীত ধারণ করেন। শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ-ইত্যাকার ব্রাহ্মণসুলভ গোত্র-পরিচিতিও প্রচলিত রয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে। তাঁদের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান রাজকীয় ক্ষত্রিয়রীতিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত এক শ্রেণীর আগুরীর বিবাহ-অনুষ্ঠানে স্বয়ম্বর সভার অনুকরণে সিংহাসন-উপবিষ্টা পাত্রীর বরমাল্য হাতে পাত্র-বরণের ছবিটি অন্য কোন বাঙালী-হিন্দুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে সচরাচর দেখা যায় না।

আগুরীদের দেশপ্রেম, শৌর্যবীর্য, যোদ্ধাবৃত্তি ও সাহসিকতা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। বর্ধমান জেলার জমিদার ও সামন্তরাজাদের অনেকেই ছিলেন আগুরী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের মধ্যে প্রচলিত রায়, চৌধুরী ইত্যাদি উপাধিগুলি আজও সেই স্মৃতি বহন করছে। পেশাগতভাবে তাঁদের জীবিকা কৃষি ও ব্যবসা। বর্ধমান জেলার বিত্তশালী ও সম্পন্ন চাষীদের অধিকাংশই আগুরী ; এই জাতির মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষরাও যথেষ্ট পরিশ্রমী ও উদ্যোগী কৃষিজীবী। তবে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আগুরী জাতির এক উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে বর্ধমান জেলার নাগরিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছেন। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বহুমুখী সুযোগ প্রসারিত হওয়ার ফলে বর্ধমান জেলার ঘেরাটোপ ছেড়ে আজ তাঁরা কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর তথা সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে, এমনকি বহির্বঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যে আগুরীরা আজও মূলত বর্ধমান জেলারই বাসিন্দা। বর্ধমান জেলা থেকে অন্যান্য জেলায় মাইগ্রেশনের পরেও বর্তমানে আনুমানিক দুই লক্ষ আগুরীজাতিভুক্ত মানুষ বসবাস করছেন বর্ধমান জেলায়। জেলার মধ্যে আঞ্চলিক বন্টন-বিন্যাসে দেখা যায়, গলসী, বর্ধমান সদর, খণ্ডঘোষ, রায়না, মেমারী, জামালপুর-এক কথায় দামোদর নদীর দুই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও ভাতার-মন্তেশ্বর-মঙ্গলকোট-পূর্বস্থলী এলাকায় ব্যাপক ঘনত্বে আগুরীরা বাস করেন। তুলনায় জেলার পশ্চিম অংশে অর্থাৎ দুর্গাপুর আসানসোল মহকুমায় ও কাঁকসা-আউসগ্রামের মতো বর্ধমান-বীরভূম সীমান্ত অঞ্চলে আগুরীদের বসবাস নগণ্য।

বর্ধমান জেলার প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হল তিলি—অন্তত অতীতের সংখ্যাগত বিচারে। শাস্ত্রীয় মতে তাঁরা 'উত্তম সংকর' পর্য্যায়ভুক্ত। সামাজিকভাবে 'নবশাখ' গোষ্ঠীর সদস্য। নৃত্যাত্ত্বিক বিচারে তাঁরা মূলত 'অ্যালপাইন' ও ভেড্ডিড ধারার সংমিশ্রণ। অবয়বগত বৈশিষ্ট্যে তাঁরা মধ্যমাকৃতি, প্রসারিত ও চ্যাপ্টা নাক, দীর্ঘমুণ্ডাকৃতি। তিলিদের জাতিগত উৎসসম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিচারে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণমতে পিতা-বৈশ্য, মাতা-ব্রাহ্মণ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীকে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ধরলে দেখা যায়, সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৯৩,২১২, তার মধ্যে ৯৩,২০৩ জন বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই। বর্ধমান জেলার জনবিন্যাসে সেই আমলে সংখ্যাগত ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের মধ্যে তাঁদের স্থান ছিল দ্বিতীয় অর্থাৎ সদগোপদের পরেই। তাই আগুরীদের উপরের স্থানটি তিলিদের দখলেই ছিল। বর্ধমান তাঁদের আদি আবাস-স্থান, অথচ যে কোন কারণেই হোক, বর্তমানে

তিলিদের অতীতের মতো সংখ্যাধিক্য দেখা যায়না। বরং সদগোপ ও আগুরীদের তুলনায় এই জেলায় এখন তাঁরা নিতান্ত সংখ্যালঘু। পক্ষান্তরে হুগলী, কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলাই বর্তমানে তিলিদের প্রধান বাসভূমি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখ্যযোগ্য তথ্য হল তিলি জাতির উৎসের শিকড়টি বর্ধমানের মাটির গভীরে থাকলেও এই জেলার প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র তাদেরই মূল পেশা কৃষি নয়। ছোট-বড় ব্যবসা ও বানিজ্যবৃত্তিই তাঁদের প্রধান জীবিকা, যদিও তাঁদের সহযোগী পেশা হিসাবে অবশ্যই কৃষির উল্লেখ করতেই হয়। বর্ধমানের জাতি বৃত্তান্ত ও জনবিন্যাস সম্পর্কিত এ তাবৎ আলোচিত অংশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙালী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গই এসেছে। কিন্তু, বর্ধমানে বসবাসরত মুসলমানদের প্রসঙ্গও এখানে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য - বৃহত্তর লোকসমাজে প্রথম বর্ধমানের কথা প্রচারিত হয় মুসলমান যুগেই। 'আইন-ই-আকবরি'তে বর্ধমানের উল্লেখ রয়েছে। অতীতে এক সময়ে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই মুসলমান-শাসনাধীন ছিল। সেই সূত্রে বর্ধমান আরও প্রত্যক্ষভাবে পাঠান-মোগল-তুর্কী শাসনের অধীনে এসেছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ - বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ-অভিযান থেকে শুরু করে টানা সাড়ে চারশ বছর বর্ধমান জেলা ছিল পাঠান-মোগল-তুর্কী শাসনের অধীন। কুতুবউদ্দীন, শের আফগান, আজিমউসশান, আলিবর্দী প্রমুখ মুসলমান শাসকদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বর্ধমানের স্মৃতি। এই সব ঐতিহাসিক কারণের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে বর্ধমান জেলায় মুসলমানদের বসবাসের বিষয়টি। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীতে বর্ধমান জেলায় মুসলমান বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ৩,৪১,৮৭৮ জন জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশ। এর তিন দশক পরে অর্থাৎ ১৯৮১-র আদমশুমারী অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৮,৫০,৯৫১ জন জেলার মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার মতোই বর্ধমান জেলার মুসলমান-বাসিন্দাদের সিংহভাগই প্রকৃতপক্ষে ধর্মান্তরিত মুসলমান। এর সমর্থনে অতুল সুর লিখেছেন, "বাঙালী মুসলমান যে হিন্দুসমাজ থেকেই ধর্মান্তরিত, তা তাদের আচার-ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায়।"

বাংলার মুসলমান শাসকদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত ভাবে খাঁটি পাঠান-মোগল বংশোদ্ভূত ও 'আগন্তুক মুসলমান' অভিধায় চিহ্নিত হলেও সেই আমলের বাঙালী মুসলমান জনসাধারণ, কিন্তু, অনতিদূর অতীতেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই শতকের গোড়ায় তৎকালীন আদমশুমারির কমিশনার ই, এ, গেট ও গবেষক বুকানন হ্যামিলটন উপযুক্ত তথ্য ও গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। অন্যান্য জেলার মতো বর্ধমান জেলাতেও এই ব্যাপক ধর্মান্তরণের প্রধান কারণ হল একদিকে ইসলামধর্ম গ্রহণের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বিজেতা মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও প্রলোভন, অন্যদিকে তৎকালীন অস্পৃশ্যতাভিত্তিক, কঠোর জাতি-বর্ণ প্রথা কন্টকিত হিন্দু সমাজে দারিদ্রক্লিষ্ট নিম্নবর্ণ হিন্দুদের উপর স্বধর্মের উচ্চবর্ণ সমাজপতি ও নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর অবহেলা, ঘৃণা ও নিপীড়ন। অবশ্য, অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন এরকম দৃষ্টান্তও আছে। এসব কারণেই সাধারণভাবে বর্ধমান জেলার মুসলমান বাসিন্দাদের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ অবান্তর কারণ ঐতিহাসিক ভাবেই তাঁরা মূলত হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাক্তন সদস্যমাত্র, তবে, আজও বর্ধমান শহরে ও জেলার কোন কোন অঞ্চলে বসবাসরত মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান

রয়েছেন যাঁদের জাতিগত ও ঐতিহ্যগত উৎস সম্ভবত পাঠান-মোগল অথবা অন্য কোন নির্ভেজাল ঐস্লামিক গোষ্ঠী। তাঁদের স্বতন্ত্র আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও তাৎক্ষণিক চোখে পড়ার মতো দীর্ঘদেহী, উন্নতনাসা, তপ্তকাঞ্চণ গৌরবর্ণ। অবশ্য ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে আজ তাঁরাও বাঙালী মুসলমান-জাতিসত্ত্বার মূলপ্রবাহে মিশে গেছেন। তবে, বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মুসলমান নিছকই ব্যতিক্রম, যা 'ধর্মান্তরিত মুসলমান' বিষয়ক মূল প্রতিপাদ্যকেই সুপ্রমাণিত করে।

বর্ধমান জেলার মুসলমান-বসবাসের কিছু স্থান বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। বিভিন্ন মুসলমান জমিদার, জায়গীরদার ও অন্যান্য মুসলমান শাসকদের প্রধান কর্মস্থলসংলগ্ন এলাকাতেই মুসলমান-বাসিন্দাদের ঘনত্ব বেশী আজও তার প্রমাণ চোখে পড়ে। এই কারণেই বর্ধমান শহর, কুসুমগ্রাম, মঙ্গলকোট, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আজও তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন।

বর্ধমান জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভিন্ন জাতির মতই এই জেলার মুসলমানদেরও মূল পেশা-কৃষি। সামাজিক অগ্রগতির নিরিখে উচ্চবর্ণ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের তুলনায় বর্ধমানের মুসলমানরা আজও কয়েকধাপ পিছনে পড়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষিতের হার কম এবং নিরক্ষরতার হার বেশী।

বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর বিবর্তনমূলক ইতিবৃত্তে ও জনবিন্যাসে আপাতদৃষ্টিতে বর্ধমানের রাজবংশের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখবো এই জেলার জনবিন্যাসে বর্ধমানের রাজবংশের রয়েছে অন্তত একটি পরোক্ষ ভূমিকা, যা অবশ্যই যথাযথ মূল্যায়নের দাবী রাখে। বর্ধমান রাজবংশের সূচনা মোটমুটিভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই রাজবংশের আদি পুরুষ সঙ্গম রায় ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষ। তিনিই প্রথম পদার্পণ করেন বর্ধমানে। এই সূত্রে আবু রায় ও বাবু রায় - তার পরে কৃষ্ণরাম রায়। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের এক 'ফরমান' মারফৎ কৃষ্ণ রাম পাকাপাকিভাবে বর্ধমানের শাসনভার লাভ করেন। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "বর্ধমানের রাজারাও বণিকের বেশে পাঞ্জাব থেকে এসে মোগলযুগে জমিদার এবং ইংরাজযুগে মহারাজাধিরাজ পর্যন্ত হন। তাঁদের রাজকীয় বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচার ও বদান্যতার নিদর্শন বর্ধমানে প্রচুর আছে।" বর্ধমানের রাজাদের সম্পর্কে বিনয় বাবুর এই মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য হলেও বাস্তবে বর্ধমান - রাজবংশের সামগ্রিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই মন্তব্য বিদ্বেষী পক্ষপাতদুষ্ট বলেই মনে হয়। প্রকৃত ঘটনা হল - 'বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী' ভূমিকার তুলনায় বর্ধমানের রাজা-মহারাজাদের 'দেশপ্রেমিক ও প্রজাস্বার্থে নিবেদিত প্রাণ কল্যাণব্রতী' ইমেজই আজও বর্ধমানের স্থানীয় জনমানসে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই, বর্ধমানের রাজাদের সম্পর্কে বিনয় বাবুর কন্ঠোচ্চারিত 'বদান্যতা' বিশেষণটিই এক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গদেশের অন্যান্য দেশীয় রাজবংশের কথা মনে রেখে নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্ধমান শহরে ও জেলার দূর মফস্বল-গ্রামীণ অঞ্চলেও বর্ধমানের রাজা-মহারাজাদের প্রজাকল্যাণের এত অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, যার তুলনা বিরল। যাই হোক, এসব অন্য প্রসঙ্গ। বর্ধমানের জনবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান-রাজবংশের ভূমিকাটিও কম তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়। কৃষ্ণরাম রায় থেকে মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ উদয় চাঁদ এর মাঝে কীর্তিচন্দ্র, চিত্র সেন, তিলক চাঁদ, মহারাণী বিষ্ণুকুমারী ও আরও অনেকে এক কথায় মধ্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মধ্য-বিংশ শতাব্দী এই তিনশ বছরের রাজত্বকে 'সুদীর্ঘ' বিশেষণে ভূষিত করা সম্ভব না

হলেও তা খুব কম সময়ও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা হল - তিনশ বছরের শাসক এই ভিনদেশী রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের আশ্রিত, পুনর্বাসিত ও পরিপুষ্ট কোন ক্ষুদ্রতম, স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীও, কিন্তু, সংযোজিত হয়নি বর্ধমানের চিরাচরিত জনবিন্যাসে, কিন্তু, ইতিহাসের পাতায় তো আমরা প্রায়শই দেখি - আমাদের দেশে দু-তিনশ বছরের রাজত্বের সুযোগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত শাসকগোষ্ঠীই কিভাবে তাঁদের আগ্রাসী মানসিকতায় নিজস্ব ধর্ম, প্রাদেশিকতা বা মতবাদের অনুকূলে গড়ে তুলেছেন এক একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী, যা আবার অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করেছে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দাপুটে গোষ্ঠী হিসাবে। বর্ধমান-রাজবংশ এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিরল ব্যতিক্রম। সমস্ত ধরণের ধর্মীয় ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছিলেন তাঁরা। সম্ভবত সে কারণেই বর্ধমান জেলার জনবিন্যাসে নিজেদের রাজকীয় প্রভাবের বীজ বপনের পরিবর্তে বংশপরম্পরায় তাঁরা নিজেদেরকে বর্ধমানের হিন্দু-বাঙালী সত্ত্বায় মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠাতার পর্য্যায়ক্রম ও আদি-আবাসস্থল তথা আঞ্চলিকতা এই দুটি বিষয়কে মনে রেখে বর্ধমান জেলার নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রধান জাতির ইতিবৃত্ত আলোচিত হল এই নিবন্ধে । বলা বাহুল্য এর বাইরেও রয়েছে আরও কয়েকটি জাতি কম-বেশী সংখ্যায় বর্ধমান জেলায় যাদের বসবাসের ইতিহাসও যথেষ্ট প্রাচীন। এই অনালোচিত জাতিসমূহে এক দিকে যেমন রয়েছে বাউরী, মুচি, ডোম, হাড়ি, প্রভৃতি তপশিলী সম্প্রদায়, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে কায়স্থ, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তাম্বুলি, বারুজীবী ইত্যাকার বর্ণহিন্দুসম্প্রদায়। এদের নিয়ে অবশ্যই বর্ধমান জেলার 'অপ্রধান-জাতিবিন্যাস' জাতীয় অন্যতর বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সুযোগের অবকাশ রয়েছে। আর ব্রাহ্মণ ও গোয়ালা এই দুটি জাতি, অন্তঃত অতীতের পটভূমিতে, সংখ্যাগত পর্য্যায়ক্রমে জেলার অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠীর দাবিদার হলেও কেন তাঁদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়নি, তার কারণও উল্লিখিত হয়েছে নিবন্ধের গোড়াতেই।

বর্ধমান জেলার জনবিন্যাস সম্পর্কিত কিছু স্বতন্ত্র আঙ্গিক (Pattern), প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। দামোদর ও ভাগীরথী বর্ধমান জেলার এই দুই নদীর দুই বিপরীত তীর সংলগ্ন গ্রামশহর নির্বিশেষে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এছাড়াও জেলার মধ্য ও পূর্ব অংশেও, যা সচরাচর 'সমতল-রাঢ়' হিসাবে পরিচিত, জনবসতির ঘনত্ব বেশী। অন্যদিকে বীরভূম সংলগ্ন বর্ধমানের উত্তরাংশ অর্থাৎ কাঁকসা-আউসগ্রামের 'জঙ্গলমহল' অঞ্চল ও জেলার পশ্চিমাংশের গ্রামাঞ্চলে এক কথায় রুক্ষ পর্বত্যময় রাঢ় অঞ্চলে জনবসতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই প্রসঙ্গে একটি কাকতালীয় তথ্য হল জেলার অধিকতর ঘনবসতি অঞ্চলের তুলনায় সাধারণভাবে কম ঘনত্বের এই শেষোক্ত অঞ্চলে তপশিলী জাতি উপজাতিদের বসবাস গরিষ্ঠতর। এই জেলার জনবিন্যাসে আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা হল নদী এখানে অনেক ক্ষেত্রে জাতিগত বিভাজিকার ভূমিকা নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খড়ি নদীর উৎস থেকে মোহনা –সামগ্রিক গতিপথের প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যাপ্তির অর্ধাংশ (উৎস থেকে একটানা কুড়ি মাইল) জুড়ে এই নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলের জনবসতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নদীর দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেমন রয়েছে আগুরী-বসবাসের প্রাধান্য, পক্ষান্তরে খড়ির উত্তর দিকের গ্রামাঞ্চলে আগুরীদের বসবাস নেই বললেই চলে। আবার, জেলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এও

অনেকসময় দেখা যায়, ছোট বড় কোন নদীর তীরবর্তী এক পাশে হয়তো রয়েছে অবিমিশ্র মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম, নদীর বিপরীত পাশের লোকালয় কিন্তু নির্ভেজাল সদগোপ বা আগুরীদের গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত। আরও একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করার মতো। বর্ধমান জেলার এমন অনেক মিশ্র বসতিপূর্ণ, এমনকি চার-পাঁচ হাজারী জনসংখ্যারও গ্রাম রয়েছে যেখানে সদগোপ বা আগুরীদের মত জেলার প্রধানতম জাতির কোন মানুষের বসবাস নেই। পাশাপাশি এই প্রবণতাও লক্ষণীয় যে, তপশীলী জাতিভুক্ত কোন মানুষের বাস নেই এমন একটিও গ্রাম বা শহর দেখা যাবেনা এই জেলাতে। আবার, সাধারণভাবে স্বীকৃত পশ্চিমবাংলার বিশেষ কয়েকটি প্রধান জাতির উপস্থিতি বর্ধমান জেলায় খুবই নগণ্য বা নেই বললেই চলে। এই জেলার 'মাহিষ্য' বা 'চাষী কৈবর্ত্যে'র প্রায় অস্তিত্ব নেই, 'তন্তুবায়' নামমাত্র, কায়স্থ, বৈদ্য, গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিকের সংখ্যাও খুব উল্লেখ যোগ্য নয়, বাগ্দীদের তুলনায় বাউরীরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। আর একটি অন্য ধরনের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় এই জেলাতে। স্বাধীনোত্তর কালে পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু বাঙালী উদ্বাস্তু পরিবার বর্ধমান জেলার বড় বড় শহরগুলিতে পাকাপাকি বাসিন্দা হয়েছেন, কিন্তু বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে উদ্বাস্তু বাঙালীদের বসবাস এখনও খুবই নগণ্য ; নদীয়া-মুর্শিদাবাদ - হাওড়া - উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও উদ্বাস্তু বাঙালীদের ব্যাপক বসবাস লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহারে এক নজরে বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত, বর্ধমান জেলার জনসংখ্যাব পরিসংখ্যান ও কিছু তুলনামূলক চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। যদিও পববর্তী আদমশুমারী আগতপ্রায়, তবুও আপাতত ১৯৮১-র আদমশুমারীকেই সরকারীভাবে সাম্প্রতিকতম প্রামাণ্য তথ্যসূত্র হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ১৯৮১-র আদমশুমারী অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৮,৩৫,৩৮৮-যা পশ্চিমবাঙলার মোট জনসংখ্যার ৮.৮৬ শতাংশ এবং সংখ্যাগতভাবে রাজ্যের জেলাওয়ারী পর্য্যায়ক্রমে বর্ধমানের স্থান ছিল তৃতীয়। জেলার মোট জনসংখ্যায় বিভিন্ন পর্য্যায়ে বন্টন ছিল এই রকম ঃ মোট পুরুষ ২৫,৪৮,৬০৩, মহিলা ২২,৮৬,৭৮৫, তপশিলী জাতি ১২,১৩,৪৩৫, তপশিলী উপজাতি ২,৭৮,১৯১। এই জেলায় মোট জনসংখ্যায় তপশিলী জাতির অনুপাত ২৫.০৯ শতাংশ। তপশিলী উপজাতিদের ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক গড় অনুপাত যেখানে ৫.৬৩ শতাংশ, সেখানে বর্ধমান জেলায় এই অনুপাত ৫.৭৫ শতাংশ। গ্রাম শহরের বাসিন্দাদের তুলনামূলক হিসাবে দেখা যায় বর্ধমান জেলার মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা ৩৪,১৪,২১৯ এবং শহরে জনসংখ্যা ১৪,২১,১৬৯। এর অর্থ হল এই জেলায় ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং ৩০ শতাংশ শহরে। পুরুষ মহিলার তুলনামূলক হিসাবে অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ৮৯৭ জন, রাজ্যভিত্তিক এই গড় অনুপাত হল প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলা ৯১১।

বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি,মি,তে যেখানে ৬৮৮, সেখানে রাজ্যের গড় ঘনত্ব ৬১৫। এখানে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হল মোট জনসংখ্যায় যেখানে বর্ধমানের ক্রমিক স্থান তৃতীয়, সেখানে গড় ঘনত্বে বর্ধমানের ক্রমিক স্থান সপ্তম। জেলার বাসিন্দাদের জাতিগত ও ধর্মভিত্তিক বন্টন-বিন্যাসে দেখা যায় হিন্দু ৩৯,৩৮,৩৭৬, মুসলমান ৮,৫০,৯৫১, বৌদ্ধ - ৭৬৯, খৃস্টান - ২২,৯৭০, শিখ - ১৪,১০৬, জৈন - ১৪৩২, অন্যান্য - ৬,৭৮৬। বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার - ২.৩৫ শতাংশ (রাজ্যভিত্তিক গড় বার্ষিক হার - ২.৩২

শতাংশ)। উপরোক্ত পরিসংখ্যান গুচ্ছের সময়সীমার পর আমরা প্রায় আট বছর অতিক্রম করেছি। জনসংখ্যার বিন্যাস সম্পর্কিত ঠিক এই মুহূর্তে বর্ধমান জেলার অবস্থাটি কি রকম ? বলা নিষ্প্রয়োজন ঠিক এই সময়ভিত্তিক কোন স্বীকৃত বা প্রামাণ্য পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজনের খাতিরে, ১৯৮১-র আদমশুমারী অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যার সঙ্গে কুড়ি শতাংশ যোগ করলে বর্তমান জনসংখ্যার একটি আনুমানিক হিসাব পাওয়া সম্ভবপর এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্য্যায়ে উপরোক্ত হারে শতাংশের অনুপাতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত খুঁটিনাটি তথ্যাবলীর মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, পশ্চিমবাংলার 'জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জনসংখ্যার বিন্যাস' শীর্ষক পটভূমিতে বর্ধমান জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। আগামী দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রে লভ্য উপকরণ এই জেলার জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের উপর হয়তো নতুনতর আলোকপাত করবে। রাষ্ট্রের তৃণমূল স্তর থেকে অর্থাৎ জেলা তথা আঞ্চলিক ভিত্তিভূমি থেকে বিভিন্ন জাতি সত্ত্বার পরিচিতি মূলক স্বাতন্ত্রের (Indentity) প্রকৃত মূল্যায়ন ও তার সুষম বিকাশের প্রক্রিয়াটি তরান্বিত হতে পারে এবং এইভাবেই অর্থবহ হয়ে গড়ে উঠতে পারে রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে অখণ্ড 'জাতি ' (Nation) সম্পর্কিত ধারণা। সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের আঞ্চলিক ভিত্তিমূল থেকে উৎসারিত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, অজস্র 'বৈচিত্র্যে'র মধ্যে দিয়ে নিশ্চিতভাবে ফুটে উঠবে প্রকৃত 'জাতীয় সংহতি'র 'মিলনে'র সুর।

তথ্যসূত্র :-

১। বাঙালীর ইতিহাস - নীহার রঞ্জন রায় (আদি পর্ব)
২। বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় - অতুল সুর
৩। বাংলার লোকসংস্কৃতি - আশুতোষ ভট্টাচার্য
৪। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি - বিনয় ঘোষ
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন
৬। The Tribes and Castes of Bengal – H. H. Risley
৭। Annals of Rural Bengal – W. W. Hunter
৮। বর্ধমান পরিচিতি - অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী
৯। আদমশুমারী রিপোর্ট, ১৯৮১

সারণী - ২

আদমশুমারি, ১৯৮১ অনুযায়ী বর্ধমান জেলার জাতি ও সম্প্রদায় ভিত্তিক বিস্তৃত পরিসংখ্যান

জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম	জনসংখ্যা
১। অ-তপশিলী বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, উগ্রক্ষত্রিয়, তিলি ও অন্যান্য)	২৪,৪৬,৭৫০
২। তপশিলী জাতি :	
(ক) বাগ্দী	৩,৮৫,১৩০
(খ) বাউরি	২,১৫,৭৬২
(গ) চামার	১৫,৩১৯
(ঘ) ডোম	৫৯,৮৩৬
(ঙ) নমশূদ্র	১,১২,৩২১
(চ) অন্যান্য	৪,২৫,০৬৭

৩।	তপশিলী উপজাতি	২,৭৮,১৯১
৪।	মুসলমান সম্প্রদায়	৮,৫০,৯৫১
৫।	অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (বৌদ্ধ, খৃস্টান, শিখ, জৈন ও অন্যান্য)	৪৬,০৬১
	সর্বমোট জনসংখ্যা	৪৮,৩৫,৩৮৮

সংযোজন - ১

বর্তমান নিবন্ধকার 'উগ্রক্ষত্রিয়' বা 'আগুরী' বা 'আগরি' সম্পর্কে বিনয় ঘোষের মতকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বর্ণ সংকর। এ তথ্য প্রায় সকল নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন। উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরিরাও বর্ণসংকর এই মতটা প্রায় সকলেরই। কিন্তু এখানে একটা গুরুতর প্রশ্ন আছে যা নিয়ে মতভেদের বয়স প্রাচীন। বাঙালীদের মধ্যে চতুবর্ণের মধ্যমবর্ণ ক্ষত্রিয় প্রায় অনুপস্থিত । এদেশে যারা যুদ্ধ বিগ্রহে যোগ দিত বিভিন্ন রাজা, নবাব এবং পরবর্ত্তীকালে জমিদারদের সৈন্যবাহিনীতে মূলতঃ তারা বাগদী বা বর্গক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সাহস এবং বাহুবলে এবং স্বভাবের উগ্রতায় এদের সমকক্ষ অন্যকেউ ছিল না। তাছাড়া আরও একটা কথা। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ রাও বহিরাগত। পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন 'কায়স্থ' এসেছিলেন বলে কুলপঞ্জিকারেরা স্বীকার করেছেন। এঁদের সঙ্গে অথবা পরে ক্ষত্রিয়রাও কি বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন ?

রাঢ় সংস্কৃতির নিরলস গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদরের মানুষ। তাঁর মত হ'ল, 'আগরি' বর্ণাশ্রমী ক্ষত্রিয় নয়। স্বভাবে এঁরা একাধারে শিল্প প্রবণ এবং 'চন্ড' বা 'উগ্র'। উগ্রক্ষত্রিয়দের কুলদেবী হলেন ক্ষীরগ্রামের (পলাশী ক্ষীরগ্রাম) দেবী 'যোগাদ্যা' চণ্ডী। যোগাদ্যার পূজায় কিছু কাল আগে পর্যন্ত নরবলি দেবার প্রথা ছিল। এ হেন চামুণ্ডা দেবীর উপাসক বা 'দেউলে' বা 'নায়েক' হল আগরি বা উগ্রক্ষত্রিয়। 'যোগাদ্যা' প্রাচীনা দেবী - প্রাক্ আর্য্য যুগে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল অনুমান করা যায়। বাংলাদেশে আর্য্য আগমন ঘটেছে অনেক দেরীতে। আর আগরি বা উগ্রক্ষত্রিয়রা এই অঞ্চলের প্রধান শাসক বা রাজা ছিলেন কোনদিন এমন রাজবংশেরও কোন ইতিহাস এখনও অনাবিস্কৃত। গলসীর নিকট মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রলেখে 'অগ্রহার' কথাটি রয়েছে 'ব্রহ্মোত্তর গ্রাম' অর্থে। 'অগ্রহার' খাজনা আদায়কারী অর্থাৎ সামন্ত ছিলেন অনুমান করে নেওয়া যায়। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল খ্রীষ্টীয় একাদশ - দ্বাদশ শতাব্দীর এক সার্বভৌম নরপতি পাল বংশের রামপালের (খৃঃ ১০৭৭ - ১১২০) 'ভাস্কর ময়গল সী' বা 'ভাস্কর মদ্‌কল সিংহ' নামে একজন সামন্ত রাজার উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ঐতিহ্যময় উচালন অঞ্চল' শিরোনাম প্রবন্ধে । সামন্তরাজা স্বাধীন সার্বভৌম রাজা নন। সুতরাং তাঁকে বর্ণাশ্রমী ক্ষত্রিয় হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অতএব রহস্য থেকেই গেল। আর একটা কথা। ক্ষত্রিয় আর উগ্রক্ষত্রিয় যদি সমার্থক শব্দ হবে তাহলে কেবলমাত্র বর্ধমানভুক্তিতেই এই জনগোষ্ঠীর বিচরণভূমি কেন ? বিনয় ঘোষ গোপ রাজাদের সঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়দের সংযোগ থাকা সম্ভব এরকম ইঙ্গিত স্পষ্ট করেই দিয়েছেন তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" গ্রন্থে । গোপ এবং সদ্‌গোপদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ । সুতরাং উগ্রক্ষত্রিয়রা যে 'দেশজ' এর স্বপক্ষে তার অনুমান মেনে নিলেও সদগোপ বা গোপ থেকে উগ্রক্ষত্রিয় যে চেহারা স্বভাব এবং সংস্কৃতিতে পৃথক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মোট কথা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা 'প্রায় ক্ষত্রিয়' জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি নিয়ে বির্তকের অবসান হতে এখনও বাকি।

এই বিতর্কের মীমাংসাকল্পে একটা উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হরিচরণ বন্ধুর 'রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়' নামক বইটি। ১৪৬ পাতার এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৩ সালে। বইটি যে সে সময়ে জনসাধারণের কাছে আদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ এই যে বাংলা ১৩৪৭ সালে

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইতে হরিচরণ বন্ধু মহাশয় 'বেদ, উপনিষদাদি ও জৈন ধর্মশাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি' ও উদ্ধৃতির সাহায্যে রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়ের অভিন্নতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন । তাঁর মত এই রকম ঃ ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধোপজীবী রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ রাঢ়প্রদেশে "অগ্রহার" লাভ করে ক্রমশঃ সামন্ত-নৃপতি-পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং বলবান, সাহসী ও যুদ্ধকুশল ছিলেন বলে তাঁরা বেদ উপনিষদাদি গ্রন্থে উল্লিখিত "উগ্রপুত্র" আখ্যার মত "উগ্রক্ষত্রিয়-সুত" আখ্যা লাভ করেছিলেন। এই উগ্রক্ষত্রিয় সামন্ত নৃপতিদের অন্যতম 'রত্নাকর' বংশে পাল সম্রাটগণের এবং 'সোম' বংশে সেন রাজগণের উদ্ভব হয়েছিল।

হরিচরণ বাবুর এই মত গ্রহণ করলে মানতে হয় যে পালবংশের আদিপুরুষ গোপাল উগ্রক্ষত্রিয় বা রাজপুত ছিলেন এবং যেহেতু রাজপুতরা রাজপুতানার অধিবাসী ছিলেন অতএব তাঁরা বহিরাগত। গোপাল বাংলাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজা। তাঁর পূর্বপুরুষদের কাহিনী জানার উপায় নেই। তাহলে তিনি এবং তার পূর্বপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন কিভাবে প্রমাণ করা যাবে ? ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল তার প্রবন্ধে যে রামপালের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি এই গোপালেরই বংশধর এবং তার অন্যতম সামন্তরাজা 'ভাস্কর ময়গল সী' উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি ছিলেন সে কথা বলেছেন। পাল রাজার অধীনস্থ সামন্ত রাজাও উগ্রক্ষত্রিয় এবং পালরাজারাও উগ্রক্ষত্রিয় ? গোলমাল মিটছে না। অন্যদিকে সেন বংশের শেষ পুরুষ লক্ষণ সেন জানা ইতিহাসের অনেক কাছের মানুষ। আজ থেকে আটশো বছর আগে বাংলাদেশে মুসলমান যুগের প্রারম্ভে লক্ষণসেন বিরাজমান ছিলেন। তিনি যদি 'সোম' বংশীয় উগ্রক্ষত্রিয় হবেন তো পরবর্ত্তীদিনে সে বংশের উত্তরপুরুষদের আরও বিস্তৃত ইতিহাস এতদিনে আমরা পেয়ে যেতাম।

পরবর্ত্তীকালে বর্ধমানে যে প্রধান জমিদার বংশ প্রায় ৩০০ বছর ধরে একচ্ছত্র জমিদারী পরিচালনা করেছেন তাঁরা ছিলেন বহিরাগত লাহোর প্রদেশের কোটলী মহল্লার রাজপুত ক্ষত্রী। বর্ধমানের বিত্তবান উগ্রক্ষত্রিয়া যে বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্বন্ধে যুক্ত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সঙ্গম রায়ের বংশলতিকা সমাপ্ত হলে বর্ধমান রাজবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় যে দত্তকপুত্রদের দ্বারা তাঁদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উপাধি ছিল কাপুর বা কর্পূর। এঁরাও বহিরাগত পাঞ্জাবী ক্ষত্রী। বর্ধমানে অন্যান্য যাঁদের বিশাল জমিদারী ছিল যাঁরা সরাসরি ইংরেজের তহবিলে আদায় জমা দিতেন) তাঁরাও উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন না। যদিও পত্তনিদারদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উগ্রক্ষত্রিয় বা অর্থাৎ মল্লসারুল তাম্রলেখে উল্লিখিত 'অগ্রহার'রা এবং রামপালের সামন্ত নৃপতি আগরিরা। সেই সময় থেকে দেখলে আজপর্যন্ত প্রায় চোদ্দশ বছর ধরে 'জমি' কে কেন্দ্র করেই উগ্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী বিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং উগ্রক্ষত্রিয়রা যে এক ধরনের উত্তম বর্ণসংকর এ দেশের মাটিতেই যে তাঁদের জড় খুঁজে বার করা যেতে পারে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

(১) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের প্রবন্ধটি বাংলা ১৩৬৮ সালে 'বর্ধমান' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

(২) শ্রী হরিচরণ বন্ধুর বই 'রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়' কলকাতা থেকে বাংলা ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হয় (২য় সংস্করন)। প্রকাশক ঃ দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রায়।

সংযোজন - ২

বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির নাম।

[বর্ধমান জেলার জাতি ও উপজাতিদের নাম আলাদা করে পাওয়া গেল না বলে দুটি জেলার জাতি ও উপজাতির নামের যুগ্ম তালিকা দেওয়া হোল - সম্পাদক]

অগ্রদানি ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, আগুরী, উগ্রক্ষত্রিয়, একাদশ তিলি, একাদশ তেলী, ওরাঙ, কর্মকার, কলু, কলে, কাপালিক, কাপালী, কামার, কাহার, কাহাল, কায়স্থ, কাঁদু বা কঁন্দু বা কান্দু, কাঁসাই, কুইরি বা কুইরী, কুরি বা কুরী, কুর্মি বা কুর্মী, কুশ, কুশমেটে বা কুসমেটে, কেওড়া, কেদল, কেয়ট, কৈবর্ত, কোঙার, কোটাল, কোল, কোড়া, ক্ষত্রিয়, ক্ষেত্রী, খয়রা, খাসি বা খাসী, খুনিয়া, খৃষ্টান, গণক, গন্ধবণিক, গরাই, গড়ই, গড়াই, গাড়োয়াল, গুড়া, গোপ, গোয়ালা, ঘাটোয়াল, ঘাসী, ঘুণিয়া, চণ্ডাল, চর্মকার, চামার, ছত্রি বা ছত্রী, ছত্রি ক্ষত্রিয়, ছুতার, জেলে, জোলা, ডোম, তপশীল হিন্দু, তাম্বলি বা তাম্বুলী তাঁতি বা তাঁতী, তিলি বা তেলী, তেঁতুলে বাগদী, দুর্লভ, দুলে, দেবনাথ, দেশওয়ালি বা দেশওয়ালী বা দেশোয়ালী, দেশপুরোহিত, দ্বাদশ তিলি, ধীবর, ধুনিয়া, ধোবা বা ধোবা, নবশাখ বা নবশাঁখ, নমঃশূদ্র, নাপিত, পদ্মান, পরামানিক, পল্লবগোপ, পটিকার, পোদ, পোদ্দার, প্রামাণিক , বণিক, বর্গক্ষত্রিয়, বর্ণক্ষত্রিয়, বর্ণহিন্দু, বাউলী, বাউরী, বাগদী, বাগল বা বাগাল, বাদ্যকর, বারুই, বারুজীবী, বায়েন, বেনে, বেলুতি, বৈদিক ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ব্যগ্র ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ভট্টরায়, ভুইয়া বা ভুঁইয়া বা ভুঁক্রা, ভূমিজ, ভূমিহার, মণ্ডল, মহাতো, ময়রা, মাঝি, মাল, মালাকার, মালি বা মালী, মালো, মাড়োয়ারী, মাহাতো, মাহারী, মাহালী, মাহিষ্য, মুচি, মুন্ডা (মুন্না), মুসলমান, মুড়া, মেটিয়া, মেটে, মেথর, মোদক, যাদব, যুগী, যোগী, রজক, রাজওয়ার বা রাজোয়ার, রাজপুত, রাজবংশী, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, রুইদাস, বেওয়ালী, লোহার, শাঁখারী, গুড়ি বা শুঁড়ি বা শুঁড়ী, শূদ্র, সদগোপ, সৎচাষী বা সদচাষী, সরাই, সরাক, সর্দার, সহিস, সামন্ত, সাহা, সাঁওতাল, সুন্তিক, সুবর্ণবণিক, সুমণ্ডল, সূত্রধর, সেটগুল, সৌমণ্ডল, স্বর্ণকার, স্যাকরা, হাড়ি বা হাড়ী বা হাঁড়ী এবং হিন্দু।

[সূত্র : "পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা" পঞ্চম গণ্ড (১৯৮২) সম্পাদক : অশোক মিত্র ।]

মন্তব্য : (১) আগুরী এবং উগ্রক্ষত্রিয় আলাদা জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

(২) ক্ষত্রিয়, ক্ষেত্রী, ছত্রি বা ছত্রী, ছত্রি ক্ষত্রিয়, বর্গক্ষত্রিয় এরা কি ভিন্নজাতি এবং বহিরাগত ?

(৩) নবশাখ বলে কি আলাদা জাতি ছিল ? বর্ণ হিন্দু এবং হিন্দু, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ বলতে কি ভিন্ন জাতি অথবা গাঁই বোঝাচ্ছে ?

সংযোজন - ৩

১৯০১ থেকে ১৯৮১ পর্য্যন্ত বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য [আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী]

(ক)

সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯০১	১,৫২৮,২৯০ জন
১৯১১	১,৫৩৩,৮৭৪ ,,
১৯২১	১,৪৩৪,৭৭১ ,,
১৯৩১	১,৫৭৫,৬৯৯ ,,
১৯৪১	১,৮৯০,৫৩২ ,,
১৯৫১	২,১৯১,৬৬৭ ,,
১৯৬১	৩,০৮৩,৫৬৭ ,,
১৯৭১	৩,৯১৬,১৭৪ ,,
১৯৮১	৪,৮৩৫,৩৮৮ ,, (পঃ বঃ ৫৪,৫৮০,৬৪৭ জন)

(খ) ১৯৮১ সালে জেলায় মোট পুরুষের সংখ্যা = ২,৫৪৮,৬০৩ জন

১৯৮১ ,, ,, ,, মহিলার ,, = ২,২৮৬,৭৮৫ জন

মোট = ৪,৮৩৫,৩৮৮ জন

এই জনসংখ্যার মধ্যে শহরে বসবাস করেন	= ১,৪২১,১৬৯ জন
এই ,, , গ্রামে ,, ,,	= ৩,৪১৪,২১৯ জন

(১৯৭১-৮১ দশকে বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে লোক বেড়েছে হাজারে ১৩৯ জন, শহরাঞ্চলে ৫৯৮ জন)

(গ)	প্রতি বর্গ কি, মি, বসবাস করেন	= ৬৮৮ জন (পঃ বঃ ৬১৫ জন)
	প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা	= ৮৯৭ জন (পঃ বঃ ৯১১ জন)
	শিক্ষিতের হার	= ৪২.৪৩% (পঃ বঃ ৪০.৯৪ জন)
	তপশীলি জাতি মোট জনসংখ্যার	= ২৫.০৯% (পঃ বঃ ২১.৯৯%)
	তপশীলি উপজাতি মোট জনসংখ্যার	= ৫.৭৫% (পঃ বঃ ৫.৬৩%)
	গ্রামের সংখ্যা	= ২৬৭৯ টি (পঃ বঃ ৪১,১১২ টি)
	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (১৯৭১-৮১)	= ২৩.৪৭% (পঃ বঃ ২৩.১৭%)

মন্তব্য : (১) ১৯১১ থেকে ১৯২১ এর দশকে কি বড়রকমের দুর্ভিক্ষ বন্যা বা মহামারী হয়েছিল ? এই দশকে প্রায় ১ লক্ষ লোক কমে গেছে।)

(২) ১৯০১ থেকে ১৯৬১ - ৬০ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। অনুমান করা যায় যে ১৯৮১-এ জনসংখ্যা ১৯৬১-র দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ ৬০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। ১৯৪১ থেকে ১৯৬১ এই কুড়ি বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হয়েছে ১০ লক্ষ। এই সময়ে বাইরে থেকে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে এ জেলায় মূলতঃ আসানসোল, দুর্গাপুর অঞ্চলে। খোদ বর্ধমান শহরে এবং কালনা কাটোয়া মহকুমায়ও লোক বেড়েছে প্রচুর। এর একাংশ পূর্ব বাঙলা থেকে এসেছেন।

বাংলা সাহিত্যে বর্ধমানের দান

বারিদবরণ ঘোষ

প্রত্যেক দেশেই স্থানীয় সাহিত্য বলে একটা ব্যাপার থাকেই। এই স্থানীয় সাহিত্য একদিকে যেমন একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণের তৎকালীন দলিল হয়ে থাকে, তেমনি সমসাময়িক ভাষাবৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ এবং কিছু বাস্তব কাহিনীরও তারা আকর হয়ে থাকে। জেলা ভিত্তিক সাহিত্য চর্চায় এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে। তবে রচনার বহুজনগ্রাহ্যতা এবং চিরন্তনতা অচিরে স্থানিক সাহিত্যকে সর্বজনীন সাহিত্যে পরিণত করে। তখন তাকে আর স্থানের গন্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। কাশীরাম দাস জন্মসূত্রে বর্ধমানের অধিবাসী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর মহাভারত এখন বাঙালী কেন ভারতেরই জাতীয় সম্পদ। তবুও মানুষ গৌরব করেন তাঁর কাছের মানুষকে নিয়েই। স্বভাবতই বর্ধমানের মানুষের কাছে বর্ধমানের সাহিত্যিকেরা, মনীষীরা আপনজন। লোকজীবনে যদি এই স্থানিক গুরুত্ব না থাকতো তবে জাতীয়তা বোধ ধীরে আন্তর্জাতিকতায় পরিণত হতে পারতো না।

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলা বিস্তারে এবং প্রাচীনত্বে গৌরবজনক স্থানের অধিকারী। এর জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় ধর্মের বিস্তারের ইতিহাস, এর মৃত্তিকাগঠনে আছে প্রাচীন পৃথিবীর স্তরবৈশিষ্ট্য, এর মাটির উর্বরতা একে পরিচিত করেছে রাঢ়ের শস্যভান্ডার রূপে। যেখানে আর্থিক প্রাচুর্য থাকে সেখানে সংস্কৃতির নানা বিকাশ সহজসাধ্য হয়। অবশ্য সাহিত্যিকের মধ্যে সংগ্রাম না থাকলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। শিশু যদি 'ওদনের' জন্য না কাঁদত, তবে মুকুন্দরাম ব্যর্থ হতেন। অনেক লাঞ্ছনা-কারাবাস ভারতচন্দ্রের কাব্যের 'রাজকন্ঠের মণিমালা' নির্মাণ করেছে।

।।২।। বাংলা সাহিত্যের সূচনা যখন হল, তখন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে কেউ বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন কিনা জানি না। তবে বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যের ভূগোলে বর্ধমান তার একটা নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। আমরা বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে চাইছি। নইলে হয়তো প্রবল উৎসাহে কোনো এক চন্ডীদাসকে বর্ধমানের কেতুগ্রাম থেকে বীরভূমের নানুরে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু কবি মালাধর বসুকে নিয়ে বির্তকের কোনো স্থান নেই। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হয়ে আজও জীবিত। এর রচনাকাল ঃ তেরশ পঞ্চানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ।। কোনো হেঁয়ালী নেই, অঙ্কস্য বামাগতির কোনো হিসাবে নিকেশ নেই- একেবারে সোজাসুজি রচনা সমাপ্ত কাল ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ। মালাধরের জন্ম স্থান কুলীন গ্রাম মেমারীর সন্নিকটে। কুলীন গ্রাম সম্পর্কে চৈতন্যদেব মন্তব্য করেছিলেন ঃ কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চড়ায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।। মালাধর বসুর বংশজকে তিনি বলেছিলেন - তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।। মালাধরই বর্ধমান জেলাকে প্রথম সাহিত্যের জয়মাল্যটি পড়িয়ে গেছেন।

তাঁর সমসাময়িক কালেই বাংলা সাহিত্যে দুটি ধারা বিশেষভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল মঙ্গল কাব্যের ধারা এবং বৈষ্ণব কাব্যের প্রবাহ। মনসামঙ্গল

কাব্যের রচয়িতা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্ভবত বর্ধমান জেলারই অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথে যে সব স্থানের উল্লেখ করেছেন তা সবই আধুনিক বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে - যেমন পুরনো দামোদরের খাত বেয়ে বেহুলার ভেলা ভেসে যাচ্ছে - বাঁকা - বেহুলা - বল্লুকা - গাঙ্গুরের তীরে তীরে।

মঙ্গল কাব্যের আর কবি (তাঁর কাব্যে নাম তিনি জগতীমঙ্গলও বলেছেন) রসিক মিশ্রের বাড়ি ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমে সেনভূম পরগণায় কাঁকুটীনন্দনপুর গ্রামে। পরে অবশ্য তিনি বাঁকুড়ায় গিয়ে বসবাস করেন।

চণ্ডীমঙ্গলের সুখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। বর্ধমানের রত্না নদীর কূলে দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে তাঁর বাস ছিল। কবি নিজেই বলেছেন - দামুন্যায় করি কৃষি। দামিন্যা যাঁর তালুক ছিল সেই গোপীনাথ নন্দী বাস করতেন দামোদরের পূর্বতীরে জামালপুর থানার অন্তর্গত সেলিমাবাদ শহরে। অনেকে মনে করেন বর্ধমান ছেড়ে বাঁকুড়ায় যাওয়ার পর তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। তা ঠিক নয়। তঁর এই বিখ্যাত কাব্যটির প্রথমাংশ লিখিত হয়েছিল দামিন্যাতেই। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর কাব্য রচিত হয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুই প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী এবং ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার মানুষ ছিলেন। রূপরামের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতির পাশে শ্রীরামপুরে - দামিন্যা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। সেখানে তাঁর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি টোল ছিল। পাসন্ডা, আড়ুই প্রভৃতি গ্রাম কাছেই। পলাশনও খুব দূরবর্তী নয়। পলাশনের বিলেই ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়ে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য লেখেন। পরে তিনি উচালন কাজি পাড়ায় বাস করতেন। পড়তে যেতেন চার কি মি দূরের শাকনারা গ্রামে। শোনা যায় পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি এক হড়ডিপ তনয়ার প্রতি আসক্ত হন। রূপরামের কাব্য সমস্ত বর্ধমান বিভাগ জুড়ে মিলেছে।

আর ধর্মমঙ্গলের কাব্যের সবচেয়ে শিক্ষিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল কৈয়ড় পরগনায় কৃষ্ণপুর গ্রামে দামোদরের দক্ষিণতীরে বর্ধমান শহর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে। মামার বাড়ি রায়না। ঘনরাম নিজে বর্ধমান মহারাজার বৃত্তিভোগী ছিলেন।

জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়
মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র রায়।
আশীর্বাদ করি তার বসিয়া বারামে
কইয়ড় পরগনা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।

মহারাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতই সম্ভবত তিনি লিখেছিলেন 'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ'।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপর এক কবি নরসিংহ বসুর পৈতৃক নিবাস ছিল বসুধা পানাগড় থেকে ইলামবাজার যাবার পথে অজয়ের উপর সেতুর কাছে। বসুধা থেকে তাঁর পিতামহ এসে বাস করেন বর্ধমান শহরের ৮ কিমি দক্ষিণে শাঁখারিতে - ঘনরামের বাসস্থান কৃষ্ণপুরের কাছে। তিনিও প্রথমে শাঁখারির জমিদার ও পরে বর্ধমান মহারাজার প্রশংসা করেছেন।

অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।

তিনিও দামিন্যায় গেছিলেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাব্যরচনা আরব্ধ হয়।

কবি হৃদয়রাম সাউও ধর্মলেখা শেষ করেন ১১৪৬ বঙ্গাব্দে। তাঁর বাড়ি ছিল বনপাশ স্টেশনের কাছে। খুরুল গ্রামে :

নিরঞ্জনচরণে সদাই অভিলাষ
ইহা গাইল হৃদয় সৌ খুরুলে যার বাস ।।

ঘনরামের বাড়ি কৃষ্ণপুরের কাছে সেহাড়া গ্রামে বাস করতেন ধর্ম মঙ্গলের আর এক কবি রামকান্ত রায়। তাঁর আত্মকাহিনীতে দক্ষিণরাঢ়ের চাষী পরিবারের ১৮ শতকের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজ তেজচন্দ্রের জমিদারি এই গ্রামে। পিতা বেকার রামকান্তকে চাষের কাজে যেতে বললে তিনি নারাজ হয়ে শেষে মাঠে চাষ দেখতে গেলেন। সেখানেই তার ধর্মঠাকুরের দর্শন ঘটে।

।। ৩ ।। অনুবাদ কাব্যের মধ্যে মধ্যযুগের সেরা অনুবাদ ছিল দুটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত। কাশীরাম দাস বর্ধমানেই কবি ছিলেন বলে একাংশেরা দাবী করেন। কাশীরাম এবং গদাধর দাস দুজনেই 'সিদ্ধি' বা 'সিঙ্গি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলেছেন। কাটোয়ার অনতিদূরে সিঙ্গিগ্রামে কেশেপুকুর এবং 'কাশীরামের ভিটা' আবিস্কৃত হলে সিঙ্গিগ্রামেই কাশীরামের বসতি ছিল বলে দাবী উঠল। আর 'সিদ্ধি' - পন্থীরা দাবী করলেন অগ্রদ্বীপের কাছের সিদ্ধিতে কাশীরাম জন্মেছিলেন। আমরা বিতর্কে যেতে চাইছি না। যদি তিনি সিঙ্গির লোক হয়ে থাকেন তবে বর্ধমানের সাহিত্য চর্চায় তাঁর গৌরবজনক ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হয়।

কাশীরামের পুত্র দ্বৈপায়ন দাস এবং ভ্রাতুস্পুত্র (কেউ কেউ এঁকেও পুত্রই বলেছেন) নন্দরাম দাস ও মহাভারতের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। বর্ধমান মহারাজা মহতাপচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের নারীপর্ব অনুবাদক করেছিলেন বর্ধমানেরই আর এক কবি রামলোচন। রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্রের অনুবাদ জগদ্রাম রায় এবং রামপ্রসাদ রায় ছিলেন পিতা ও পুত্র এবং দামোদর তীরবর্তী ভুলুই গ্রামের অধিবাসী। আর সমসাময়িক সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও বাংলা লেখকদের মধ্যে গ্রন্থসংখ্যায় যিনি সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন সেই রঘুনন্দন গোস্বামীর বাড়ি ছিল মানকর স্টেশনের কাছে মাড়ো গ্রামে। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইটির নাম "রাম রসায়ন" (রচনাকাল ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ)।

।। ৪ ।। বৈষ্ণব কবিদের এক বৃহত্তর অংশের বসবাস ছিল বর্ধমান জেলার নানা গ্রামে। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ যদিও ঝামটপুরের অধিবাসী ছিলেন তবুও তাঁর বিখ্যাত চৈতন্য জীবনীটি বর্ধমানে বসে লেখা হয়নি। তবে তাঁর জীবনের শিক্ষা দীক্ষার সূচনা এই গ্রামেই হয়েছিল। বাংলা চৈতন্য জীবনীর প্রথম রচয়িতা বৃন্দাবন দাস জন্মসূত্রে বর্ধমানের মানুষ না হলেও গুরু নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তিনি বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দেনুড়ে এসে বসবাস করেছিলেন। দেনুড়ে বৃন্দাবন দাসের পাট রয়েছে এখনও।

অবশ্য চৈতন্য মঙ্গলের দুই কবি জয়ানন্দ দাস এবং লোচন দাস দুজনেই বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। লোচন দাসের পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুই-এরই নিবাস ছিল কোগ্রামে। আধুনিক মঙ্গলকোটের কাছে। তাঁর 'প্রেমভক্তিদাতা গুরু' নরহরিদাস সরকারের বাড়িও বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে। এই গুরু সম্পর্কে নানা উচ্ছ্বসিত

মন্তব্য তাঁর চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে যত্রতত্র। নরহরি চৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

জয়ানন্দের বাড়ি ছিল মধ্যরাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান *করেছেন এটি সাতগেছে থানার অন্তর্গত বড়োয়া গ্রামের কাছেই ছিল।* তাঁর কাব্যেও আছে - চৈতন্য বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে নীলাচল হয়ে গৌড়যাত্রাকালে জলেশ্বর হয়ে মান্দারনে ঢুকে বর্ধমানে দেখা দিলেন (এই বর্ধমান - আধুনিক বর্ধমান শহর অবশ্য নয়)।

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম
তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব শিষ্য
তার ঘরে করিল বিশ্রাম।

শুধু বিশ্রাম করলেন না - সুবুদ্ধি মিশ্রের ছেলের ডাক নাম ছিল গুয়ে। চৈতন্য মানুষের অমর্যাদা সইতে পারতেন না, তাই গুয়ে নাম বদল করে নাম দিলেন জয়ানন্দ। আর জয়ানন্দের মা রোদনী রান্না করে দিলে চৈতন্য পরমানন্দে খেয়ে যান।

গোবিন্দ দাস কর্মকার - যাঁর নামে গোবিন্দ দাসের কড়চা - তাঁর বাড়ি ছিল ছুরি-কাঁচি-খ্যাত কাঞ্চননগরে। তবে তাঁর কড়চার প্রামাণিকতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রী খণ্ডের বৈষ্ণব মহাজনেরা বর্ধমানের গর্ব নরহরিদাস ও তাঁর পুত্র রঘুনন্দন, গোবিন্দ দাস কবিরাজ ও পুত্র দিব্যসিংহ, কবি শেখর, বলরাম দাস প্রভৃতিরা প্রণম্য। পূর্বস্থলী দোগাছিয়া গ্রামের বলরাম দাস, কান্দড়া গ্রামের দণ্ডীদাস-ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস এবং শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর, পাটুলি গ্রামের বংশীবদন চট্ট, অম্বিকা কালনার কৃষ্ণদাস, ঘনশ্যাম দাস, কাউগ্রামের পরমেশ্বরী দাস, পরাণ গ্রামের রায়শেখর, মালিহাটি গ্রামের যদুনন্দন দাস - প্রত্যেকে বাংলা সাহিত্যে বর্ধমানের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

।। ৫ ।। বৈষ্ণব সাহিত্যের পর বাংলা সাহিত্যে শাক্ত কবিগণ আবির্ভূত হন। সেই শাক্ত সাহিত্যেও বর্ধমান অগ্রণী স্থান নিয়ে আছে। হালিশহরের রামপ্রসাদের মতই খ্যাতি নিয়ে বেঁচে আছেন অম্বিকা-কালনার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। পরে মহারাজ মহাতাব চাঁদ তার পদাবলী ছাপিয়ে প্রকাশ করেন ১২৬৪ বঙ্গাব্দে। এখনও বর্ধমানে কমলাকান্তের কালীবাড়ি দ্রষ্টব্য স্থান। বর্ধমান রাজের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের পুত্র রঘুনন্দন রায়ও শাক্তপদকারদের মধ্যে অন্যতম। স্বয়ং মহতাবচাঁদ বহু শাক্তগীতি রচনা করেছিলেন।

বর্ধমান-ব্যান্ডেল মেন লাইনে দেবীপুর স্টেশনের অনতিদূরে আছে আলিপুর গ্রাম। সেখানে বাস করতেন নীলাম্বর চক্রবর্তী। তিনি প্রায় চারশো শাক্তপদের রচয়িতা। আর পাঁচালী-খ্যাত দাশরথি রায় (বাদমুড়া নিবাসী), কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায় (ধরণীগ্রাম জাত) এবং যাত্রাপালাকার মতিলাল রায় (ভোতশালার অধিবাসী) বর্ধমানের ত্রিরত্ন। বাংলা লোকসাহিত্যে তাঁরা স্থায়ী আসনের অধিকারী। অনেক পরে ব্রহ্মসংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন সেই ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) চক ব্রাহ্মণ গড়িয়ার অধিবাসী। প্রকৃতপক্ষে আরও বহু কবি-সাহিত্যিকের নাম আমরা করতে

পারিনি। তবুও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বর্ধমান যে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

।। ৬ ।। এবার আমরা প্রবেশ করতে চাইছি আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের পরিধির মধ্যে। স্বভাবতই বর্ধমানের মৃত এবং জীবিত লেখকদের সাহিত্য চর্চার কথা আমাকে উল্লেখ করতে হবে। মৃত সব লেখকদের সাহিত্য চর্চার উল্লেখ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জীবিত লেখকদের উল্লেখেও কিছু নির্বাচন আমাকে করে নিতে হয়েছে। যাঁদের উল্লেখ করছি না তার অর্থ এই নয় যে তাঁদের অবহেলা করছি। আগামী যুগ তাঁদের মূল্যায়ন করবে। তা ছাড়া একটি প্রবন্ধের পরিসরে সকলকে কখনই উল্লেখ করা যায় না। সেজন্য আগে ভাগেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে জাতীয়চেতনার একটা নবভাব বিকশিত হতে থাকে। বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া গ্রামের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যেই প্রথম স্বাধীনতার আকাঙ্খা স্ফুটবাক হয়েছিল। তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়। দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়' পঙ্‌ক্তিনিচয় এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা যাদের রচনাবলীকে ঘিরে রচিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' রচয়িতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানের বুড়ার গ্রামের অধিবাসী একদা 'ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনাম নিয়ে সাহিত্যের জগতে একটা ধাঁধা সৃষ্টি করে বসেছিলেন। তাঁর ম্যালেরিয়া-নাশক 'লৌহসার'-ও তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিল।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের বাড়ি ছিল পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী চুপী গ্রামে। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনা করে এই অক্ষয়কুমার দত্ত জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। একদা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক অক্ষয়কুমার বিখ্যাত ছিলেন তাঁর স্বচ্ছ বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের জন্য। আর ব্যঙ্গপ্রবণতা এবং সমাজবোধ সম্পন্ন কবি হিসাবে খ্যাত হয়ে আছেন কাটোয়ার নিকটবর্তী গঙ্গাটিকুরির (জন্মও মাতুলালয় বর্ধমানের পাণ্ডুগ্রামে) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে 'পাঁচু ঠাকুর'। একদা বর্ধমানের ওকড়সা গ্রামের প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রনাথ শেষ বয়সে বর্ধমানেই ওকালতি করে গেছেন। তাঁর 'ভারত উদ্ধার কাব্যে'র কোনো তুলনা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন 'হেলীর ধূমকেতু'।

বর্ধমানের যে সব মনীষী ইতিহাস চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মধ্যযুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস-লেখক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাগ্রগণ্য। দুঃখের বিষয় 'মধ্যযুগে বাঙলা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের এই লেখক বাঙালী চরিতাভিধানে স্থান পাননি। আর এক ঐতিহাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ী জন্মসূত্রে নদীয়ার হলেও ইনি মুখ্যত কাটোয়া মহকুমারই অধিবাসী ছিলেন। কানিংহামের বিখ্যাত শিখগ্রন্থের অনুবাদ 'শিখ ইতিহাস' , পৃথিবীর ইতিহাস, বেদ অনুবাদ, তাঁকে সুপরিচিত করে রেখেছে। বঙ্গবাসী পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-র বাড়ি ছিল বর্ধমানের ইলসবা গ্রামে। দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশ ও সুলভমূল্যে তার প্রচার এবং মডেল ভগিনী, বাঙালী চরিত, কালাচাঁদ প্রভৃতি রচনার দ্বারা তিনি দেশের সাহিত্যবোধকে উদ্দীপিত করেছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁরই জ্ঞাতি ভ্রাতা। বর্ধমানের আর এক প্রখ্যাত সাংবাদিক, ভারতে

প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের জনক ও সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন বহড়ু গ্রামের অধিবাসী।

বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চন্দের মতই মহারাজা বিজয়চন্দ্রও সাহিত্য প্রিয় মানুষ ছিলেন । যৌবনে তিনি কাব্য রচনা ছাড়া Studies, Meditations Imperssions ইত্যাদি ইংরেজি গ্রন্থও রচনা করেন । তিনি খ্যাত হন 'বিজয় গীতিকা' কাব্য লিখে । মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত খুবই সুখপাঠ্য । তাঁরই উদ্যোগে ১৩২০ বঙ্গাব্দে বর্ধমান শহরে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । বর্ধমানে এতো বড়ো সাহিত্য অধিবেশন সম্ভবত আর হয়নি । মূল সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় । দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাতে উপস্থিত ছিলেন না । ব্যাক্তিগত প্রয়োজনে একাধিকবার বর্ধমানে এলেও রবীন্দ্রনাথ বর্ধমানে সাহিত্য সম্পর্কে আসেননি কখনও । যদিও তাঁর 'রবিচ্ছায়া' গীতসংকলনে বর্ধমানের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটি সুন্দর গান রয়েছে - 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে , শীর্ষক । অবশ্য ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের স্বগ্রামে এবং বর্ধমান শহরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সময় একবার প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট নাট্যকার ও উপন্যাস লেখক রাজকৃষ্ণ রায়ও ছিলেন বর্ধমানের রামচন্দ্রপুরের মানুষ । বর্ধমানের এই মানুষটিই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ফুল - টাইমার । তিনিই সাহিত্যকে প্রথম পেশারূপে নেন ।

।। ৭ ।। আমরা এবারে আমাদের কালের আরও একটু বেশি সংলগ্ন হলে পাবো চুরুলিয়ার বিদ্রোহী কবি নজরুলকে। তাঁকে নিয়ে বেশি কথা লেখার প্রয়োজন নেই । তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন রূপসা গ্রামের মানুষ । তাঁর কয়লা কুঠির দেশ - এর পটভূমিকাও বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের কয়লাখনি ক্ষেত্র ।

তাঁর চেয়ে একটু প্রবীণ ছিলেন 'দন্তালিকা' আনন্তরী প্রভৃতি কাব্যের লেখক ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (যাঁর স্মৃতি রয়েছে বর্ধমান শহরের কালনা রোডের উপর বিশ্বেশ্বরী যোগাশ্রমে), কবি বিশালাক্ষ বসু, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রায়ান - নিবাসী নাট্যরসিক ভোলানাথ কাব্য শাস্ত্রী, বর্ধমান রাজসভার কবি সিদ্ধেশ্বর সিংহ ন'পাড়ার ' ফুলদানি'র লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখেরা ।

এককালে 'নিরক্ষর' নামক উপন্যাস লিখে যিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেই চরণদাস ঘোষের বাড়ি ছেল বাইতি পাড়ায় । 'দীপালি' পত্রিকাখ্যাত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির বিখ্যাত প্রতিলেখক স্বয়ংকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কাটোয়ার মানুষ । কবি কালিদাস রায় এবং কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক শুধুমাত্র কবি হিসাবে খ্যাত হন নি - বর্ধমানকে পরিচিত করেছেন তাঁদের সাহিত্য রচনায় । অনেকেই জানেন না রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ 'দুঃখবাদী' কবি ইঞ্জিনিয়ার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরও বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলায় পাতিল পাড়া গ্রামে । এই পাতিল পাড়াতেই জন্মেছিলেন 'মন্দিরের চাবি' কাব্য-খ্যাত কবি, বর্ধমান সম্মিলনীর সদ্যপ্রয়াত সভাপতি ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত । বর্ধমানের গৌরবকে স্বদেশে প্রচার করা তাঁর ব্রত স্বরূপ ছিল । তিনি লিখেছিলেন ।

বর্ধমান বন্দনায় আমি এক হ্রস্বমেধা কবি
তবু অশ্বমেধে ব্রতী,- যথাশক্তি আঁকি তার ছবি
যথাভক্তি করি ধ্যান, সেই মোর রাঙ্গামাটি মা-টি

যে মোরে করেছে ক্রোড়ে পালিয়াছে মলিনতা ঘাঁটি
আবল্য - যৌবন - জরা ।

গল্পে-উপন্যাসে একদা মাতিয়েছিলেন কবিকঙ্কণের দামিন্যার লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্ত । বর্ধমানেরই কৃষক জীবনের ছবি এঁকেছিলেন 'গোবিন্দ সামন্ত' বইতে যে পাদ্রী লালবিহারী দে, যাঁর বেঙ্গল ফোক টেলস্ আজও আমাদেরকে মাতায় - তাঁর বাড়ি ছিল সোনাপলাশী গ্রামে ।

।। ৮ ।। সাহিত্য সাধনায় বর্ধমানের মেয়েরা কোনোকালেই পিছিয়ে ছিলেন না । সাহিত্যপ্রিয় ব্যবহারজীবী দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়-এর মাতা সুরথকুমারী দেবী , নীরোদমোহিনী দেবী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে স্মরণযোগ্য দান রেখে গেছেন । বর্ধমান শহরের মেয়েই ছিলেন প্রখ্যাত মহিলা - সাহিত্যিক শৈলবালা ঘোষজায়া । তাঁর বিয়ে হয়েছিল মেমারীতেই । তাঁর উপন্যাসের বহুস্থানেই বর্ধমান সঞ্জীবিত ।

মহিলাদের মতই বহু মুসলমান সাহিত্যসেবীর জন্মস্থানও বর্ধমান । গোলাম আহম্মদ নিজেই বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন । 'ইসলামের ইতিহাস' লিখে তিনি মুসলমান সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করে গেছেন। 'জেবন্নেসা' গ্রন্থের লেখক আবদুল লতিব ছিলেন জামতাড়ার অধিবাসী । 'কাঁচ ও মণি' এবং 'রবীন্দ্র প্রতিভা' রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন একরামউদ্দীন । আনোয়ার হোসেন এবং আবদুল গণিও বর্ধমানেরই কবি । কালনা থানার বোহার গ্রামের মুন্সী মোহাম্মদ আবদুল্লা সাহেব তাঁর বিশাল গ্রন্থাগার জাতির উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন - তা এখন জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে ।

।। ৯ ।। বর্ধমানের ইতিহাস রচনার যাঁরা আত্ম নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী বলাই দেবশর্মা, অনুকূলচন্দ্র সেন, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য । বর্ধমানের কৃতি সন্তান অনিলবরণ রায়ের অধ্যাত্মজীবন সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এখনও যাঁরা নানাভাবে সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য গোতান-এর কৃতি সন্তান ডঃ সুকুমার সেন। কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী, গল্প লেখক রামেন্দু দত্ত ও মানবেন্দ্র পাল, যাত্রাপালাকার শম্ভু বাগ, পঞ্চানন মণ্ডল, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ সিংহ, চিত্ত ভট্টাচার্য, কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, কমল কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখেরা রয়েছেন। এখন বর্ধমানের গ্রামে গঞ্জে সাহিত্য চর্চা হয়ে চলেছে। রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি শিল্পনগরী থেকে শুরু করে সর্বত্র অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে বর্ধমানের সাহিত্য চর্চার দিগন্ত বিস্তৃত করে চলেছে। নামোল্লেখ না করলেও তাঁরা সকলেই অগৌণে এই প্রবন্ধে উপস্থিত রইলেন।

।। ১০ ।। বর্ধমানের গৌরব শুধু মাত্র বর্ধমানের সন্তানেরাই বাড়িয়ে তোলেন নি। বহু সাহিত্যিকই বর্ধমানকে তাঁদের সাহিত্য চর্চার পটভূমি করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ-কৃত কবিতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পঞ্চপুত্তলী' উপন্যাসে গোলাপবাগের উল্লেখ করেছেন। নায়িকা টিয়া 'কাটোয়া থেকে এসেছিল বর্ধমান। বর্ধমানের গোলাপবাগ তার মনোহরণ করেছিল। মহারাজার গেস্ট হাউসের সামনে সাদা মেঘের মত মার্বেল-গড়া কি অপরূপ

নারীমূর্তি। ...... গ্রীষ্মের সময় সে রোজ যেত গোলাপবাগে। এ সময়টার রাজবাড়ীর সকলেই চলে যেতেন পাহাড়ে, দার্জিলিং ঠান্ডার দেশে। এ সময়ে গোলাপবাগে বেড়াতে কোনো বাধা হয়নি। গাছে গাছে নতুন পাতায় কচি সবুজের বাহারে চোখে একটা নেশা লাগত। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও গোলাপবাগের ঘন সারিবন্দী গাছের তলায় তলায় নিরবচ্ছিন্ন একটি ছায়ার রাজ্য থমথম করত। বাতাস শুধু খেলা করে বেড়াতো শুকনো পাতা নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত। ওদিকে গোলাপবাগের চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে এক কোণে বসে বসে বাঘগুলো ঝিমুত, হাঁপাত। ভাল্লুকে থাবা ঘষত। বাঁদরগুলো ঢুলত। পাখীগুলো চোখ বুজে এক পা তুলে বসে থাকত দাঁড়ের উপর।'

'রূপের হাট মহাজনটুলি' ও তারাশঙ্করের দাক্ষিণ্য হারায়নি। শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির দেশে', শৈলবালার উপন্যাসে, আরও বহুজনের রচনায় বর্ধমানের উল্লেখ রয়েছে। সেকথা গুণীজনে জানেন। আমি এখানেই ইতিরেখা টানছি।

বর্ধমানের ভাষা
সুভাষ ভট্টাচার্য

এক সময় বাংলা ভাষার আলোচনায় আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ভাষার তুলনায় অর্থাৎ মান্য ভাষার তুলনায় নগণ্য বলে মনে করা হত। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের চর্চা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে এই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ভাষা-চর্চায় আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব যে সর্বৈব স্বীকৃত হয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার সম্পর্কে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ চিত্র পেতে হলে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন। সুখের কথা বর্তমানে সেই চেষ্টা চলেছে।

আঞ্চলিক ভাষার প্রতি ভাষা-গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন জেলার ভাষার আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ভাষা-সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে হীনমন্যতা দূরীভূত হয়েছে এবং নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে কৌতূহলও বেড়েছে। এই প্রারম্ভিক কথাগুলি বলে নিয়ে আমাদের মূল বক্তব্য, অর্থাৎ বর্ধমান জেলার ভাষা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বলতে চাই। এই নিবন্ধে বর্ধমান জেলার ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উপস্থিত আমাদের লক্ষ্য।

আঞ্চলিক ভাষায় সংস্পর্শ-প্রভাব যে কতদূর ক্রিয়াশীল তা যে কোনো একটি জেলার ভাষা নিয়ে সমীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যায়। একটি জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলি যে পার্শ্ববর্তী জেলার প্রভাব বহন করে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে বর্ধমান জেলার ভাষায়। বর্ধমানের ভাষায় হুগলি, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের প্রভাব নৈকট্য-জনিত এবং কাজে-কাজেই সংস্পর্শ-জনিত।

যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য সন্ধানে বা আঞ্চলিক ভাষার চরিত্র বিশ্লেষণে আগ্রহী তাঁদের কাছে বর্ধমানের ভাষা একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এই ভাষায় রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বর্ধমান জেলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য তার ধ্বনিতত্ত্বে নয়, এই ভাষার বৈশিষ্ট্য তার শব্দভাণ্ডারে, রূপতত্ত্বে, বাক্যরীতিতে। বর্ধমান জেলার শব্দগত বৈশিষ্ট্য ও বাক্যপ্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। কেননা এতে এমন একটা স্বকীয়তা আছে যাকে এক আঁচড়েই বর্ধমানের ভাষার লক্ষণ বলে অভ্রান্তভাবে শনাক্ত করা যায়। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও বর্ধমানের ভাষার শব্দবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা, তথাপি এই ভাষার ধ্বনিগত লক্ষণগুলির দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করা সমীচীন বলে মনে করি।

বর্ধমানের ভাষার অন্যতম প্রধান ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণ স্বরসংগতি। সিদ্ধ-সেদ্ধ, *কৃপণ - কেপ্পন্, চৈত্র - চোত্ , বিলাত - বিলেত্, উড়ানি - উড়ুনি, দেশি - দিশি।* এইসব দৃষ্টান্ত যে বর্ধমানের ভাষার নিজস্ব ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ তা মনে করার কারণ নেই। কেন্দ্রীয় ভাষায় এবং অন্য কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায়ও অনুরূপ স্বরসংগতি লক্ষ করা যায়। অন্ত্য মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণহীনতা বর্ধমানের ভাষার তথা রাঢ়ী উপভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। দুধ - দুদ, শাঁখ - শাঁক্ এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বরভক্তির উল্লেখ করতে হয়। শব্দের আদিতে বা মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি এসে ব্যঞ্জন দুটিকে আলাদা করে দেয়। গ্রাম - গেরাম্, প্রথম - পের্থোম্, শুক্র - শুক্কুর্, ক্রমে -

কের্‌মে, ব্লু - বুলু, ক্লাব - কেলাব্‌। উচ্চারণে স্বরভক্তি আঞ্চলিক ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা। সংস্কৃত ইংরেজি প্রভৃতি উৎস থেকে প্রচুর যুক্ত ব্যঞ্জনের শব্দ বাঙালিকে ব্যবহার করতেই হয়। সেইসব যুক্ত ব্যঞ্জনকে সরল করে নেওয়ার নানান প্রক্রিয়ার অন্যতম হল স্বরভক্তি। ঘোষীভবন বর্ধমানের ভাষার আর একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এর দৃষ্টান্ত শাক - শাগ্‌, কাক - কাগ্‌ । পঞ্চমত, নিম্নমধ্য অ্যা - ধ্বনির উচ্চমধ্য এ - ধ্বনিতে রূপান্তর - এগারো, বেলা, মেলা, খেলা। এইসব শব্দের মান্য উচ্চারণ যদিও অ্যাগারো, ব্যালা, ম্যালা ও খ্যালা, বর্ধমানে এগুলির এ উচ্চারণই দস্তুর। ষষ্ঠত, . শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে ঝোঁক এবং ব্যঞ্জনাদ্বিত্ব বর্ধমানে অত্যন্ত প্রকট - বাবা - বাব্‌বা, মেলা - মেল্‌লা, খেলা - খেল্‌লা, ব্যাপার - বেপ্‌পার্‌ ইত্যাদি। সপ্তমত, একাক্ষর বা এক সিলেবল - যুক্ত শব্দের শেষে ম্‌ ধ্বনি থাকলে আদ্য নিহিত অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। গম - গোম্‌, দম - দোম্‌। এছাড়া অন্যান্য ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে নাসিক্যীভবন - গোড়া - গোঁড়া, হাসপাতাল - হাঁশ্‌পাতাল্‌ ; ন্‌ ধ্বনির ল্‌ ধ্বনিতে রূপান্তর - নোটিস - লুটিস্‌, নোট - লোট্‌, নেওয়া, নিতে - লেয়া, লিতে, নবান - লবান্‌ প্রভৃতি ; শব্দের আদ্য অ এবং ও ধ্বনির র্‌ ধ্বনিতে রূপান্তর - অঞ্জন - রন্‌জোন্‌, ওজন - রোজোন্‌ ; মধ্য ব্যঞ্জনলোপ - তুলসী - তুলোশি, দরজা - দরোজা।

দুই

এবারে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আসি। বর্ধমানের ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক ও শব্দপ্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এই অঞ্চলের ভাষার প্রকৃত চরিত্র - লক্ষণ সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রথমত, কর্ম-বিভক্তিদিগকে বর্ধমানে - দিগে তে পরিণত হয়। আমাদিগে, তাদিগে, ছেলেদিগে। একে আমরা রাঢ়ী উপভাষার একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, সকর্মক ও অকর্মক দুই প্রকার ক্রিয়াপদেই প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে সাধারণ অতীতকালে - ল বিভক্তির বদলে - লে বিভক্তির ব্যবহার বর্ধমানের স্বাভাবিক প্রবণতা। দুধটা কে খেলে ? সে বললে ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এর পাশাপাশি মান্য ভাষার বলল, খেল প্রভৃতিও ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রধানত বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির প্রভাব এবং অনেকাংশ শিক্ষারও প্রভাবে। তৃতীয়ত, ক্রিয়াপদের খেসে (খা + এসে), খাওসে (খাও + এসে), দেখসে (দেখ্‌ + এসে) ইত্যাদি রূপ বর্ধমানের উত্তরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। আবার যাচ্ছি যাচ্ছে, খাচ্ছি খাচ্ছে প্রভৃতি ক্রিয়ারূপের যুক্ত ব্যঞ্জনের লোপও লক্ষণীয় - যেছি, যেছে, খেছি, খেছে। চতুর্থত, তুই এর বদলে তু, এবং সম্বোধনে এই এর বদলে এ (এ মানিক, শোন্‌সে, কাগজটা লিয়ে যা) বর্ধমানের বিশেষ প্রবণতা।

তিন

বর্ধমানের ভাষার শব্দভাণ্ডার একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এই জেলার ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যেগুলি মূলত আঞ্চলিক শব্দ হিসাবেই চিহ্নিত। সেইসব শব্দ অবশ্য পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো কোনো জেলায়ও ব্যবহৃত হয়। এমন বহু শব্দও আছে যেগুলি নিতান্তই বর্ধমানের নিজস্ব শব্দ - অন্যত্র সেই শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, তবে ধরে নিতে হবে যে সেগুলি বর্ধমান থেকেই অন্যত্র গেছে। আবার এমন শব্দও আছে যেগুলি মান্য ভাষারই অনুরূপ। যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার শব্দের বেলায়ও যেমন, বর্ধমানের ভাষার শব্দকেও আমরা প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি - (ক) মান্য ভাষার অনুরূপ শব্দ যাদের অর্থও অনুরূপ, (খ) মান্য ভাষার অনুরূপ শব্দ যেগুলি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং (গ) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ।

আমাদের এই আলোচনায় ক শ্রেণীর শব্দ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মা, ভাই, ভাত, মাছ, দুধ, কলা, মাঠ, ঘাট, ফল, আম, দেখা, লাঠি প্রভৃতি অজস্র শব্দ এই শ্রেণীতে পড়ে।

খ শ্রেণীভুক্ত কিছু শব্দ আমরা এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করছি। দিন শব্দটি বর্ধমানে ক্রিয়া-বিশেষণে প্রতিদিন অর্থেও ব্যবহৃত হয় - আমি দিন তার বাড়ি যাই। অনুরূপ আর একটি শব্দ প্রায়। বর্ধমানে প্রায়ই অর্থে প্রায় ব্যবহৃত হয় - সে প্রায় এখানে আসে। পালানো শব্দটিকে বর্ধমানে সাধারণভাবে যাওয়া অর্থেই ব্যবহার করা হয় - অনেক বেলা হল, এবার পালাই গো। বর্ধমানে ভেজাল বা ভ্যাজাল শব্দটির অর্থ ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট ভালো ভ্যাজাল হল দেখছি। বর্ধমানে ছেলে বলতে প্রায়ই ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই বোঝায় - ওগো ছেলে কোলে লাও।

গ শ্রেণীভুক্ত কিছু শব্দের উদাহরণও দেওয়া যাক। মুড়ি (নর্দমা), বোজা (আবর্জনা), সপ (মাদুর), ঘসি (ঘুঁটে), পারা (মতো), ভিচিকিচি (ঝামেলা), কম্‌নে (কোন্ দিকে), হোতা (ওখানে), খ্যাড় (খড়), পঁইঠে (সিঁড়ি), আঘোর (অলস), আজল (বোকা), খিটকাল (কেলেঙ্কারী ; ঝামেলা) ইত্যাদি। এই নিবন্ধে বর্ধমানের শব্দ সংকলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল বর্ধমানের ভাষার নানান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে চাই। তাই আপাতত কতগুলো শব্দের উল্লেখ করা হল মাত্র।

এবারে বর্ধমানের শব্দপ্রয়োগের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাক। বর্ধমানে জমি অর্থে জায়গা শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষণীয় - জায়গা কিনে ঘর করব। আবার বাড়ি অর্থে ঘর শব্দটিও যে প্রচলিত তা এই বাক্যটি থেকেই বোঝা যাবে। বৃষ্টি অর্থে জল - আজ জল হবে গো ; শীত অর্থে ঠাণ্ডা, পাত্র অর্থে জায়গা - দুধের জায়গা দিন গো ; ডগা অর্থে ডগ - লাউয়ের ডগ, নারকেল গাছের ডগ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের নিকৃষ্ট বা inferior অর্থে কমা শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ হয়। শব্দটি আঞ্চলিক বটে, কিন্তু এতই কার্যকর ও যথাযথ যে এই শব্দটিকে মান্য ভাষার অভিধানে গ্রহণ করা যায় কিনা তা আভিধানিকরা ভেবে দেখতে পারেন। নিপাত শব্দ হিসাবে দিয়ে ও নিয়ে-র প্রয়োগ বর্ধমানে খুবই ব্যাপক। বর্ধমানে মনে হওয়া বা ইচ্ছা হওয়া অর্থে মন হওয়া ব্যবহৃত হয় - মন হল, তাই চলে এলুম। সম্বোধনে ওগো শব্দের আত্যন্তিক প্রয়োগ আমাদের কিছু উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। এছাড়া আদপে অর্থে মূলে - মূলে সে ভাতই খায় নাই, নেই বা - নি অর্থে নাই, জলখাবার অর্থে জল অনুসর্গ হিসাবে লেগে শব্দের ব্যবহার - তোমার লেগে বসে আছি, পাগল ও পাগলী অর্থে খ্যাপা ও খেপী, প্রশ্ন করা অর্থে শুধানো - আমি জানি না গো, ওকে শুধোও - প্রভৃতি বর্ধমানের বিশেষত্ব।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের কিছু ইডিয়ম বা বাগ্‌ধারার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলা ভাষার বহু বাগ্‌ধারাই আসলে আঞ্চলিক ভাষার অন্তর্গত। পৌনঃপুনিক ও ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আঞ্চলিক প্রয়োগ মান্য ভাষার শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়ে যায়। বর্ধমানের বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছও পৃথকভাবে সংকলনযোগ্য। আপাতত আমরা কয়েকটির উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করছি - মালা ঘোরানো, কোনো ব্যাপার নাই, বাঁশবুকো (গালাগালিতে), আজলগোদা (গালাগালিতে), আদিঙ্গে, আঁচল চেলে, নামুনে (গালাগালিতে), কোনো সিন নাই, আবুজ আবজো।

বর্ধমানের আধ্যাত্মিকতার ধারা

একক্‌ড়ি চট্টোপাধ্যায়

আধ্যাত্মিকতা একটি সূক্ষ্ম ধারণা, -এর প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নাই। তবে একটা কথা পরিষ্কার যে অনাদিকাল থেকে কোন না কোন সূত্রে ধর্ম্মকেই আশ্রয় করেই আধ্যাত্মিকতা গড়ে ওঠে। এই ধর্ম্ম নিয়েও যুগে যুগে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব, হিংসা প্রতিহিংসা ঘটে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা বিশেষ ধরণের দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই একটা জাতির মধ্যে একটা ধর্ম্মমত গড়ে ওঠে। কোন জাতির এই আধ্যাত্মিকতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর দু' একটি মুখ্য ধারা থাকে-তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারা-উপধারা। এই ভাবে কোন জাতির আধ্যাত্মিক মানস গড়ে ওঠে ও ধীরে ধীরে তা পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু মূল ধারার সংঙ্গে যখনই অন্য একটি ভিন্ন ধারা যুক্ত হয়, তখনই সুরু হয় সংঘাত ; সংঘাতের পর চলতে থাকে সমন্বয় ও সমীকরণ।

আর্যদের এ দেশে আসবার আগে আর্য্যেতর জাতির মধ্যে মাতৃপুজার প্রাধান্য ছিল। তার কারণও ছিল। তখন সন্তানের পিতৃ পরিচয় ছিল অনিশ্চত, মায়ের পরিচয়েই ছেলের পরিচয় ছিল। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, তখনকার আর্থিক জীবন ছিল সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর-মাটিকে তখন লোকেরা 'মা' বলেই মনে করত। তাছাড়া কৃষি সংক্রান্ত সব কাজেই মেয়েরাই ছিল অগ্রণী।

বৈদিক আর্য্যরা ছিলেন পিতৃতান্ত্রিক। তাঁদের দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রভৃতি পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য। এই মাতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিকতার সংঘাতের ফলেই ধীরে ধীরে শক্তিতন্ত্র ও শৈবতন্ত্রের দুটি মূল ধারা আমাদের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বয়ে চলেছে। বর্ধমানের আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণ করলেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মত বিভিন্ন ধর্ম্মেরও মিলন ঘটেছে বর্ধমানে। মানকরের হিতলাল মিশ্রের বাড়িতে হস্ত লিখিত বঙ্গাক্ষরে বৈদিক পুঁথি ছিল। এর থেকে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে,.এককালে এখানে বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য ছিল। পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি এখানে যে হারে আবিস্কৃত হয়েছে তাতে জৈন ধর্মের প্রাধান্যও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার সীমান্তে জৈন ধর্মাবলম্বী শরাক জাতির বাস। সাত দেউলিয়া গ্রামে মহাবীর ও তীর্থঙ্করের অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। বর্ধমান-কাটোয়া লাইনে বলগোনার কাছে বাবলাডিহি-শঙ্করপুরের নেংটাশ্বরের মূর্ত্তি প্রকৃত পক্ষে জৈন তীর্থঙ্করেরই মূর্ত্তি। অনেকে আবার বলেন, মহাবীরকে এ দেশের লোক ভাল চোখে দেখেন নাই। তাই তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কুকুর হচ্ছে বাগদী বাউড়ীদের 'টোটেম'। তাই যদি হয় তাহলে বলতে হয় মহাবীর এ অঞ্চলে সম্প্রদায় বা কৌম বিশেষের কাছে ভাল ব্যবহার পাননি। কিন্তু অন্যের কাছে তো পেতে পারেন। তা না হলে এখনো তিনি পুজো পাচ্ছেন কি করে ? অনেকের মতে বর্ধমানের নামের সংগে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের পূত স্মৃতি বিজড়িত। তা যদি হয় তা হলে এ অঞ্চলে মহাবীরের তথা জৈন ধর্মের প্রাধান্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এরপর বর্ধমানের আধ্যাত্মিক মানসে মাতৃতান্ত্রিকতারই প্রাধান্য দেখা যায়। তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান এই বর্ধমান। সাধক কমলাকান্তের সাধনার ক্ষেত্র এখানে রয়েছে কমলাকান্তের কালী বাড়ীতে। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম মঙ্গলের দেব বন্দনায়

যে যে দেব দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার থেকে শক্তিতন্ত্রের প্রাধান্যই সূচিত হয়। মাণিক গাঙ্গুলি দেব বন্দনায় যে যে দেবীর উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বর্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলা, নাড়চায় (রায়না থানা) সর্ব্বমঙ্গলা, বুঞায়ে চন্ডী, শাটিনান্দে লক্ষ্মী, পলাশিতে পলাশচন্ডিকা, ভাণ্ডার গড়ে ভাতারচণ্ডী (ভাণ্ডারচণ্ডী ?) গোগ্রামে ভগবতী, ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা, আম্বায় (অম্বিকা কালনা ?) অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী, এড়বারে (এরুয়ার ?) কালিকা, হাসনহাটিতে মনসা, নারিকেল ডাঙ্গায় মনসা, মণ্ডলগ্রামে জগৎ গৌরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কালিকা, মনসা, লক্ষ্মী সবই মূলতঃ শক্তিরূপিনী ও অভিন্না।

মনসা মঙ্গলেও এর প্রমাণ মেলে। চাঁদ সদাগর যখন "পদ্মার" পূজা করতে অস্বীকৃত হলেন তখন দৈববাণী হয়-

পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর।
যেই জান ভগবতী, সেই বিষহরি,
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি ।।

এ অঞ্চলে শুধু যে মনসাই মূলতঃ শক্তিরূপা হয়ে গেছেন তাই নয় -শীতলা ; ষষ্ঠী ; কমলা ; বাশুলী (বাগীশ্বরী বাইশ্বরী বাশরী বাশুলী) প্রভৃতি প্রচলিত সব দেবীই মূলতঃ শক্তিরূপা। ভৃগুরাম দাস তাঁর ষষ্ঠী মঙ্গলে স্পষ্টই এর উল্লেখ করেছেন -

দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ।

তাছাড়া এ অঞ্চলে ওলাই চন্ডী ; কলাই চন্ডী ; নাটাই চন্ডী ; কুলাই চন্ডী ; বসন চন্ডী ; ঝাঁকলাই চন্ডী প্রভৃতি নামধেয় যে বিভিন্ন প্রকারের চন্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে বর্ধমানের শক্তিতন্ত্রের মানসিতাই প্রমাণিত হয়।

বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী শক্তিগড়ের কালী, বড়বেলুনের 'বড়মা', ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কালনা ও কাটোয়ায় সিদ্ধেশ্বরী, তেজগঞ্জের কালী, রসুলপুরের (কেতুগ্রামের) বেহুলাদেবী' অট্টহাসের ও মন্ডলগ্রামের চামুন্ডা, দামুন্যায় কবিকঙ্কণের পূজিতা চন্ডীদেবীর পূজার মধ্যে এই শক্তি সাধনার পরিচয় মেলে। তাছাড়া বৈশাখ মাসে হরিবাটী, নবগ্রাম, ধামাস ও প্রায় সমস্ত গ্রাম বর্ধমানে রক্ষাকালীর সার্ব্বজনীন পূজায় উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর হিন্দুই যোগদান করতে পারে। এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর পূজায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্থায়ী বেদিতে পট আঁকা মূর্তিতে পূজা হয়।

কুব্জিকাতন্ত্রে বর্ধমান তথা রাঢ়ে ডাকার্ণবের নয়টি পিঠের উল্লেখ আছে।

শিবতন্ত্রের প্রাধান্যও এখানে কম নয়। এ অঞ্চলে এমন গ্রাম খুবই কম আছে, যেখানে একাধিক শিব মন্দির নাই। বর্ধমানেই রয়েছে সর্ব্বমঙ্গলা বাড়ীর দ্বাদশ শিব, ঈশানেশ্বর নবাবহাটের ১০৮ শিব কড়ুই-এর বুড়ো শিব, তাছাড়া অলিতে গলিতে শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি। বর্ধমানের আলমগঞ্জের কাছে ভিখারী বাগানে নব আবিস্কৃত ১৮ ব্যাস বিশিষ্ট খিলানে তৈরী 'মহাশিব' ত একমেবাদ্বিতীয়ম।

বৌদ্ধধর্মও এখানে সহজিয়া তন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়াবাদ রামাই পন্ডিতের বিধান। তারা দেবী ত বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে বৌদ্ধ সহজিয়াই হোক, জৈনই হোক, আর ধর্মপূজাই হোক কেউ

এখানকার শিবশক্তিকে গ্রাস করতে পারে নাই। বরং এর উল্টোটাই ঘটেছে। শিব ও শক্তিতন্ত্র জৈন বৌদ্ধ সহজিয়া মত ধর্মঠাকুরকে গ্রাস ক'রে নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখেছে - যেমন ঘটেছে শঙ্করপুরের নেংটাশ্বরের বেলায়, যেমন ঘটেছে বর্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলার ক্ষেত্রে। নেংটাশ্বর আসনে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি, সর্বমঙ্গলার আদি বর্ত্তুলাকার মূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে নিরাকার বুদ্ধমূর্ত্তি। আবার কোথাও ঘটেছে উভয় তন্ত্রের সমন্বয়। বুড়ো শিবের 'বুড়ো' আর ধর্মরাজের 'রাজ' এর সমন্বয় ঘটেছে জামালপুরের বুড়োরাজের ক্ষেত্রে। জামালপুরের বুড়োরাজের মত কুড়মুনের শিবঠাকুরেরও গাজন হয়। পূতিগন্ধময় নরমুণ্ড নিয়ে সন্ন্যাসীদের পৈশাচিক নৃত্য এই গাজনের বিশেষ আকর্ষণ। রায়না থানার নাড়ুগ্রামের নাড়েশ্বরেরও গাজন হয়। রোড়ার কলরামের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের দেবকল্পনার সমন্বয় ঘটেছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইজন্য এর নাম দিয়েছেন 'লোকেশ্বর বিষ্ণু'।

ধর্মরাজ কূর্মমূর্ত্তিতে অধিকাংশ গ্রামে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও পূজা পান। সুহারীতে গাজনের ধর্মরাজের 'মালাপড়া' স্বচক্ষে দেখেছি। ভাতাড়ের সন্নিকটে কেলেডাঙ্গার ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্ত্তি। বনপাশ কামারপাড়ায় ধর্মঠাকুরের গাজনে আগে শুয়োর বলি হতো।

শিব ও শাক্ত ছাড়াও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্যও আছে বর্ধমানে। কড়চা প্রণেতা মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার সহচর গোবিন্দ দাসের বাড়ী কাঞ্চন নগরে। ' কুলীন গ্রামের কথা কহনে না যায়। শূকর চড়ায় ডোম, সে -ও কৃষ্ণ গায়।' শ্রীখণ্ড, কোগ্রাম দেনুড়, ঝামট পুর বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। ডঃ হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের মতে কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে। ধর্ম্মপূজার মত মনসাও এখানে সর্বত্র পূজিতা। গোবিন্দপুর হাসনহাটি গাংপুর, দেপুর আমোদ পুর, মণ্ডলগ্রাম বৈদ্যপুর নারকেল ডাঙ্গা; সিঙ্গুর; আটকেটিয়া; পিড়তলী প্রভৃতি মনসা পূজার পীঠস্থান। এখানে মনে রাখা দরকার কূর্ম্ম পূজা বা সর্প পূজা প্রকৃতপক্ষে টোটেম পূজা এবং এগুলি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত। বর্ধমানের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির শিবতন্ত্র ও শক্তিতন্ত্রের দুটি মুখ্য ধারার সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ , সহজিয়া, বৈষ্ণব, 'টোটেম' পূজার ধর্ম্মের বিভিন্ন উপধারা মিশে মূল ধারাকেই পুষ্ট করেছে। তাতে মূল ধারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই Tradition সমানে চলেছে।

['উদয় অভিযান' পত্রিকার বর্ধমান বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত সম্পাদক]

সেকালের শিক্ষায় বর্ধমান : মধ্যযুগ

সুধীরচন্দ্র দাঁ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী এই বর্ধমান । পঞ্চদশ শতকের আগে এই বর্ধমানে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তা জানা না গেলেও মঙ্গলকাব্যে ঐ সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় । কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে জানা যায়, বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে তখন পাঠশালা ছিল এবং বিশেষ বিশেষ বর্ধিষ্ণু গ্রামে টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি সংস্কৃত পড়ার কেন্দ্র গড়ে ওঠে । ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী প্রধান মহম্মদ বখতিয়ার বণিকের বেশে (ঘোড়া ব্যবসায়ী) আঠারোজন সঙ্গী (অশ্বারোহী) নিয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করলেন । সম্রাট লক্ষ্মণ সেন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গে ওপরে ঢাকায় । সেই সঙ্গে সুরু হলো বর্ধমানে মুসলমান সুলতানের রাজত্ব এবং ফলে এসে গেল মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতি ।

১২০১ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত যুগকে হিন্দু যুগ বলে - এই সময় বর্ধমানে সমগ্র বঙ্গের মত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার চল ছিল । প্রাকৃত ও তার অপভ্রংশ কে ভিত্তি করে আঞ্চলিকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় । বিশেষ করে মাগধী-প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশের মিশ্রণে বাংলা ভাষার আদি - রূপের উদ্ভব হয় । বাংলা সাহিত্যে এই আদি রূপকে চর্যাপদ বলে । বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি রচিত পদ গুলি চর্যাপদ নামে খ্যাত । এই চর্যাপদ গুলির মধ্যেই রয়েছে সেকালের শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজ বিন্যাসের পরিচয় ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯১৬), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) এবং ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করেছেন চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ গান ও দোঁহা । এগুলিই বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ - অবহট্টর নির্মোকমুক্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদচিহ্ন । রাঢ় বর্ধমানে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ পরিক্রমা করেছিলেন, তার নিদর্শন গ্রাম বর্ধমানের বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে রয়েছে । চর্যাপদে দেখা যায়, বিদ্যা ছিল গুরুমুখী । গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশ জনগণের কাছে শিরোধার্য বলে গণ্য হতো । দোহাগুলির বেশির ভাগই অধ্যাত্মমূলক । জীবন ধর্মের আচার ও আচরণে গ্রহণযোগ্য ও পালনীয় বিধি নিষেধ । যেমন :-

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই,
পারগামী লোঅ নির্ভর তরই ।।

অর্থাৎ ভবনদী গহন গম্ভীর, বেগে প্রবাহিত, দুইধারে কাদা, মাঝে থই নাই, ধর্মের তরে চাটিল সাঁকো গড়িয়াছে, পারগামী লোক নির্ভয়ে তরে ।

সে সময় উচ্চবর্ণের মানুষ গুরুগৃহে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চা করতেন । তার উদাহরণ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত পোখরণ গ্রামের শিলালিপি । কিন্তু নিম্ন বর্ণের মানুষ যাঁরা বর্ধমানের আদি বাসিন্দা সেই কিরাত, শবর, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ লেখাপড়া শিখত না । জীবনের আচার - আচরণে একটা শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার জন্য বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ গান,দোহা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন এবং এগুলিতে বেশি ক'রে সেই নিম্ন বর্ণেরই উল্লেখ আছে । ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "চর্যাগীতিতে সমসাময়িক জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আর কোথাও

নাই । x x x চর্যাগীতিতে যে জীবনচিত্র ক্ষণোদ্ভাসিত তাহা দেব-দেবীর নয়, রাজা - উজীরের নয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রের নয় x x x সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবন যাত্রার ও আচরণের বিম্বপ্রায় প্রতিরূপ - । "অর্থাৎ চর্যাগীতির মধ্যদিয়ে সেকালে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীত গুলি রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী, জীবনাচরণের আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য । " আর পরবর্তী সময়ে এ গুলিই সাধারণ নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকশিক্ষার উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে ব্যাপক । নিম্ন সম্প্রদায়ের ও সাধারণ মানুষ টোল বা চতুষ্পাঠীতে না গিয়েও জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতো । যেমন ঃ-

" উমত সবরো পাগল সবরো মা করগুলী গুহাড়া তোহেরী

নিঅ ঘরিণী, নামে সহজ সুন্দরী

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী

একেলী সরবী এ বন হিণ্ডই বর্ণকুণ্ডল বজওারী

এখানে শবরকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে ঃ ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিওনা । দোহাই তোমার । আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী । নানা তরু মুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল, কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী - একেলা শবর এ বন ঘুরিয়া বেড়ায় ।"

অতএব বলা যায় আজকের মাতৃভাষা বাংলা মাগধী প্রাকৃত ও সুরু করেছিল তখন রাঢ় বর্ধমান ও রাঢ়বঙ্গের নিম্ন সম্প্রদায় হাড়ি, ডোম, কাহার, শবর, কিরাত গণই স্তন্য দিয়ে তাকে লালন করেছিল ।

সংসারের তত্ত্ব কথা অতি সহজ ও সাধারণভাবে বলা হয়েছে যাতে নিম্নসম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না । যেমন ঃ-

কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা

বাল ভিণ একুবাকুণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা ।।

মায়া মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা ।

আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ।।

অর্থাৎ হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না, সংসারে সহজপথ পড়িয়া আছে । সম্মুখে যে মায়ামোহ সমুদ্র তাহার যদি না বোঝা যায় অন্ত না পাওয়া যায় থই, সম্মুখে যদি না দেখা যায় কোন ভেলা বা নৌকা, তবে এপথের যাহারা অভিজ্ঞ পথিক, তাহাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লও ।

প্রাজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া নিগূঢ় তত্ত্ব কথা বলার অধিকার কারো ছিল না । তাই সিদ্ধাচার্যগণ সাধারণ মানুষের কথা দোঁহার মধ্যে উল্লেখ করলেও বৈষ্ণব বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ঃ-

পণ্ডিঅ লোঅ খমহূ মহূ এত্থু ন কিঅই বিঅপ্পু

জো গুরুবঅণে মই সুঅই তহি কিং কহমি সুগোপ্পু

অর্থাৎ পণ্ডিত লোক আমাকে ক্ষমা কর, এখানে কিছু বিকল্প করা হইতেছে না । যাহা আমি শুনিয়াছি সুগোপন গুরু বাক্যে তাহা আমি কি করিয়া বলি ।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার এই রূপকে লোকশিক্ষার কাজে ভাবের ও তত্ত্বের বাহন করেছিলেন এবং এইভাবেই

রাঢ়বঙ্গে এবং রাঢ়বর্ধমানে দরিদ্রশ্রেণীর নিম্ন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভাষা সংযোগের একমাত্র ভাষা হিসেবে পথ করে নিয়েছিল। অনার্য ভাষাগোষ্ঠী তাই ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে নিজ সঙ্কীর্ণ সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে বেঁচে থাকে। তাকে পথ করে দিতে হয় আগামী দিনের জন্য জনসাধারণের বাঙলা ভাষাকে।

হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই অঞ্চলের লোকজনের যা বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদে অবস্থিত) থেকে ৭০০ লীর কিছু বেশি দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত উচু { WU (= u) - TU } প্রদেশে এসেছিলেন। তিনি বর্ণনায় বলেছেন, এখানকার জনসাধারণ দুধর্ষ, বেশ লম্বা এবং ময়লা রঙের। কথাবার্তায় এবং আচার আচরণে তারা মধ্যভারতের লোকেদের চেয়ে আলাদা। পড়াশুনায় তারা অক্লান্ত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ। বহু ধর্মসম্প্রদায় ছিল বিশৃঙ্খল ভাবে। হিউয়েন সাঙ্ যাঁদের পড়াশুনায় অক্লান্ত বলেছেন, তাঁরা বেশিব ভাগই বৌদ্ধ। অর্থাৎ বৌদ্ধরা নিজ ধর্মের প্রসারে পড়াশুনা করতেন এবং তা অপরকে বিতরণ করতেন। তখন ছাপাখানা থাকার প্রশ্নই ওঠেনা - তালপত্র, ভূর্জপত্র বা গাছের ছালে এই সব পুঁথি লেখার কাজ চলতো। হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণী থেকে জানা যায়, এই দেশের রাজা নিজের হাতে পুঁথি নকল করে ধর্মীয় উপহার প্রেরণ করেছেন চীন সম্রাট তে সাঙ্ (Te Tsung) কে। এই পুঁথিটি হলো সংস্কৃত পুঁথি মহাযান ধর্মের। নাম হলো - Ta - fang Te - hua - yea - chang. হিউয়েন সাঙ্ কর্ণসুবণ থেকে তাম্রলিপ্ত গিয়েছিলেন দামোদর অতিক্রম করে বাদশাহী সড়ক ধরে - কাজেই রাঢ় বর্ধমানের তৎকালীন অধিবাসীদের শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় তা থেকে জানতে পারি।

সেকালে শিষ্যগণ গুরুমুখী ছিলেন। শিক্ষার মূলতত্ত্ব ছিল অমৃত আহরণ করা। বৈদিক ঋষিগণ এই অমৃততত্ত্বকেই পূর্ণশিক্ষা বলেছেন। "যেনাহং নামৃতস্যাম, তেনাহং কিম কুর্যাম" - যে অমৃতের সন্ধান দিতে পারেনা, তা নিয়ে কি করবো - মৈত্রেয়ীর প্রশ্নই ভারতের চিরকালের শিক্ষাদর্শনের প্রশ্ন। শিক্ষা শেষে গুরুব উপদেশ তৈত্তিরীয় উপনিষদে - " সত্যং বদ, ধর্মং চর, স্বাধ্যায়ন মা প্রমদ ঃ" সত্য বল। ধর্ম আচরণ কর। অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ো না। বা " মাতৃদেব ভব ! পিতৃদেব ভব ! আচার্য দেব ভব। " অর্থাৎমাতা দেবতা হোক, পিতা দেবতা হোক, গুরু দেবতা হোক। বৈদিক যুগের এই ধারাবাহিকতা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের শিক্ষাচার্যগণও অনুসরণ করে এসেছেন। ধর্মাচরণ ও শিক্ষাদানকে, একটি দর্শনে পরিণত করেছিলেন তাঁরা। চর্যাপদ গুলিতে জীবন ধর্মের পরিচয় থাকলেও অধ্যাত্মসাধনা ও নীতি শিক্ষাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বৈদিক শিক্ষা যেমন আশ্রমিক ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন শিক্ষা তেমনি মঠ - সংঘ ও বিহার কেন্দ্রিক ছিল। অনুমান করা যায় বর্ধমানের (ভরতপুরে বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে) বহু স্থানে বৌদ্ধ ও জৈন বিহার ও স্তূপ ছিল এবং সেখানে শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। সংস্কৃতভাষা কে পাণিনি শিষ্ট করে তুললেও আর্যাবর্ত ও বঙ্গে তা পণ্ডিতজনের লেখ্য ভাষা ছিল, বৌদ্ধগণ ও সংস্কৃত ছেড়ে অর্ধমাগধী বা পালি ভাষার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্বাণের কয়েক শতাব্দী পরে রাঢ়বর্ধমানে প্রাকৃত মাগধী ও অবহট্টের প্রকোপে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার সৃষ্টি নিঃশব্দে সুরু হয়ে যায়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সেই বৈদিক গুরুর পথ অনুসরণ করেই শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। যা পরবর্তী কালে জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠে।

শিক্ষা চিরকালই রাজানুগ্রহের বস্তু ছিল। বাংলায় গুপ্ত - পাল - সেন রাজের সময়ে সেটা প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। ষষ্ঠ

শতাব্দীর মহারাজ বিজয় সেনের তাম্রশাসন যা বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে পাওয়া গিয়েছে তার ভাষা সংস্কৃত এবং অক্ষর ব্রাহ্মী। এছাড়া ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন (অষ্টম শতাব্দীর শেষ), দেবপালের মোঙ্গ্যের তাম্রশাসন (নবম শতাব্দীর প্রথম), মহীপালের বাণগড় তাম্র শাসন (দশম শতাব্দীশেষ), বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন (দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম) এবং লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন (দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়) - সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কথ্য ভাষাকে তখন লেখ্য ভাষার মর্যাদা দেওয়া হতো না। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পাল ও সেন রাজত্বে শিল্প - শিক্ষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা লক্ষণীয়। পালযুগের ভাস্কর বীতপাল, ধীমান, আচার্য অতীশ দীপঙ্কর, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী ও সেন যুগের শাস্ত্রজ্ঞ শূলপাণি ধোয়ী কবি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাঢ় বর্ধমান কে প্রেমভক্তি স্রোতে প্লাবিত করেছিল।

রাঢ় বঙ্গের সর্বপ্রাচীন বাংলায় লেখা কাব্য "শূন্যপুরাণ"। ধর্ম ঠাকুরের পূজ পদ্ধতি কাব্যের আকারে লেখেন বর্ধমান জেলার মেমারীর কাছে ভল্লুকানদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামের কবি রামাই পণ্ডিত। বর্তমানে ভল্লুকানদী ও সেই গ্রামের অস্তিত্ব গবেষণার বিষয়। সে দশম শতাব্দীর কথা, গৌড়ের সম্রাট তখন ধর্মপাল। শূন্য পুরাণ সুপ্রাচীন বৌদ্ধ কাব্য, এতে আছে ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি ছিল না, নিরাকার বা শূন্যাকার, তাই নাম শূন্য পুরাণ :

বাড়ী মোর বল্লুকার
পূজি শ্রী নৈরাকার ।।
শূন্যমূর্তি ধ্যান করি
সাকার মূর্তি ভজি
পূর্বমুখে পূজা করি
পঞ্চম বেদ পড়ি।

শূন্য পুরাণের কবি রাঢ় বর্ধমানের রামাই পণ্ডিত প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে বিখ্যাত হ'য়ে আছেন।

১২০১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বখতিয়ার রাঢ় বর্ধমানের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নদীয়ায় যান ও লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য জয় করেন। তারপর থেকেই রাঢ় বর্ধমানে মুসলমান সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। সংস্কৃত, বাংলা, পালি ভাষার সঙ্গে আর একটি মাত্রা যোগ হ'ল ফারসী ভাষার। গড়ে উঠলো - মসজিদ মাদ্রাসা ও মোক্তব, আরবি ও ফারসী, ভাষা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র টোল চতুষ্পাঠীর পাশাপাশি। মুকুন্দরামের স্বগ্রামে রক্ষিত ১০৪৭ সাল (বাংলা) ১লা ফাল্গুনের দলিলে দেখা যায়, মুসলমান সুলতানের ফারসী ভাষায় খোদাই করা মোহর ছাপ। অর্থাৎ রাজ্য পাটের সরকারী শাসন ব্যবস্থায় ছিল সুলতানী ভাষা - আরবি - ফারসী, এবং সাধারণ মানুষের শিক্ষা - সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও বাঙলা।

আকবর দিল্লীর সম্রাট হয়েই তাঁর রাজ্যকে সুদূর বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বর্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগান শিক্ষাবিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। শের আফগান নিজে একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বেগম মেহের উন্নিষা একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। শের আফগান মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মেহের উন্নিষার অনুরোধেই। দিল্লীর মোগল সম্রাটের সঙ্গে বর্ধমান রাজ শের আফগানের পত্র আদান প্রদান হতো আরবি বা ফারসী ভাষায়। ধীরে ধীরে গ্রাম গঞ্জেও মাদ্রাসা ও মোক্তব গড়ে ওঠে। মেহের উন্নিষার যখন বিয়ে

হয় শের আফগানের সঙ্গে তখন তার বয়স পনেরো । শের আফগান অন্তঃপুরে মৌলবী রেখে মেহের উন্নিষাকে উর্দু, আরবি ও ফার্সী ভাষা শেখান । পরবর্তী কালে এই মেহের উন্নিষাই দিল্লীর সম্রাটের বেগম হন ও পরোক্ষে ভারতশাসন পরিচালনা করেন ১৫ বৎসর ধরে (১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) - তার পটভূমিকা বর্ধমানেই রচিত হয়েছিল ।

প্রাচীন বর্ধমানের অস্তিত্ব রয়েছে বেড়ের নবাব বাড়িতে । এই মুসলমান নবাবগণ বংশ পরম্পরা মুসলমান ছাত্রদের জন্যে মক্তব চালিয়ে এসেছেন । এখানে আরবি - ফারসী শিক্ষা দেওয়া হতো এবং গরীব ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল । বর্ধমান রাজসভায় ভারতচন্দ্র কিছুদিন অতিবাহিত করেন । তাঁর রচনায় বর্ধমানের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায় । ভারতচন্দ্রের লেখায় আছে ঃ

" দ্বিতীয় গড়েতে দেখ যত মুসলমান
সৈয়দ মল্লিক, সেখ, মোগল-পাঠান । "
তুর্কী আরবি পড়ে ফারসী মিশালে ।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ।।

এই সময় উচ্চ বংশের মুসলমান যথা সৈয়দ, মল্লিক, সেখরা তুর্কী, আরবি ও ফারসী পড়তেন । সুলতানের রাজদরবারে বা প্রশাসন বিভাগে চাকুরীর জন্য হিন্দুর ছেলেরাও ফারসী পড়তে লাগলো ।

বর্ধমানের বাদশাহী নাম - শরিফাবাদ । শরিফের উর্দু অর্থ সম্ভ্রান্ত । মুসলমান শাসনের আগেই বর্ধমান শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অভিজাত ছিল । মুসলমান শাসনের সময় পীর ও পয়গম্বরগণও শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন । আইনী আকবরীতে আছে পীর বাহারাম সাক্কা সম্রাট আকবরের রাজদরবারে একজন দার্শনিক, কবি ও শিক্ষাগুরু ছিলেন । তিনি সুফী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর শিষ্য ছিলেন । হিজরী ৯৭০ অব্দে (১৫৬২ - ৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি বর্ধমান আসেন ও কিছুদিন পর এখানেই দেহ রাখেন । ময়ূর মহলে তাঁর সমাধি আছে । কবি পীরবাহরাম হিন্দু ও মুসলমানদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করতেন । তিনি কয়েকটি মিলন কেন্দ্র ও ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন । সম্রাট আকবর এই সাধক কবির একজন পরম ভক্ত ছিলেন । সাক্কার দেওয়ান বা কবিতার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত দুটি খুব সুন্দর দেওয়ান (কবিতা) পার্সী ভাষায় আছে । বর্ধমানে থাকা কালে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন (Persian Works ms - 251 and 365) । বাহারাম সাক্কার কবিতা জীবনধর্মী, মর্মস্পর্শী ও গভীর ধর্মভাবাচ্ছন্ন । এখনও পীরবাহারামের আস্তানায় সেবকরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দেওয়ান পাঠ করেন । কবিতাগুলি সেকেস্তা - মাত্রা ও ছেদহীন ফারসী ভাষায় লেখা । একটি কবিতার অনুবাদ ঃ

আমি আত্ম নিগ্রহের (রূঢ়তা) ভেঙে ফেলেছি
আমি দেখবো তাতে কি হয় ?
আমি অপযশের (ভালবাসার) বাজারে বসেছি,
আমি দেখবো তাতে কি হয় ?
আমি গর্হিত ভাবে সাধু সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করেছি
আমি দেখবো তাতে কী হয় ?

লোকে আমায় সময় সময় ধার্মিক

আবার পরক্ষণেই লম্পট আখ্যা দেয়

লোকে যা ইচ্ছে বলুক আমি তাই মানি

আমি দেখবো এতে কি হয় ?

বাহারাম ।

শের আফগানের বেগম মেহের উন্নিষা কেবল নিজেই আরবি - ফার্সী ভাষা শেখেন নি, তিনি ফার্সী ভাষা শিক্ষার বিস্তারে শের আফগানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন ।

" বর মাজারে মা গরীবাঁ নে চেরাগে নে গুলে

নে পারে পারওয়ানা সেজাদ নে সাদায়ে বুলবুলে ।"

অর্থ ঃ আমার ন্যায় দীন দরিদ্রের কবরে কোন প্রদীপ জ্বলবে না । কোন ফুলও দেওয়া হবে না । কোন প্রেমিক - পতঙ্গের পালক এখানে পুড়বে না, কোন বুলবুলের আওয়াজও শোনা যাবে না ।

এই লাইন দুটি মেহের উন্নিষার রচনা । মেহেরেব যৌবন কেটেছে এই বর্ধমানে । শিক্ষা বিস্তারে তিনি যেমন সক্রিয়া ছিলেন, কবিতা রচনা করেছেনও বেশ কয়েকটি । "নূরমহালী বাদসা", "দুদামী পেশোয়াজ" "পাঁচ তোলিয়া উড়ানি", "কিনারি ফর্স চন্দনী" - নূরজাহানের দেওয়া নাম গুলি পোষাক, অলঙ্কার আভরণ অভিজাত মুসলমান সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । শুধু মুসলমান ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দান করেই ক্ষান্ত হন নি তিনি, কমপক্ষে পাঁচহাজার অনাথ বালিকা - কি হিন্দু কি মুসলমান - সৎপাত্রে বিয়ে দিয়েছিলেন ।

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমানের সর্বদক্ষিণ দামুন্যা গ্রামের টোলে অধ্যাপনা করতেন । সেলিমাবাদের ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগ করেন ও মেদিনীপুরের আড়ারা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে থাকেন ও এখানেই বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (১৫৭৯ খ্রীঃ) লেখেন । চণ্ডীমঙ্গল থেকে মধ্যযুগের এই রাঢ় বর্ধমানের যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায় তা নিখুঁত, জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী । সে সময় বেশির ভাগ মানুষই ছিল দরিদ্র । গ্রামে পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল এবং পাশাপাশি মসজিদে মক্তব বা মাদ্রাসা ছিল । পড়াশুনা করতো বেশির ভাগই বর্ণ হিন্দু ও অভিজাত মুসলমানগণ । দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মানুষকে সারাদিন অন্নের সংস্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো - পড়াশুনার অবকাশই ছিল না । কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ে তার ব্যতিক্রম ছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, " দক্ষিণ রাঢ়ের স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাগদী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে বামুনের ছেলেরাও পড়ে ।" এই সব ডোম ও বাগদীরা ধর্মঠাকুরের পূজারী। ধর্ম চর্চার জন্য তাঁরা সংস্কৃত ভাষা পড়তেন - তবে এদের সংখ্যা নেহাতই অল্প । কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের বিদ্যাচর্চার যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায়, এই সময়ে বর্ধমানে শিক্ষাদানের ভালো ব্যবস্থা ছিল ।

বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদের (১৭০২ - ৪০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজ সভায় আশ্রিত ও সভাকবি ছিলেন ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী । লাউসেন কর্পূরধবলের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে ঘনরাম লিখেছেন ঃ

অকারাদি ককারান্ত জানা হৈল স্বর ।

ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর ।।

তিনদিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান ।
অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান ।।
অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধ সুবন্ত অনর ।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর ।।
ধাতুনাম শব্দভেদ পড়িল অপর ।।
পরম সুবেশ দোহে সুশীল সুন্দর ।।
বেদবাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায় ।

এই চিত্র তৎকালীন রাঢ় বর্ধমানের পাঠশালার পাঠ পদ্ধতির চিত্র । অকারাদি - অর্থাৎ স্বরবর্ণের পর, ককারাদি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠ, তারপর যুক্তবর্ণ, ধাতুরূপ, শব্দরূপ গণিত ও শেষে ব্যাকরণ । মঙ্গল কাব্য গুলিতে রাঢ় বর্ধমানের সমাজচিত্র এত নিখুঁত যে অবাক হয়ে ভাবতে হয় ।

মঙ্গল কাব্যের আর একজন কবি শ্রীরামপুর কাইতির রূপরাম চক্রবর্তী । তাঁর কাব্যে ও রাঢ় বর্ধমানে শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় । সতেরোশো শতাব্দীর মাঝমাঝি রূপরাম পড়াশুনা করেছিলেন পাষণ্ডা গ্রামে রঘুরাম চক্রবর্তীর টোলে । আঠারো শতাব্দীর গোড়ায় ঘনরাম গিয়েছিলেন রামবাটির টোলে পড়তে । বর্ধমানের কুলীন গ্রামে পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হন "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্যের মালাধর বসু । কুলীন গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জৌগামে টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল । মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় গ্রন্থ । তাঁর পুত্র রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন । মহাপ্রভু নিজে রামানন্দর সঙ্গে কুলীন গ্রামে এসেছিলেন । গৌড়ের সুলতান মালাধর বসুকে গুণরাজখান উপাধিতে ভূষিত করেন । জৈন তীর্থঙ্কর "মহাবীর বর্ধমান " বর্ধমানে এসেছিলেন এবং এখান থেকে তিনি পদব্রজে জম্ভীয় গ্রাম বা জৌগাম যান । ঋজুকুলা নদীর তীরে জৌগ্রামে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং সিদ্ধি শেষে এক মহা ধর্ম সম্মেলন করেছিলেন । দেশ বিদেশের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও টোল চতুষ্পাঠির পণ্ডিতগণ এই সভায় ধর্মালোচনা করেন ।

১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ । ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলা ছিল চৈতন্য দেবের প্রেমভক্তিরসে ডুবুডুবু । বাঙলায় তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল - তা শাপে বর হয়ে দেখা দিল । মধ্যযুগীয় দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙালী - অন্যায় অত্যাচারে জজরিত হয়ে দুর্বল ও নিবীর্যে - ক্লীবত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যে জীবন - যন্ত্রনা ভোগ করছিল - তার অবসান হলো । দুর্যোগপূর্ণ আকাশে মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আলোর বন্যা নিয়ে আসে যে সূর্য তার চেয়েও দীপ্যমান হয়ে আবির্ভূত হলেন চৈতন্য মহাপ্রভু । সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জীবনধর্মে বাঙলার বুকে নবজাগরণের সূচনা হলো । তার ঢেউ রাঢ় বর্ধমানেও আছড়ে পড়লো । কাটোয়ার শ্রীখণ্ডে মহাপ্রভুর শিষ্যরা গড়ে তুললেন সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র । দেখতে দেখতে গঙ্গা ও অজয়নদের তীরবর্ত্তী গ্রাম গুলি পাটুলী, সমুদ্রগড়, অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাট, কালনা প্রভৃতি গ্রাম ও জনপদ গুলি সংস্কৃত শিক্ষা ও বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ারে ভেসে গেল, মুছে গেল বাঙালীর এতদিনের জড়ত্ব, ক্লেদ ও কলুষতা । চৈতন্য যুগে যে জ্ঞান চেতনার প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, চৈতন্য পরবর্তী কালেও তার রেশ ছিল ।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে কাটোয়ার সন্নিকট সিঙ্গি গ্রামের কবি মহাভারতকার কাশীরাম দাস গাইলেন ঃ

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

কাঁদড়া গ্রামে চৈতন্য পরবর্তী কবি জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন । তিনি ছিলেন পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা । জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভা চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করা হয় ঃ

আয় দেখি গিয়া গোরা চাঁদে ।
এ চাঁদ বদনের আগে গগনের চাঁদ কি লাগে
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে ।।

এই ষোড়শ শতকেই (১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ধমান জেলার কোগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন বৈষ্ণব কবি লোচন দাস । তার "চৈতন্য মঙ্গল কাব্য" বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি । যেমন -

অমিয় মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহা ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো
এক কৈল শুধুই সুনেহা ।

বর্ধমান শহরের সন্নিকটে কাঞ্চননগরে এই শতকের কবি "গোবিন্দ দাসের কড়চা, মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমনের রোজনামচা বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি উল্লেখ যোগ্য সংযোজন । ষোড়শ শতকেই (১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ধমান জেলার আমাইপুর গ্রামে "চৈতন্য মঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা জয়ানন্দ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন । আর একজন পদাবলী কবি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার গৌরাঙ্গভক্তির অপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন তাঁর কাব্যসুষমায় । এইশতকেই বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বৈষ্ণবকাব্যের বেদব্যাস কবি বৃন্দাবন দাস "চৈতন্য ভাগবত" রচনা করেন ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে । শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশে তিনি চৈতন্য জীবন - কাব্য রচনা করেন ।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ।
চৈতন্য লীলাকৃত ব্যাস বৃন্দাবন দাস ।।

পঞ্চদশকে ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান্ জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বৈষ্ণব কাব্যের মহাকবি " চৈতন্য চরিতামৃত" কাব্যের স্রষ্টা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসেন বাল্যকালেই । চৈতন্য জীবনী কাব্যের মধ্যে তাঁর কাব্য খানি শ্রেষ্ঠতম, ভক্তিরসের অপূর্ব নিদর্শনঃ

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ।
তাঁহার চরণ ধুক্রা করি মুক্তি পানে ।।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মানকরের সন্নিকটে কোটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । রঘুনাথ ছিলেন নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী । নবদ্বীপের টোলে একসঙ্গে পড়তেন । ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনে রঘুনাথ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । রঘুনাথ কোটা গ্রামে তাঁর টোল খুলেছিলেন, সেখানে বহুদূর দূর থেকে ছাত্ররা ন্যায়ের পাঠ নিতে আসতেন । নবদ্বীপের অধ্যক্ষ রঘুনাথকে ন্যায় শাস্ত্রের উপাধি বিতরণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন । বাঙলার এই গৌরব আর কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে জোটেনি । মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র এখানে এসে রঘুনাথকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সম্বর্দ্ধনা দিয়েছিলেন ।

পঞ্চদশ শতকে আর একজন শিক্ষাচার্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নাম "বুনো রামনাথ"। কালনা মহকুমার সমুদ্রগড় গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সমুদ্রগড়ের চতুষ্পাঠীতে বহু দূর থেকে ছাত্রগণ আসতেন এই পণ্ডিতপ্রবর দার্শনিকের কাছে ন্যায়ের পাঠ নিতে। তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিয়ে বহু শিষ্য নিজগ্রামে টোল খুলেছিলেন। রামনাথ সর্বকালের ও সর্বযুগের আদর্শ শিক্ষাচার্য ও মনীষী। অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের দুজন মহিলা শিক্ষাচার্য বর্ধমানের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কোটা গ্রামের রূপমঞ্জরী এবং সোঁয়াই গ্রামের হটী বিদ্যালংকার। সংস্কৃত সাহিত্য পড়ার জন্য ছেলের বেশে সরগ্রামের পণ্ডিত গোকুলানন্দ তর্কালংকারের টোলে ভর্তি হন রূপমঞ্জরী। বাঙলার পাঠ শেষ করে তিনি কাশী চলে যান। কাশীতে ন্যায় জ্যোতিষ, চরক, নিদাম, চিকিৎসা, গণিত বিদ্যাতে পারদর্শিতা লাভ করে রূপমঞ্জরী বিদ্যালংকার উপাধি পান। গ্রামে ফিরে তিনি চতুষ্পাঠী খুলে বসেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রে পরামর্শ নেবার জন্য বহু দূর থেকে জ্ঞান পিপাসু মানুষ ছুটে আসতেন। চিরকুমারী বিদূষী রূপমঞ্জরী রাঢ় বর্ধমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি জ্যোতিষ্ক।

হটী বিদ্যালংকারও কাশীতে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসেন। সেখানে তিনি বেদ, বেদান্ত উপনিষদ আয়ত্ত করে বিদ্যালঙ্কার উপাধি নিয়ে শাস্ত্রচর্চা করেছেন তিনি। কাশীতে তিনি যে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান দেওয়া হয়। কাশীতেই তিনি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে লাগলেন। শুধু বাঙলার নয় ভারতীয় নারী সমাজে হটী বিদ্যালঙ্কার একটি উজ্জ্বল রত্ন। রাঢ় বর্ধমানের গৌরব।

নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের প্রেরণায় রাঢ় বর্ধমানের বহু বড় বড় গ্রামে টোল বা চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই টোল বা চতুষ্পাঠী গুলি খ্যাতিনামা সংস্কৃত অধ্যাপকগণ পরিচালনা করতেন। এতে স্থানীয় বিত্তশালী জমিদারগণ মুক্ত হস্তে অর্থ দান করতেন।

সপ্তদশ শতকে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে সুবিখ্যাত পণ্ডিত কলানিধি ভট্টাচার্যের বিদ্যাপীঠ ছিল। তখন নবদ্বীপ ও শান্তিপুর এই সব কেন্দ্রগুলির আদর্শ ও প্রেরণা ছিল। সেই সময় শান্তিপুর অধ্যাপনা করতেন বিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। তাঁর নিকট পাঠ নিতে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রগণ আসতেন। এই সময় বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি বড় টোল ছিল। এই টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল একশ কুড়ি জন। রায়না থানার পাষণ্ডা ও সন্নিকটবর্তী আড়ুই গ্রামে টোলও চৌ-পাড়ি ছিল। এখানে প্রায় দেড়শত ছাত্র ছিল। রামবাটি গ্রামেও টোল ছিল, কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এখানে পড়াশুনা করেছিলেন।

এই সময় নবদ্বীপের শংকর তর্কবাগীশ ও শিবনাথ ন্যায় বাচস্পতি বিখ্যাত ছিলেন। এ ছাড়া কুমার হট্টের বলরাম তর্কভূষণ ও শিশুরাম তর্কপঞ্চানন, ত্রিবেণীর রামচাঁদ তর্কভূষণ, কানাই ন্যায়বাচস্পতি, বাঁশ বেড়িয়ার ব্রজবিদ্যাবাগীশ রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, ভৈরব তর্কবাচস্পতি, রাঘব তর্কভূষণ, শান্তিপুরের মোহন বিদ্যাবাচস্পতি, কলিকাতার চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শালকিয়ার জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত জনাই এর অভয়াচরণ তর্কালঙ্কর প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। রাঢ় বর্ধমানে এঁদের বহু শিষ্য বিদ্যার্জন শেষ করে নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে টোল বা চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। পণ্ডিতগণের এই তালিকাটি পাওয়া গেছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের এক বংশধরের পুরাতন পুঁথি থেকে। এখানে ৬৮টি

গ্রামের নাম পাওয়া যাচ্ছে, যে গ্রাম গুলিতে বড় টোল বা চতুষ্পাঠি ছিল । তার মধ্যে নদীয়া জেলার তিনটি, চব্বিশ পরগণার একটি,হাওড়া জেলার দুটি, বর্ধমানের সতেরোটি এবং হুগলীর পঁয়তাল্লিশটি গ্রাম রয়েছে । এই টোল গুলিতে ১৩৪ জন ভট্টাচার্য পণ্ডিতের নাম রয়েছে । যারা অধিকাংশই ন্যায় ও স্মৃতির পণ্ডিত দিকপাল শিক্ষাচার্য ।

মধ্যযুগে মুসলমান সুলতানদের সহায়তায় সরকারী কাজে ফারসী ভাষা ও শিক্ষা রাজানুকূল্যে পরিচালিত হত । মসজিদে বা মক্তবেও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার ঢেউকে তা দমিয়ে দিতে পারেনি । টোলে সংস্কৃত শিক্ষা কি ভাবে হতো তার বর্ণনা রূপরাম চক্রবর্তীর 'পুস্তকজায়' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। "কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তিথি উদ্বাহ - প্রায়শ্চিত্ত দুর্গোৎসবাদি, রঘুনন্দনের অষ্ট বিংশতি তত্ত্ব" - এই সকল বিষয় টোলে পড়ানো হতো । তখন টোলের নামছিল - চৌপাড়ি (এখনকার চতুষ্পাঠী) । চৌপাড়ি পরিচালনার জন্য জমিদারগণ কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি, জলপানি দিতেন । গ্রামে জনসাধারণের কাছ হতে বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদিতে 'চৌপাড়ি আদায়' করা হতো । রাজস্ব বা শিক্ষাকরের মত ইহা অবশ্য দেয় ছিল । অল্প শিক্ষিত পণ্ডিতগণের নিজ নিজ পাঠশালা ছিল । এখানে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো, এতে ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই পড়তো । মুসলমান ছেলেরাও একই সঙ্গে এই পাঠশালায় পড়তো।

সেকালে পাঠশালা বা টোলে ছাত্রভর্তি করা হতো পাট্টা - কবুলতির মত দলিল করে । হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চল হতে এরকম একটি দলিল পাওয়া গেছে (পুরাতন চিঠিপত্রে সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থা - ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল) । দলিলটি নিম্নরূপ :-

শ্রী শ্রী হরি

সন ১২৬৬ সাল

মহামহিম শ্রীযুক্ত সোনাতন সরকার বরাবরেষু -

লিখিতং শ্রীশেখ কালাচাঁদ সাং নওপাড়া পরগণে হাবিলী কষ্য একরার পত্রমিদং কাজ্যানাঞ্চ আগে আপনবার চৌপাড়ি আমাদের গ্রামে থাকায় আমার পুত্র শ্রীশেখ ফজলু হোসেন ও শ্রী তযুদ্ধর্ক হোসেন এই দুই লোককে আপনার নিকট লেখাপড়া কোরিবায় কারণ পাটকেলট কট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশ বাঙ্গালার হিসাবে ও হরফে ও ইস্তাহামে পুরা কোরিআ দিবেন । আর বাঙ্গালার হিসাব ও সন্ধান স্বর আ আঁক স্লোকে তৈআর করিয়া দিবেন ইস্তেহামে পুরা করিয়া দিবেন সন ১২৬৬ সাল নাংসক ১২৬৭ সাল মাহ আশ্বীন তক তৈয়ার করিআ দিবেক আর আমার নিকট দুরমাহা মাঘ মোট চুক্তী সর্বযুদ্ধা কোং ২৫ পোচিষ টাকা দিবো টাকার করাব ফি মাহাতে ।। আট আনা দিবো পরে এই কেলট্র কট করারের পরে ইস্তাহামে পুরা করিআ ইস্তাম নিআ আপনকার মাহীনে হিসাব নিকাস করিয়া দিবো আর এই করারের ভিতর তৈআর কোরিআ না দিতে পার তবে আমার টাকা ফেরত আপনার ঠাঁই লইবো আর এই টাকা জখন দিবেন এই একরারের পীঠে রোশীদ দিবো এই তদাখ্যা একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৩ শ্রাবণ -

শ্রী সেখ কালাচাঁদ

সাং - নওপাড়া

ছাত্রভর্তির এই দলিলটি একটি চুক্তি পত্রের মত । কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় : আবেদনকারী মুসলমান হলেও শ্রী শ্রীহরি দিয়ে চুক্তিপত্র আরম্ভ করছেন, একশত বছর আগে শিক্ষার যাবতীয় (থাকা - খাওয়া ও পরা) ব্যয়ভার ২৫ টাকায় হতো, এককবৎসরের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতো - অক্ষর পরিচয়. খাতা সহি, হিসাব নিকাশ, সন্ধানস্বর - আ, আঁকজোখ ইত্যাদি । শিক্ষাগুরুকে চুক্তি মত শিক্ষা দিতে না পারলে সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হত । এই চুক্তি পত্র অনুমান করা যায় যে মধ্যযুগ হতে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ।

পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হতো বাঙলা ভাষা, গণিত, আর্যা ও বিভিন্ন ধরণের হিসাব । প্রাচীন চিঠিপত্র থেকে ৯৮ প্রকারের 'প্রস্ত' পাওয়া গেছে । একটি সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেকে ব্যবহারিক জ্ঞানের দিক হতে পরিণত করতে এই 'প্রস্ত' শিক্ষা প্রণালী যথেষ্ট ছিল । পাকা সংসারী হতে গেলে যে বিষয় গুলি অবশ্যই জানা দরকার পাঠশালায় তাই পড়ানো হতো । প্রস্তের সুরুতে অক্ষর শিক্ষা, তারপর যুক্তাক্ষর বানান ও নামতার কড়া - গণ্ডার হিসাব মুখস্থ করতে হতো । মাহিন্দারের মাস মাইনার হিসাব, ধান-চাল-আলু-গুড় প্রভৃতি জিনিষপত্র কেনা বেচার হিসাব শিখতে হতো । এমন কি স্ব-স্ব বৃত্তি বজায় রাখার জন্য সোনা, রূপা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি খরিদ করার হিসাব, মহাজনি কারবারীর সুদকষা, বাটা কষা আবশ্যিক ছিল । মুদিখানা দোকানদারী চালানোর জন্য মুনাফা - জমা - খরচ, 'পসরি - জায়', মনকষা প্রভৃতি শিখতে হতো ।

এছাড়া বহু রকমের হিসাব যেমন কাঠাকালি, ইঁটকালি, নৌকাকালি, দেওয়াল কালি, দধি কালি, পুষ্করিণী কালি, দুধ কালি শেখাবার প্রথা ছিল । সাধারণ ভূমির মাপ, রাস্তার মাপ, বারতিথি হিসাব কানুন, চিঠিপত্র লেখার ধারা, সেয়া-খত লেখার পদ্ধতি এই পাঠশালাতেই হতো । জমি-জমা সংক্রান্ত হিসাব যেমন - জমাগুজস্তায় খাজনা, দাখিলা, দলিল, পাট্টাকবুলতি, ইজারা পাট্টা, খোসকবালা, কট কবালা, ইজারা বন্ধক, নাম ইস্তফার রশিদ, গোমস্তা কবুলতি, সমৃদ্ধ হুকুম নামা, মহাল ইজারা, দস্তাবেজ শেখানো হতো । অংকের ধারার পাঠ ও ছিল বিচিত্র : উদকষ্টি, অষ্টকোটা, লবণকোটা বৃদ্ধ আউটি, অতিবৃদ্ধ আউটি । আইন আদালত সম্পর্কেও এই পাঠশালাতেই শিক্ষা দেওয়ার কাজ ছিল - আদালতের আর্যা, মোক্তারনামা, জবাবল জমা, বন্ধক জবাব, জমানবন্দী রোরকারী, ফয়সালা, এত্তালানামা, এতার রশিদ, শমন জারি, ইস্তাহার ফরিয়াদী, এত্তেলা প্রভৃতি । রাঢ়ের সর্বত্র মুসলমান রাজত্বের সুরু থেকে এই পাঠ-পদ্ধতি ছিল প্রতি পাঠশালাতেই । অর্থাৎ পাঠশালার বিদ্যার্জন শেষ করেই একজন শিক্ষার্থী সমাজ ও সংসারে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে যে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবার দক্ষতা অর্জন করতো । শুধু সমাজিকতা নয়, উপযুক্ত চরিত্র গঠন করাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতির । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবিকতার প্রকাশ, মূল্যবোধের অনুভূতি ও সদাচার মণ্ডিত আদর্শ জীবন এই পাঠশালার শিখন পদ্ধতির মধ্যেই শিক্ষার্থীর মানসমুকুলে সঞ্চারিত হতো - এ কম গৌরবের নয় । হিন্দু বৈদিক ধর্মের বহু প্রতিভাধর ব্যক্তি এই ভাবেই শিক্ষাজীবনের পাঠ গ্রহণ করে সমাজ ও দেশকে ধন্য করেছেন । একটি প্রাচীন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত দ্বিজদুর্গারাম ভণিতায় দেখা যায় পাঠশালার পাঠ্যতালিকায় 'শিশু জ্ঞানবৃদ্ধির' শিক্ষণ পদ্ধতি । এই পুঁথিতে চৌত্রিশ অক্ষর শিক্ষাদানের কথা আছে । বর্তমানে বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ মিলে মোট ৪৬টি অক্ষর রয়েছে । এই ৩৪ অক্ষরের ধারা আমরা বাঙ্গালা

মঙ্গলকাব্যের 'চৌত্রিশা' স্তরের মধ্যে রক্ষিত দেখতে পাই । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাশীতে প্রচলিত মহাজনী বর্ণমালা ৩২ অক্ষরে গ্রথিত ।

অক্ষর পরিচয় ও তার পরে শিশু শিক্ষা কি ভাবে হতো তা পুঁথির কয়েকটি পঙক্তি তুলে দিলে পরিষ্কার হবে :-

প্রথমে আরম্ভ বিদ্যে চৌত্রিস অক্ষর ----

কিল্লি আদি -- আংকো আস্কো সিদ্ধি লিখ না করিহ হেলো

অতোপর কড়ির অঙ্ক সিখ জতো বালা কড়াকে গুণ্ডাকে লিখ

স্বটিকে বুড়িকে লিখ পুনকে আদি জতো চৌকে লিখিত না করি

হেলো একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চেরে বেদ পঞ্চবান ছয় ঋতু কয়ে সাতেসমুদ্র আটে বসু নয়ে নবোগ দশে দ্বিগ জান জতো সিবু ।

পাঠশালায় যে সব বাঙ্গালা পুঁথি পড়ানো হতো তার মধ্যে শঙ্করাচার্য কৃত গঙ্গাস্তব, আশ্রয় নির্ণয়, রাধারসকারিকা, কুম্ভকর্ণের রায়বার - বাগুগ্রা, অঙ্গদের রায়বার, খুল্লনা ও ফুল্লরার বারমাসী প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য । এ ছাড়া সংস্কৃত ও বাংলার অন্য বৈষ্ণব নিবন্ধ, স্তোত্রাদি, আবৃত্তি ও পড়ানো হতো । এই সব পাঠশালায় মুসলমান ছাত্রগণও পড়তো । তবে এই সব ছাত্রদের মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ধারা পৃথক ভাবে শেখানো হতো যেমন ; 'মোছলমানের প্রকরণ', পীর মুরীদকে, দাদোকে, পোতাকে, দাদী - নানীকে, বড়োশালা, বড়ো বোনকে বোনাইকে খত লেখবার স্বতন্ত্র সেরেস্তা শেখানো হতো ।

মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ সুলতানী আমলের শেষে ও ব্রিটিশের আগমনের সময়ে পড়ুয়াদের মধ্যে অনেক ভুঞা, বণিক, নায়েক, ঘোষ, চোঙ, বৈরাগী, সো পদবী ধারী পড়ুয়ায় নাম পাওয়া যায় । তার থেকে মনে হয় - পাঠশালায় উচ্চ বর্ণহিন্দু ও অভিজাত মুসলমান ছাড়াও সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত পড়ুয়ার সংখ্যাধিক্য ক্রমেই বাড়তে থাকে । জাতি ও বৃত্তিগত ভাবে পাঠশালায় বিদ্যা দান করতেন পণ্ডিত মশাই :-

"অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিরন্তর অষ্টশব্দী আদিকরি পড়িল অমর। বিবিধ প্রকারে অঙ্কশিখি আছে সভে অষ্ট কোটা অষ্টপর শিক্ষা কষ্টের। তিলির নন্দন তার নাারদিতে বাস কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাস। শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয় অঙ্কহল্যে অস্থির কর‍্যালয়" ।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিলি জাতি তেল ব্যবসা করতো বলে কঠিন কঠিন অঙ্ক কষছে । বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় সেকালের পাঠশালার কতকগুলি দুর্লভ কড়চা রক্ষিত আছে । এতে পণ্ডিত মহাশয়দের নাম, শিক্ষণ পদ্ধতি, পত্র লিখবার নিয়ম, হেঁয়ালি ও ছড়া লিপিবদ্ধ রয়েছে । গল্পের ছলে কিভাবে গণিত শেখানো হতো তার নমুনা :-

"সত্যকরি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ দিব্য করি গেলো দুটিশিরে দিয়া হাথ / বিরহে ব্যকুল চিত্ত না শুনে বারণ নিঠুর হইয়া নাক্রি আল্য প্রাণধন / তিলে শতবার মরিলেক দিব কত দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্চ্ছা গত / রাগরসবান বসু একত্র করিয়া গরাস্ত্রি তেজিব প্রাণ বাণ সুচাইয়া / শ্রীরাম দুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি জে কহিলে তাই দিব্যানিশি বুঝ্যা দেখি -।।"

এই কবিতাটির অন্তরালে একটি অঙ্কের উত্তর রয়েছে । অঙ্কটির সমাধান হলো : রাগ = ৬, বাণ = ৫, বসু = ৮ মোট ২৫ এর থেকে বাণ সুচিয়ে অর্থাৎ ৫ বাদ

দিলে থাকে বিষ (বিশ) এই গরল পান করে নায়িকা প্রাণত্যাগ করতে চান যদি না তার প্রিয়তম শপথ মেনে প্রবাসী থেকে ফিরে আসে ।

সেকালে পাঠশালায় আরও দুটি জিনিষ পড়ুয়ারা পড়ুতো । তা হলো, শুভঙ্করী ও খনার বচন । ছাপাখানা ছিল না, তাই পুঁথি নকল করে পুরাতন জীর্ণ প্রায় পুঁথি বাতিল করা হতো । এই ভাবে ধারাবাহিক ভাবে নকল পড়ার ও নকল করার জন্য মূল রচনার অদলবদল হতো। বহু ছড়া ও। শিখন পদ্ধতির কড়চা লোকমুখে আজও চলে আসছে :

"পিঠে পিঠে শেয়াল চড়ে
গাছের কাঁটাল নীচে পড়ে
আঁধার হলে বাগানে যায়,
সবাই মিলে কাঁটাল খায় ।"

কিন্তু, - "তেল চুকচুকে পাতা
তার ফলে ধরে কাঁটা
খেতে সে মধুর মধুর
বীজ গোটা গোটা ।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৌহিত্র নবাব আজীম-উশ-শান সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমান আসেন । বাঁকানদীর ধারে আলমগঞ্জ তারই সাক্ষ্য বহন করছে । আজীম - উশ - শানের উপস্থিতি সুলতানী সংস্কৃতির সঙ্গে মোগল সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটায় । এর পর ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের দুশ বছর এবং পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর আগে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় কাপুর আবুরায় ও বাবু রায় লাহোর থেকে বর্ধমানে আসেন । ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর আমবাগানে কামান দাগলো লর্ড ক্লাইভ । বংলার গৌরবসূর্য ইংরেজের পরাক্রমে অস্ত গেল । এই একশ বছরে রাঢ় বর্ধমান রাজ বংশের আনুকূল্যে শিক্ষা বিস্তারে নূতন করে পথ সৃষ্টি করেছে । জমিদারী পরিচালনা ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা নূতন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান করেছেন - আবু রায়, বাবুরায় (১৬৫৭ - ১৬৯৬), ঘনশ্যাম রায় কৃষ্ণরাম রায় (১৬৯৭) জাগৎরাম রায় (১৭০২), কীর্তি চাঁদ রায় (১৭০২ - ১৭৪০) চিত্রসেন রায় (১৭৪০ - ১৭৫৮), তিলক চাঁদ রায় (১৭৪১ - ১৭৭১) - পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বর্ধমান রাজবংশের রাজগণ । রামপ্রসাদের কালিকা মঙ্গলে মধ্যযুগের শিক্ষার একটা পরিচয় পাওয়া যায় :

" কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে জনেক ।।
চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠচায় পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড় উৎকল কাশীবাসী ।
কারো বা ত্রিহত বাড়ি বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী ।"

বর্ধমানের চতুষ্পাঠি ও বর্ধমান মহারাজার (কীর্তিচাঁদের) আনুকূল্যে এই বিদ্যাশিক্ষার প্রসার ও পরিচয় রাঢ় বর্ধমানের প্রাচীন শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করেছে । ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ রাঢ় বর্ধমান আক্রমণ করলে বহু পাঠশালা, চতুষ্পাঠী

ধ্বংস হয়, বহু পণ্ডিত নিহত হন এবং অনেক মূল্যবান পুঁথি নষ্ট হয়। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে আছে :

"তবে সব বরগি গ্রামা লুটতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া
সোনার বাহনা পলায় পুঁথির ভার লইয়া।"

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ বাংলার তখন নবাব। বর্ধমান রাজের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের বিবরণ থেকে জানা যায় মারাঠা আক্রমণের ফলে বর্ধমানের শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ে। অদৃশ্য হয়ে যায় রাঢ় বর্ধমানের শিক্ষার অগ্রগতি, প্রগতির ধারা, পাঠশালা, টোল, মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী ও মক্তব। বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে বর্ধমানের চলমান জীবনে। ইংরেজদের আগমনে রাঢ় বর্ধমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে এবং চতুষ্পাঠী, টোল ও মাদ্রাসা ক্রমশ বন্ধ হতে থাকে। নূতন করে বাংলার জাতীয় জীবনে শিক্ষার পুরাতন শবের শ্মশানে পাশ্চাত্য শিক্ষার নবজাগরণের সূচনা হয় - সে আর এক অধ্যায়।

সংযোজন - ১

বর্ধমানে আধুনিক শিক্ষার প্রসার : ঊনবিংশ শতাব্দী

বর্ধমান জেলায় আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে। বাংলার প্রথম লেফ্‌টানেন্ট গভর্নর ফ্রিড্‌রিখ, জে, হ্যালিডে যখন বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের প্রয়াস নেন (১৮৫৪ সালে) সেই সময়ে বর্ধমান জেলায় অন্ততঃ ৭০০টি স্কুল চালু অবস্থায় ছিল। William Adams এর বিবরণী (১৮৩৭) থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৮৩০ - ৩৬ সালে এ জেলায় মোট ৬২৯ টি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে বাংলা স্কুল ৫৮৬ টি, ১৮৭ টি সংস্কৃত টোল, ৮৫ টি পারসি (ফার্সী) ৮ টি আরবী, এবং ৩টি ইংরাজী স্কুল। ৪টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ১টি শিশুদের জন্য (নার্শারী)।

সবথেকে বেশী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল আউশগ্রামে (৯১টি বাংলা + ৩২টি সংস্কৃত + ১৯টি ফার্সী)। এরপর কালনা, রায়না এবং জামালপুর (তখনকার সেলিমাবাদ) এর স্থান। বর্ধমান সদরে স্কুলের সংখ্যা ছিল (বাংলা ২৬ + সংস্কৃত ২৫ + ফার্সী ১২)। দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে তখনও ফার্সীর চর্চা ছিল। সম্ভবতঃ নবাব দরবারে চাকরী পাওয়ার ইচ্ছা ফার্সীর প্রতি আগ্রহের একটা কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সংস্কৃতের চর্চাও জোরদার ছিল। তখনও বাঙালী মধ্যবিত্ত ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ গভীরভাবে করে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চার্চ মিশনারী সোসাইটি ও বর্ধমান মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কাপ্টেন জেমস স্টুয়ার্ট বর্ধমান জেলায় দুটি বাংলা স্কুল এবং কয়েকটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্টুয়ার্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা দশ এবং ছাত্র আনুমানিক এক হাজার। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে শুধু বর্ধমানে নয় সমগ্র বাংলাদেশে কাপ্টেন স্টুয়ার্টেরনাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করা হয়।

এই সময়ে আমরা দু'জন ইংরেজ মহিলাকে স্মরণ করব যাঁরা বর্ধমানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের সূচনা করেন। এঁরা হলেন 'বিবি জীয়র' এবং 'বিবি পীরণ' যথাক্রমে এঁরা চারটি এবং বারোটি মেয়েদের পাঠশালা স্থাপন করেন । যে যুগে বাঙালী সমাজে মেয়েদের ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে আটকে রাখা হোত সে যুগে এঁরা যে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সন্দেহ নাই । স্কুলগুলি যে শেষ পর্যন্ত উঠে যায় সে অন্যকথা ।

১৮১৫ সালে বর্ধমানে একটা সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় । ডঃ আবদুস সামাদ মনে করেন এঁর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ প্রতাপচাঁদ । ১৮৩৩-৩৪-এ সি, এম, এস স্কুলের প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৫-এ সরকারী সাহায্যে একটি স্কুল স্থাপিত হয় । রামতনু লাহিড়ী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন । পরে এটি মহারাজার স্কুলের অঙ্গীভূত হয় ।

কাপ্টেন স্টুয়ার্ট, রেভাঃ ওয়াইৎ বেখট, বিবি জীয়র ও বিবি পীরণকে বাদ দিয়ে বর্ধমানে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আর যাঁরা পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন তৎকালীন ডেপুটী স্কুল পরিদর্শক - ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং অন্য ডেপুটী স্কুল পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং অন্য ডেপুটী স্কুল পরিদর্শক কালিদাস মৈত্র। ১৮৬৪তে একটি তথ্যে জানা যাচ্ছে যে কালিদাস মৈত্র-র অধীনে ৩৫টি এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অধীনে ৪০টি বিদ্যালয় আছে । এর মধ্য ৫টি বালিকা বিদ্যালয়, একটি গুরু ট্রেনিং স্কুল, একটি আর্ট স্কুল এবং একটি শারীর শিক্ষণ বিদ্যালয় ।

বর্ধমানে শিক্ষাবিস্তারে বর্ধমানের রাজপরিবারের অবদান অপরিসীম । এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই : অন্যান্য সবকিছুর মতই স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সবকিছুতেই এই পরিবারের অবদান আছে । তাই এদেঁর স্বতন্ত্র উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র হবে । তবে দুজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে আমরা আমাদের অশেষ ঋণ স্বীকার কোরব । এদেঁর একজন অক্ষয় কুমার দত্ত অন্যজন বাংলা তথা ভারতের এক আশ্চর্য মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বঙ্গের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ এর মধ্যে এই জেলায় প্রথমে পাঁচটি মডেল স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ১৮৫৮ সালে ১০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ১৮৫৫ তে প্রতিষ্ঠিত হয় - আমাদপুর, জৌগ্রাম, খন্ড ঘোষ, মানকর এবং দাঁইহাট বিদ্যালয় । ১৮৫৭তে রাণাপাড়ায় এবং ১৮৫৮ সালে, জামুই, শ্রীকৃষ্ণপুর, রাজারামপুর, জ্যোৎশ্রীরাম, দাঁইহাট, কাশীপুর, সানুই (সাহানুই) রসুলপুর বস্তির এবং কেলেগাছিতে । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সবকটি স্কুলই স্থাপিত হয় গ্রামাঞ্চলে । স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি বিদ্যাসাগরের যে কি ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল এই কাজের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায় । বাংলা দেশের মেয়েদের কাছে যদি কোনো একজন ব্যক্তিও চিরস্মরণীয় হবার দাবী রাখেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তাঁর কাছে আমাদের ঋণের কোন শেষ নেই । ফ্রিড্‌রিখ, জে হ্যালিডে-র কাছেও আমরা ঋণী কারণ তিনি বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার সহায়ক ছিলেন । মেয়েদের স্কুলগুলি পরিচালিত হত বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত অর্থসাহায্যে । পরে বিদ্যাসাগরের পক্ষে যখন আর আর্থিক দায় বহন করা সম্ভব হল না তখন বালিকা বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায় । বর্ধমানের রাজপরিবার অজ্ঞাতকারণে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আসেন নি । এরাঁ কি স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন ?

১৮৬৮ তে - বর্ধমান জেলায় মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২-এ। ইংরেজদের জন্য ১টি (১৮৬৬তে স্থাপিত) । বালিকা ইংরাজী বিদ্যালয় ৯টি সবই মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ।

এ্যাডাম সাহেবের বিবরণী থেকে আরো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে বর্ধমানে তখন বহু বিখ্যাত পন্ডিতের বসবাস ছিল । অম্বিকা কালনার সার্বভৌম, মনু ও মিতাক্ষরার অনুবাদক ।

বাগুনিয়ার (মেমারী) গুরুচরণ তর্কপঞ্চানন, বড়বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মাহাতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ, মারোর রঘুনন্দন গোস্বামী, চানকের রাধাকান্ত বাচস্পতি এবং বর্ধমানের রামকমল কবিভূষণ (তেজচন্দ্রর সভাসদ) এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ৩টি প্রতিষ্ঠানে কোরান পড়ানো হোত । ইংরেজী স্কুলগুলিতে মুসলমান এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুমেয়েরা পড়তে যেতেন না ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সব শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই সময়ে জেলায় মক্তব ও মাদ্রাসার মিলিত সংখ্যা ৭৮ টি -এর মধ্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ৬২টি, কলেজ ১টি, নৈশ বিদ্যালয় ৪৩টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৩৮ টি যার মধ্যে ২২১ টি উচ্চ প্রাথমিক ; বালিকা বিদ্যালয় ৭৬ টি এর মধ্যে ৩টি ইউরোপীয়ানদের জন্য, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ২৮টি যার মধ্যে ১৬টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত । ১৯০৪-৯ সালে জেলায় সাক্ষরতার হার ৮.৫% যা তখনকার দিনে উল্লেখ করার মত ।

এরপর বিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে বর্ধমানে শিক্ষার প্রসার দ্রুততালে ঘটতে থাকে । বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমরা শুধু পরিসংখ্যানের সাহায্যে তার পরিচয় তুলে ধরছি ।

সংযোজন - ২

বর্ধমান জেলার স্কুল (১৯৮৮ পর্যন্ত)

	১)	উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ১৭২টি
	২)	মেয়েদের উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ২৮ টি
বর্ধমান সদর মহকুমা =	৩)	জুনিয়ার হাইস্কুল = ১০৮ টি
	৪)	মাদ্রাসা হাইস্কুল = ৬ টি
	৫)	মাদ্রাসা জুনিয়র = ৯ টি
আসানসোল মহকুমা =	১)	উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ৬১ টি
	২)	মেয়েদের উচ্চ ও উচ্চতর = ২৭ টি
	৩)	জুনিয়ার হাইস্কুল = ৩২ টি
দুর্গাপুর মহকুমা =	১)	উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ৩৭ টি
	২)	মেয়েদের উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ৪ টি
	৩)	জুনিয়ার হাইস্কুল = ২৫ টি
কালনা মহকুমা =	১)	উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ৫৬ টি
	২)	মেয়েদের উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ১১ টি
	৩)	জুনিয়ার হাই = ৪৫ টি
কাটোয়া মহকুমা =	১)	উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ৬৩ টি
	২)	মেয়েদের উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ৭ টি
	৩)	জুনিয়ার হাই স্কুল = ৩৪ টি
	৪)	মাদ্রাসা হাইস্কুল = ১ টি
	৫)	জুনিয়ার মাদ্রাসা = ৪ টি

জেলায় মোট উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় = ৪৫৮ টি, জুনিয়ার হাইস্কুল ২৪৪ টি

মাদ্রাসা হাই - ৭টি, জুনিয়ার মাদ্রাসা ১৩ টি, হিন্দী স্কুল ৬টি

উর্দু স্কুল =১ টি, প্রাইমারী স্কুল - ৩৭৮৩ টি,

[জেলার ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলি বর্ধমান শহর, আসানসোল এবং দুর্গাপুরে অবস্থিত। মাদ্রাসার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। আসানসোল, দুর্গাপুর ও কালনা মহকুমার মাদ্রাসার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।]

জেলার মোট সাধারণ পাঠাগারের সংখ্যা - ৬০৫ টি।

বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা - ১২২৫ টি।

উপরোক্ত স্কুলগুলি ছাড়াও বর্ধমান জেলায় ৫ টি (১৯৮৮ পর্যন্ত) স্পনসর্ড স্কুল আছে। স্কুলগুলির নাম নীচে উল্লেখ করা হল।

১) দুর্গাপুর প্রজেক্ট বয়েজ স্কুল

২) দুর্গাপুর গার্লস স্কুল

৩) সাগর ভাঙ্গা হাই স্কুল

৪) দুর্গাপুর আর, ই, কলেজ মডেল স্কুল

৫) রামলাল আদর্শ বিদ্যালয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত স্কুল

১। মহারাজার স্কুল - ১৮১৭, পরে এটির নাম হয় বর্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুল (১৮৫৩) ১৮১৭তে নাম ছিল "অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল", ১৮৪৮ পর্যন্ত টিকেছিল।

২। 'ব্রাহ্ম বয়েজ (১৮৮০) স্কুল টি ১৮৮৩ সালে 'মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পরিচিত হয়।

৩। সি, এম, এস, স্কুলের প্রতিষ্ঠা বর্ষ ১৮৩৪। কিন্তু হাইস্কুল হিসাবে স্বীকৃতি পায় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। চকদিঘী এস, পি, ইনস্টিটিউশন -	১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।		
৫। তোড়কোনা জে, বি, হাইস্কুল (খন্ডঘোষ) -	১৮৯৩	,,	,,
৬। মেমারী ভি, এম, ইনস্ টিটিউট -	১৯০০	,,	,,
৭। ভৈটা ডি,কে, হাইস্কুল -	১৮৭৮	,,	,,
৮। রায়না এস, বি, বিদ্যামন্দির -	১৮৯৪	,,	,,
৯। দিশেরগড় এ, সি, ইনস্টিটিউশন -	১৮৯৬	,,	,,
১০। সিয়ারশোল রাজ হাই স্কুল -	১৮৫৬	,,	,,
১১। রাণীগঞ্জ হাইস্কুল -	১৮৯১	,,	,,
১২। কালনা মহারাজার হাইস্কুল -	১৮৬৮	,,	,,
১৩। বাদলা হাইস্কুল (কালনা) -	১৮৫৬	,,	,,
১৪। আমড়া জুনিয়ার হাইস্কুল (শক্তিগড়)	১৮৯৮ (এখনও জুনিয়ার)	,,	,,
১৫। ৫০ বছরের পুরনো স্কুলের সংখ্যা -	৩৮ টি।		

১৬। মেয়েদের সবচেয়ে পুরনো স্কুল - বর্ধমান হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় - ১৯২১ - এ প্রতিষ্ঠিত।

জামালপুরে একটি তপশীলি আদিবাসীদের জন্য স্কুল এবং একটি কৃষি বিদ্যালয় আছে।

জেলায় সবথেকে পুরনো -

বর্ধমান রাজ কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল - ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর।

প্রথম অধ্যক্ষ - ডব্লু বিলিংস।

বর্ধমানের শিক্ষা : সংযোজন -৩

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ

প্রতিষ্ঠার দিন : ১৫ই জুন ১৯৬০ সাল।

প্রথমে শুরুহয় : ২৬ টি কলেজ নিয়ে।

মে মাস পর্য্যন্ত = ৮১ টি কলেজ। (১৯৮৮)

স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানো হয়

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, সংখ্যাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বাণিজ্য, ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সংস্কৃত, এম, বি,এ এবং পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা কোর্স (ডি,জি, আর, পি)। এ ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বি,লিব এবং এম, লিব ; আইনে এল, এল বি। বিদেশী ভাষাগুলির মধ্যে (ইংরাজী ছাড়া) ফরাসী এবং রাশিয়ান পড়ানো হয়। স্পোকেন ইংলিশ ; ডব্লু, বি,এ,এস - এ ট্রেনিং কোর্সও রয়েছে।

কলেজ সংবাদ

অধীনস্থ মোট কলেজের সংখ্যা = ৮১। এর মধ্যে শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই ২৮ টি কলেজ। এর মধ্যে ১৩ টি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। দুর্গাপুর গভঃ কলেজে জিওলজি অনার্স এবং এম, এ পড়ানো হয়। এ ছাড়া একমাত্র এই কলেজে পাসকোর্সে ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি (শিল্প রসায়ন) পড়ানো হয়। এম, ইউ, সি উইমেন্স কলেজে (বর্ধমান) ১২টি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। এর মধ্যে একটি বিষয় ভূগোল। আসানসোল গার্লস কলেজেও ভূগোলে অনার্স পড়ানো হয়। বর্ধমান রাজকলেজে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমার্স এবং ফিনান্স গ্রুপে অনার্স আছে। রাণীগঞ্জের ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজে ভূগোল, হিন্দী এবং জিওলজি (ভূ-তত্ত্ব) বিষয়ে অনার্স এবং পাশকোর্সে ইলেকট্রনিক্স্ পড়ানো হয়। বর্ধমান জেলায় বি,এড্ পড়ানো হয় টীচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং কালনা ও কাটোয়া কলেজে। দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বি, ই, এম,ই এবং এম, টেক পড়ানো হয়। বর্ধমানে মেয়েদের জন্য একটি ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া একটি মেডিক্যাল কলেজ (এম, বি, বি, এস) এবং একটি সংগীত মহাবিদ্যালয় (পদ্মজা নাইডু কলেজ অফ্ মিউজিক) আছে। কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ে (পুরুলিয়া) পাশ কোর্সে উর্দু পড়ানো হয়।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য : বর্ধমান জেলায় নয় কিছু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হোল।

বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজ - প্রি - মেডিক্যাল পড়ানো হয়। শ্রী গোপাল ব্যানার্জী কলেজ (বাঘাটি, মগরা, হুগলী) এবং নেতাজী মহাবিদ্যালয় (আরামবাগ) এখানে প্লান্ট প্রোটেকসান

পাশ কোর্সে পড়ানো হয়। রামানন্দ কলেজে (বিষ্ণুপুর) ফিজিওলজিতে অনার্স এবং পাস কোর্সে কম্পিউটার সাইন্স, চন্দননগর গভঃ কলেজে ফরাসীতে এবং ইনকাম ট্যাক্স ও কস্টিংএ অনার্স পড়ানো হয়। হুগলী মহসীন কলেজে উর্দু, আরবিক এবং পারসিক-এ অনার্স এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ পড়ানো হয়। হুগলীতে মেয়েদের জন্য একটা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজ আছে।

ঋণ স্বীকার ঃ

১) বর্ধমান রাজপরিবার ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা
- ডঃ আবদুস আমাদ (রাজকলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৮১)

২) প্রগতির পথে - বর্ধমান জেলা কংগ্রেস স্মারকগ্রন্থ

৩) বর্ধমান গেজেটীয়র (১৯১০)

৪) Feedom Movement in Burdwan - Bhaskar Chattopadhay and
Ramakanta Chakraborty

(Burdwan Distict Congress Centenary Celebration Commitee (1985) Burdwan)

৫) স্নেহভাজন অনুজ দেবনাথ মৈত্র এবং ধূর্জটি মাজি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন।

৬) উনিশ শতকে বর্ধমান শহরে ইংরাজী শিক্ষা - কালীপদ সিংহ
(বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল
শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৮৩)

বর্ধমানের অর্থনীতির প্রেক্ষাপট

সমীরন চৌধুরী

ডঃ ভবতোষ দত্তর ভাষায়, 'উনিশ শতকে যে সব বাঙালি অর্থনৈতিক বিষয়ে লিখেছেন যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁরা কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন না। এঁরা সবাই অর্থনীতির চর্চায় আর গবেষণায় প্রধানত স্বয়ং শিক্ষিত ।' ধূর্ত লোকেরা অপরাধ করলেও এভিডেন্স খাড়া করে। আমি সেই জাতীয়। অর্থনীতির ছাত্র না হলেও যাঁদের নাম লিখেছি তাঁরা ছিলেন 'স্বয়ং শিক্ষিত' আমি নিতান্তই অ-শিক্ষিত। একটা ভরসা, যে লেখাটি লিখছি তা কোনও গবেষণা পত্র নয়, নিতান্তই চর্চার অংশ। অর্থনীতির ছাত্ররা ক্ষমা করবেন না জানি, কারণ এটা নিতান্তই অনধিকার চর্চা।

কলকাতায় এখন ধূম-ধাম করে তিনশো বছরের স্মৃতি মন্থন করা হচ্ছে। পাক্কা বেনিয়া, যুদ্ধবাদ জোব চার্নক শায়েস্তা খাঁকে হটিযে চাটি বাটি গুটিয়ে রাতের অন্ধকারে হুগলী ছেড়ে সুতানটীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে যখন মোঘলদের কাছ থেকে ফরমানটি পায় ইংরেজরা, তখন তা দেওয়া হয়েছিল বর্ধমানে বসেই। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় সেই অর্থে বর্ধমান হল আধুনিক কলকাতার মা। বয়সের দিক থেকে তো বটেই। জনৈক সাংবাদিক লিখেছেন, 'জোব চার্ণক বৈঠকখানায় গাছতলায় আলবোলার ছোটো ছোটো সুগন্ধ মেঘ ভাসিয়ে দিতে দিতে যখন জেলেদের তিনটি অজ্ঞাত পরিচয় গ্রামকে ভবিষ্যৎ কলকাতা শহরে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছিলেন, তখনই বর্ধমান এর বয়স দু হাজার হয়ে গেছে। .....জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের রাজগৃহ থেকে তাম্রলিপ্ত যাওয়ার পথে বর্ধমান ছিল একটি প্রধান বিশ্রাম ও বাণিজ্য বিন্দু।' কেউ কেউ বলেন ২৪ তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান এখানে কিছু দিন কাটিয়েছিলেন, তাঁরই নামানুসারে এখানকার নাম হয় 'বর্ধমান' আবার কারও কারও মতে বর্ধমান মানে 'a prosperous centre of growth'. কৃষির দিক থেকে বর্ধমান জেলাকে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের 'শস্যভাণ্ডার' আর শিল্পের দিক থেকে বাংলার 'রূঢ়'। জেলার ভৌগলিক প্রাকৃতিক বিশ্লেষণে দাঁড়ায় পূর্বাঞ্চল শস্য-শ্যামলা আর পশ্চিমবঙ্গ রুক্ষ পাথুরে রাঙামাটির দেশ। স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে কয়লা খনি ও কলকারখানা। বর্ধমান জেলা উষ্ণ অঞ্চলের প্রান্তসীমায় অবস্থিত, ২২°৫৬' এবং ২৫°৫৩' অক্ষাংশ যুগলদ্বারা বেষ্ঠিত। কর্কট প্রান্তরেখা জেলাকে দুভাগে ভাগ করেছে। জেলার ব্যাপ্তি ৭০০৭°২ বর্গ কিমি ঃ।

কয়লাখনি বা কলকারখানা গড়ে ওঠার বহু আগে থেকেই বর্ধমান কৃষি অর্থ নির্ভরশীল। নদী মাতৃকার দেশ বর্ধমান। একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে দামোদর। এ ছাড়া অজয় তো আছেই। আছে ছোটবড় অনেক নদী। নদ-নদীর সংখ্যা ১৬ মোট লম্বায় ৯৫৭°৫৬ কিমি যার জলযান চলাচলের দৈর্ঘ্য ১২৮°৭৫ কিমি। পূর্বাঞ্চল এক ব-দ্বীপ বিশেষ। পশ্চিমাঞ্চল একেবারে অনুর্বরা নয়। সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম ও মানভূমের বিধৌত কাদামাখা, কর্কশ বালি মাখানো পলির সবটাই নষ্ট হয়না। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মের উত্তাপ বেশী। বৃষ্টিপাত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। এখানে সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদ খনি স্থাপনে সহায়ক এবং শিল্প উৎপাদনে উৎসাহী করে তুলেছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যদি যুগের আগে থেকে বর্ধমান যদি ধনে ঐশ্বর্যে অগ্রগামী হয়ে থেকে থাকে তা কৃষি কার্যের জন্যই। এতগুলো নদীর আশীর্বাদ যেখানে বীজ ছিটোলেই ফসল ফলে সেখানে কৃষি কার্যে সাফল্য তো আসবেই। তবে বাণিজ্য বসতে লক্ষীও বর্ধমানের কপালে ছিল, অনুমান করা যায়। কারণ কাটোয়া কালনায় গঙ্গা পথে, দামোদর মারফত সপ্তগ্রামে যোগাযোগ ভালই ছিল। আর সড়কপথে উচালন দিয়ে তাম্রলিপ্ত এদিকে পাটলিপুত্র যাওয়ার পথে বর্ধমানের এক একটি চটি যে বিশ্রামের এবং ব্যবসার কেন্দ্র ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাঁতের কাপড়, কাঁসা, পিতলের বাসন পত্তর, ছুঁরি-কাঁচি প্রভৃতি রপ্তানী করা হত অনুমান করা যায়।

ধন সম্পদে যে বর্ধমান চিরকালই রমরমা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শেরশাহ রাস্তা তৈরী করেছিলেন, মুঘলরা শের আফগানের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, বর্গীরা হামলা করেছিল, কাপড় বিক্রি করতে এসে কেউ বর্ধমানে রাজা হয়ে বসেছিলেন নিশ্চয়ই কোনও অজানা অসমৃদ্ধ দেশে নয়। তবে এ অঞ্চলের মানুষদের খুব একটা সংগ্রামী চরিত্র গড়ে ওঠেনি প্রাকৃতিক আশীর্বাদের জন্য। খরা-বন্যা-মহামারীতে ক্ষতি হয়েছে কিন্তু অন্যান্য জেলার তুলনায় তা কখনই ব্যাপক নয়। সেই ট্রাডিশন এখনও চলেছে। বহু অফিসার কর্মী রিটায়রমেন্টের পর বর্ধমানে স্থায়ী ভাবে বাড়ি ঘর বানাচ্ছেন। কারণ কলকাতার প্রাণস্পন্দন ছাড়া তথাকথিত এত সমৃদ্ধ জায়গা বাংলায় আর নেই।

যাই হোক চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন পরিব্রাজকের লেখা থেকে বর্ধমানের সমৃদ্ধির খবর পাওয়া যায়। প্রথমে কাঁকসা এবং পরে দামোদরের পথ ধরে বর্ধমান সম্পূর্ণভাবে ১৫৭০ এর পর মুঘলদের হাতে যায়। ১৫৮৩ সালে টোডরমল জমি জরীপ এবং জমির গুরুত্ব অনুযায়ী খাজনা নিরুপণ করেন।

এই খাজনা ব্যবস্থা থেকে সেই স্থানের জমির উর্বরতা, সুযোগ সুবিধা বা অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কিছুটা অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ সন্যাসীদের ব্যক্তিগত জমি রাখার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু খাজনা ব্যবস্থার একটা সুক্ষ রূপ দেওয়ার জন্য 'মঠ' থেকে চাষবাদ করা হত। বলদ, জমি চাষীকে দেওয়া হত। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ১৷৬ অংশ 'মঠ' কে দিতে হত। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র থেকেও প্রায় একই পদ্ধতির কথা জানা যায়। তবে সব ভূ-সম্পত্তিই রাজ সম্পত্তি হিসাবে ধরা হত। শের শাহের আমলে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা সুস্থ রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়। আর সম্রাট আকবর টোডরমলের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ করেন। খাজনা ধার্য হয় ১৷৩ অংশ। ইংরেজরা ১৬৪২ সালে বাংলায় শুল্কহীন যে কোনও রকম বাণিজ্যের অধিকার পায়। ১৬৯০ সালে পায় কলকাতা। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন জারী করেন। বন্দোবস্তের আগে জমিদার বা ইজারাদারদের জমিতে কোনও স্বত্ত্ব ছিলনা, শুধু রাজস্ব আদায় করত তারা। আদায়ী টাকার ১১ ভাগের ১ ভাগ পেত কমিশন হিসাবে। জমির মালিক ছিল রায়ত কৃষকরা। বর্ধমান রাজের অধীনে এই সময় ছোট ছোট তালুক পত্তন হতে আরম্ভ করে। এইসব তালুক পত্তনের সময় বেশ উঁচু হারে সেলামী এবং জামানত নেওয়া হত। ইতিমধ্যে ১৭৭০ এবং ১৭৮৭ তে দামোদর এবং আজয়ের কোপে বন্যা কবলিত হয় বর্ধমান। বহু বর্দ্ধিষ্ণু চাসী, এমনকি বর্ধমান মহারাজও তাদের দেয় খাজনা বা কর বাকী রাখতে বাধ্য হয়। কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর অসন্তুষ্ট হয় এতে। যাইহোক ক্রমে ১৭৯৯ থেকে ১৮২৫ এর মধ্যে পত্তনি তালুকের মাধ্যমে বর্ধমান রাজ রক্ষা পায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও খুশী হয়। সারা হিন্দুস্তানে কৃষি উৎপাদনের দিক থেকে বর্ধমানকে প্রমন বলে তারা চিহ্নিত করে এবং নথিপত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় সাতের আটভাগ

অংশ জমি এসময় চাষের আওতা ভুক্ত হয়। ১৮২৫ এবং ১৮৫৫ আবার দুটি বড় বন্যা হয়। বাঁকা, বেহুলা, ভাগীরথি, কানা দামোদরে পলি জমে জলধারণের ক্ষমতা কমে আসে। ফলে প্রায়শঃই বন্যা দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৬৫ এবং ১৮৭৪ সালের খরা অন্যান্য জেলার মত বর্ধমানের মানুষকেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ বর্ধমানেও ভূমিহীন কৃষক সৃষ্টি হয়। ১৮৪২ থেকে ৭২ পর্যন্ত এই ৩০ বছরে সারা ভারতবর্ষে ভূমিহীন কৃষক দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষের মত।

এদিকে ১৭৭৪ সালে বর্ধমানে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও ১৮৫৩ পর্যন্ত তার ব্যবসায়িক উত্তোলন শুরু হয়নি। রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতা রেল যোগাযোগের সুবাদেই এই অঞ্চল শিল্প সমৃদ্ধ হতে থাকে। এখন পিগ্ আয়রণ কারখানা স্থাপিত হয় কুলটিতে ১৮৭৪ সালে। ১৮৮৯ তে রাণীগঞ্জ কাগজ কল স্থাপিত হয়। উৎপাদন শুরু হয় ১৮৯১ সালে। ১৯০৯ পর্যন্ত এক হিসাবে দেখা যায় ১০৭৪ জন কাজ করেছে এবং উৎপন্ন হয়েছে ৫,৩৯৪ টন কাগজ যার মূল্য ছিল তখনকার দিনে ১৬,৩৬,১১৯ টাকা। আরেকটি হিসাবে দেখা যায় ১৯০৮ পর্যন্ত ১৮,৯০৬ টন লৌহ উৎপাদিত হয়েছে যার মূল্য ছিল ২৭,১৩,৬২৫ টাকা। মেসার্স বার্ণ এ্যণ্ড কোম্পানী রাণীগঞ্জে তাদের পটারি কারখানার সাথে সাথে লাইম ওয়ার্কস করেন অণ্ডালে এবং ইঁট ও টালি তৈরি শুরু করেন দুর্গাপুরে। কুলিরা থাকত কারখানার কাছেই 'কুলি লাইন' এ।

সিল্ক উইভিং শিল্পেরও ব্যাপকতা ছিল তখন (১৯০৮-১৯০৯) ৭০,০০০ গজ একর, ৪৮,৪৩০ গজ সিল্ক যার মূল্য ছিল যথাক্রমে ৭৫,০০০ এবং ৩৬,৬৭৯ টাকা প্রায়। কাটোয়া, মেমারী, জগদাবাদ, এবং সদরেই সাধারণতঃ এগুলি তৈরি হত। তসরের কাপড় মেমারীতে এত সুন্দর হত যে বম্বে, মাদ্রাজে পর্যন্ত এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। সে সময় দেখা যাচ্ছে বাইরে চালান দেওয়ার থেকে স্থানীয় ভাবেই বিক্রি হত বেশী

চমৎকার এম্ব্রয়াডারি কাজ থাকত ধুতি, চাদরে। ৭ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত তসর, গরদ, সিল্ক-এর দাম ছিল। অনেক সময় মহাজনরা তাঁতিদের কাঁচামালের জন্য আগাম দাদন দিত এবং পরে সব মাল কিনে নিত। আবার 'দালাল' দের এড়িয়ে মুনাফা বেশী করার আশায় কোনও কোনও তাঁতি সরাসরি বর্ধমান শহরে হাজির হত। কাটোয়া কালনার মাল অবশ্য কলকাতাতেই বেশী যেত। অনেক সময় চাষে যারাই রেশম উৎপাদন করত তারাই আবার কাপড় বুনত। ফলে সারা বছরই কিছু না কিছু কাজ তারা পেত। কালনা কাটোয়ার দিকেই এ ধরনের শিল্পের বেশী সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁত শিল্পও বর্ধমানের বেশ কিছু জায়গায় পাওয়া যায়। পূর্বস্থলী, কালনা এবং মন্তেশ্বরেই এর ব্যাপকতা বেশী। অবশ্য মেমারী, জামালপুর প্রভৃতি জায়গাতেও তাঁত শিল্পের প্রচলন ছিল। তাঁত শিল্প যে কত লাভজনক ছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অন্যতম শিক্ষাগুরু তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশাই ব্যবসা বাণিজ্যেও এক প্রবাদ পুরুষ ছিলেন। তিনি একাই ১২০০ টি তাঁত বসিয়েছিলেন। মুটের মাথায় করে কলকাতা চালান দিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মধ্যবিত্তের উৎসাহে এবং অনুকূলে তাঁত শিল্পকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা হওয়া সত্বে হস্তচালিত তাঁত ইওরোপের যন্ত্রচালিতের কাছে হটে যেতে বাধ্য হয়। ফলে তাঁত শিল্পের অধোগতি শুরু হয়। স্বধীনতার পর আবার কিছুটা উঠে পড়ে লাগার চেষ্টা হয়। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং সমবায় প্রথায় উন্নতির চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁতিদের অবস্থার আজও উন্নতি হয়নি। দালাল, ব্যাঙ্কের সুদ, সমবায়ের শিক্ষিত কর্মকর্তার চুরি, কলকাতার অফিস-বাড়ি-গাড়ি প্রচারের চাপে যাঁতাপিষ্ঠ হচ্ছে আজও তাঁতীরা। গড় প্রতি কাপড়ে তাদের ঘরে লাভ ঢোকে পাঁচ টাকা।

কংগ্রেসী জমানায় জনৈক বিলাত ফেরত মন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি বাকিংহাম প্যালেসে কাঞ্চননগরের ছুরি দেখেছেন। খুবই স্বাভাবিক। কাঞ্চননগরের ছুরি, কাঁচি ছিল জগৎ বিখ্যাত। একজন দক্ষ কারিগর দিনে দু থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা, শিক থেকে ১ ইঞ্চি চওড়া ছুরি ৭২ টি পর্যন্ত করতে পারত। সেই ঐতিহ্যময় শিল্প আজ ধ্বংসের পথে। পিতল, কাঁসার বাসন, দাঁইহাট, বনপাস, কাটোয়া প্রভৃতি জায়গায় বিখ্যাত ছিল। কামারপাড়ায় এখনও অনেক দক্ষ শিল্পিদের বসবাস। এছাড়া মাটির পাত্র, মাদুর বর্ধমান জেলাতে ভালই হত। আমাদেরই ছোটবেলায় দেখেছি বদ্ধিষ্ণু পরিবারের কত্তা মশাই জমিজমার হিশাব নিচ্ছেন সঙ্গে কুলোয় ধরে 'বিড়ি' তৈরি করছেন। বর্ধমানে বিড়ি শিল্পও যে অনেক ঘরে ঘরে ছিল তা ১৯১০ এর জেলা গেজেটীয়ারে পাই।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বর্ধমানে সারা বছরের চাষ হত না। মুখ্যত আউশ আমন ধান চাষ ছাড়া বছরের অনেকটা সময়ই বসে থাকতে হত। যাঁরা শিক্ষার আলো পেলেন, তাঁরা শহরে মহানগরীতে কাজের ধান্ধায় বেরোতেন। কেউ চাকরি করতেন, কেউ ওকালতি করতেন। নিজের হাতে চাষ যারা করতেন না তাঁরা চাষের সময় জন-মজুর খাটাবার জন্য 'দেশে' র বাড়িতে যেতেন। জমি বেশীও থাকুক আর কমই থাকুক 'বর্ণ হিন্দুরা' কোনও দিনই লাঙ্গল ধরত না। ফলে গঞ্জে, চটিতে তাদের শহরে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরির জন্য যেত। গরীব চাষিরা যারা লাঙ্গল ধরত অবসর সময়ে হাতের কাজ করত। আমার জানা 'বাজার-বনকাপাসী' একটা গ্রাম সেখানে গ্রামের প্রায় সবাই শোলার কাজ জানে। আজ সেই শোলার কাজ জগদ্বিখ্যাত। তখন তো আর 'ফুড ফর ওয়াক' ছিল না। আর ছিলনা 'জওহর রোজগার প্রকল্প' সুতরাং যারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র মজুর খাটতে যেতে পারত না তারা গ্রামেই এটা ওটা করত। আর হাতের কাজ না জানলে আশে পাশে ইঁট ভাটা থাকলে মজুরী করত বা গ্রামের পুকুর সংস্কার করত।

স্বাধীনতার পূর্ববর্ত্তী কালে আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছিল বর্ধমানে। দেশব্যাপী বহু বিদ্রোহ হয়ে যায় এই সময়। ১৮৫৪ এ ভিল বিদ্রোহ, ১৮৫৫ তে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭তে সিপাহী বিদ্রোহ। কোনও বিদ্রোহই বর্ধমানের গায়ে আঁচ কাটেনি। কারণটা সম্ভবতঃ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অপ্রতুলতা বর্ধমানে ছিলনা। আর একটা কারণ বর্ধমান রাজ। অন্যান্য বড় জমিদারদের মত এঁরা শুধুই কর আদায়কারী বা কোন ক্ষেত্রেই প্রজা উৎপীড়ক ছিলেন না। রাস্তাঘাট করিয়েছেন, প্রচুর পুকুর কাটিয়েছেন, বন্যায় প্রজা রক্ষার্থে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সেচ ব্যবস্থা ভালই থাকায় চাষাবাদটা ভালই হত। বাঙলার আর কোথাও এত পুকুর দেখা যায়না। ১৮৭৪ এর পর নদীগুলি মজে যাওয়ার ফলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির কথা ভাবা হয়। কাঞ্চননগর থেকে জামালপুর দীর্ঘ ২২ মাইল ইডেন খাল খনন করা হয়। এ ব্রিটিশ রাজের অবদান। বর্ধমান রাজ পাল্লা ফার্ম শুরু করেন প্রায় ২৫ একর জায়গা নিয়ে। যেখানে ধান ছাড়াও পাট, আলু, আখ চাষ শুরু হয়। "ওরে নদ দামোদর, তোরে নিয়ে আতান্তর" ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৭-১৮ এবং ২২-২৩ শুধু ভাসিয়েই দেয়নি, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা বর্ধমানের মানুষকে গ্রাস করতে থাকে।

সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হয় পান্ডবেশ্বর, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, রায়না, জামালপুর, খন্ডঘোষ প্রভৃতি জায়গা। যাইহোক ১৯৩৪ এ দামোদর কানেল এর কাজ সম্পূর্ণ হয়। একর প্রতি সাড়ে তিন টাকা শর্ট লীজে এবং সাড়ে বার টাকা লংলীজের জলকর ধার্য হয়। ১৯৩৫ সেচ এলাকায় সরকার জল নেওয়া বাধ্যতামূলক করে। কর বেড়ে দাঁড়ায় সাড়ে পাঁচ টাকা। বর্ধমান কৃষি ভিত্তিক এলাকা। সুতরাং কৃষকদের

একত্রিত করার মত সুযোগ বর্ধমান ছাড়া আর কোথায় আছে। সর্বভারতীয় কৃষক সভার মাধ্যমে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ক্যানেল কর ২ টাকা ৯ আনায় নেমে আসে।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ৪২ সালে দুনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক সংকট এবং দূর্ভিক্ষ। ক্যানেল কর বাড়তে বাড়তে হয় - সাড়ে পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন এবং অবশেষে দেশের স্বাধীনতা এবং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ কর্তৃক ক্যানেল কর কমিয়ে ৪ টাকায় ধার্য। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে শুরু হয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা। ১৯৫১ থেকে 'ব্লক' পর্যায়ের সূত্রপাত। এবং প্রথম থেকেই কৃষি কার্যের ওপর জোর দেওয়ায় বর্ধমান জেলা উন্নতির দ্রুত মুখ দেখে। হয় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। আমেরিকার 'টেনিসি ভ্যালি কর্পোরেশনের' ধাঁচে গড়ে ওঠে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'। অন্যদিকে ২১ শে মে ১৯৭৫ ফারাক্কা প্রকল্প শুরু হওয়ায় গঙ্গায় জল বাড়ে। এই ফাঁকে কৃষি উন্নয়নের আগে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা সেরে নিই।

রেল, নদীপথ, সড়ক যোগাযোগ ভাল থাকায় আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় প্রথম থেকেই। মেমারী, কাটোয়া, কালনা, পানাগড়, গুসকরা গুরুত্বপূর্ণ বিতরণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

কাঠের ব্যবসায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় এই সব কেন্দ্রগুলি। আসত চাইবাসা, চক্রধরপুর, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি জায়গা থেকে, রেল যোগে। জল পথে অবশ্য কাটোয়া কালনার মন্দা শুরু হয়, প্রথমত পলি পড়ার জন্য, দ্বিতীয়তঃ রেল লাইন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই। অবশ্য ফারাক্কা ব্যারেজ শুরু হওয়ার পর থেকে ছোট ছোট লঞ্চ চালানো যেতে পারত। কিন্তু সেদিকে এ পর্যন্ত নজর দেওয়া হয়নি। বড় নৌকা কিছু কিছু চলে এখনও। এই জেলায় বেশ কিছু স্থায়ী হাট অবশ্য ছোট খাটো ব্যবসার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পরবর্তী ক্ষেত্রে রাস্তা ঘাটের আস্তে আস্তে উন্নতি হয়। বিশেষতঃ ৭০ দশক থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত রাস্তা পৌঁছে গেছে। বহু নদীতে আগে পারাপারের অসুবিধা ছিল, স্থায়ী সেতু সে সমস্যার সমাধান করেছে। গ্রামের মানুষ এখন আর সদর শহর বা মূল ব্যবসা কেন্দ্রে পৌঁছতে অসুবিধা বোধ করেনা। আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, বর্ধমান এখন বড় বড় দোকান, বড় বড় কোম্পানীর 'শো রুমে' ছেয়ে গেছে। কলকাতার দরের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর বর্ধিষ্ণু চাষীদের অনেকেই শহরে দোকান করা, এজেন্সী নেওয়া, হোটেল, রাইস মিল করার দিকে ঝুঁকেছে। মোটের ওপর কলকাতা, শিলিগুড়ির পরই বর্ধমান এখন বড় ব্যবসা কেন্দ্র। বিশেষতঃ শহর বর্ধমান হুগলীর কিছু অংশের, বাঁকুড়ার কিছু অংশের এবং বীরভূমের অনেকখানির ব্যবসার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ডাক্তারি ব্যবসারও প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান। বিশেষ একটি কেন্দ্রে এত ডাক্তার, এশিয়ার কোথাও নেই। বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে এত সুপার মার্কেট হয়েছে, যে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে খরিদ্দারের থেকে বোধহয় দোকান বর্ধমানে বেশী। রাজ্যের মাথা পিছু আয়ের তুলনায় বর্ধমানের অন্ততঃ ৭ শতাংশ বেশী। ৭০-৭১ সালে মাথা পিছু আয় দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৫২৪ টাকা, বর্ধমানে সেখানে ৬৮৫ টাকায়। জনসংখ্যার হার কম হওয়ার, নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ার উন্নয়নের অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বর্ধমান জেলার অগ্রগতি তাৎপর্যপূর্ণ।

যে জমিদারী প্রথার শুরু হয় ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক ১৬০ বছর পর তার অবসান হয়। বর্ধমান জেলা এত পট পরিবর্তনের পরও কৃষিকার্যে সেই প্রথমটিই হয়ে আছে। এর কারণও আছে। প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা ছাড়াও স্বাধীন ভারতবর্ষে

১৯৬১, ৬৫ সালে বর্ধমানকে 'সবুজ বিপ্লবে'র আওতায় আনা হয়। I.A. D.P, I.A.A-P, প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বর্ধমানের মাটিতে সোনা ফলতে থাকে। বলা বাহুল্য প্যাকেজ প্রকল্প ও নিবিড় চাষ পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র অংশ গ্রহণকারী জেলা বর্ধমান অধিক ফলন ও সুফলের অধিকারী করে তোলে। কিছুদিন আগেও সেখানে হাড় গুড়ো আর গোবর একমাত্র সার ছিল সেখানে, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগেও বর্ধমান শীর্ষে চলে যায়। ৭০-৭১ এ একাধিক ফলন উৎপন্ন হল। সমগ্র প্রদেশের প্রগতি যেখানে ৫৫ শতাংশ বর্ধমানে সেখানে হল ১৯০ শতাংশ। ৭১ এর গণনা অনুযায়ী ৫৪ শতাংশ কর্মপ্রবৃত্ত লোক কৃষি নির্ভর তার মধ্যে ৩০ শতাংশই ভূমিহীন। এতে কৃষি সমৃদ্ধির ছিটে ফোঁটাও সংখ্যাগুরু ভূমিহীনরা পায়না। এতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনীতিক প্রগতির সম্ভাবনা কম। কারণ সমৃদ্ধির সম্প্রসারণ বাজারের প্রসার ঘটায়, বিনিয়োগের উৎসাহের সঞ্চার করে। অসংখ্য কৃষিজীবিদের ভূমিহীনতা যেমন তাদের নিজেদের দারিদ্রের কারণ তেমনই প্রগতির ইপ্সিত গতি সঞ্চারেও প্রতিবন্ধক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যাঁরে তুমি ফেলিছ পিছে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

কৃষি উন্নয়নে দুটি পথ। একদল মনে করেন কৃষি পদ্ধতির উন্নয়নের সাথে সাথে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অপর পক্ষ মনে করেন, প্রথমে ভূমি সংস্কার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জমি পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম তাঁরা যেমন করেছেন তেমনই ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থবাহী কিছু পদক্ষেপও তাঁরা নিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে ১টি পদক্ষেপ যেমন, সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় ৬ একর জমির খাজনা মকুব করা হয়েছে। এবার দেখা যাক ৮১ সালের জনগণনায় কি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষিতে ৪৬.১৭ শতাংশ লোক কার্যপ্রবৃত তার মধ্যে ৮.৪৯ শতাংশ ভূমিহীন।

এবার আসা যাক শিল্প উন্নয়নের দিকে। এ অঞ্চলে ইতস্ততঃ ধানকল গুলি আধুনিক শিল্পের পর্যায়ভুক্ত না করে স্বাধীনোত্তর কালের বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ থেকে শুরু করে দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট, এম, এ, এম, সি, 'কোক ওভেন' সার কারখানা গড়ে ওঠে দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে। ৬টি বড় শিল্প, ১০টি মাঝারি শিল্প, প্রায় ৫০ টিরও বেশী ক্ষুদ্র শিল্প এই নব্য শিল্প নগরীতে গড়ে ওঠে। সমগ্র টাউনশীপ গুলির বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য গড়ে ওঠে ডি, এন, এ ডি, ডি, এ (পরবর্তীকালে এ, ডি, ডি, এ) প্রভৃতি সংস্থা। শুধু বর্ধমান নয় দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে কাজের সন্ধানে এখানে মানুষ আসতে থাকে। হয়ে ওঠে দেশের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। ডি, ভি, সি, উৎপাদিত বিদ্যুৎ, রাস্তা ঘাটের যোগাযোগ, ট্রেন যোগাযোগ শিল্পোন্নয়নের যে 'ইনফ্রাস্ট্রাক্চার' তা দুর্গাপুরে যথেষ্ঠ। এখানে এখনও নতুন নতুন বৃহৎ শিল্প এবং তার সাথে 'এনসিলিয়ারি ইণ্ডাষ্ট্রিজ' গড়ে তোলা সম্ভব। ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনাও বর্ধমান জেলায় প্রচুর। বর্তমানে বৃহৎ শিল্পের মোট কর্মী সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার (১৯৮১ সালে) জেলার লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ১৮৬০০ টি (১৯৮৫-৮৬)।

এ জেলায় অসংখ্য শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। এর মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত কিছু শিল্প আছে। কিন্তু শিল্পের জন্য অর্থ লগ্নি দরকার, আর দরকার ক্রেতা। বর্ধমান জেলার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কোন এক সময়ের হিসাবে আমানতের পরিমাণ ৫৬৫ কোটী ৫২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। ঐ সময়ে লগ্নীর পরিমান ১৪০ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। হিসেব মত এই পরিমান হওয়া উচিত ছিল ৩৪০ কোটী টাকা। অর্থাৎ চাষী বর্ধমানের ২০০ কোটী টাকা বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির মারফত জেলার বাইরে চলে

যাচ্ছে। আর বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক শিল্প স্থাপন যে কত পিছিয়ে তার একটা উদাহরণ দিই। বর্ধমান জেলা পরিষদ হলে সারাদিন ব্যাপী সেমিনার চলা কালীন স্বয়ং অর্থ মন্ত্রীকে বৃহৎ শিল্পের প্রতিনিধিকে রীতিমত হুমকী দিতে হয়, তাঁরা যদি ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্ডার দেওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সরকারকে লড়তে হবে, লোকজন দিয়ে তাদের অফিস ঘিরে রাখতে হবে। সুতরাং বৃহৎ শিল্পগুলি জেলার ভীড় বাড়িয়েছে বটে কিন্তু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। কয়েকজন লোকের চাকরি দেওয়া এবং কিছু দোকান পাট, সিনেমা রেস্তোঁয়া ছাড়া জেলার সার্বিক উন্নতিতে কোনও ভূমিকা নেই। বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়েরও একটা ভূমিকা ছিল এতে। প্রথমে চিন্তা হয়েছিল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বায়াস বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে উঠবে এই বিশ্ববিদ্যালয়, তা না হয়ে বছর বছর সাধারণ ডিগ্রী প্রসবকারী এক সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবেই থেকে গেল।

ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু কিছু কলকারখানা গড়ে উঠলেও ৭৪-৭৫ সালে যে সামান্যতম জোয়ার এসেছিল তা এখন স্তিমিত। বর্ধমানের মানুষ উৎপাদনশীল কিছু করার থেকে 'দোকান' করার দিকে অনেক বেশী আগ্রহী।

এছাড়া বিদ্যুৎ সমস্যা, শ্রমিক অসন্তোষ সারা পশ্চিমবঙ্গের মত বর্ধমানেও অধিকমাত্রায় আঁত্রেপ্রেনারশীপের থেকে পুরনো কিছু বাড়ি বা পতিত জমি থাকলে মোটা টাকার সেলামী নিয়ে ঘর করে দোকান ভাড়া দেওয়া অনেক বেশী লাভ জনক এখানে । সাধারণ কেনা বেচার দোকান করাও ভাল। এখানে একজন স্টেশনারী ডীলার বছরে দেন ২৭ লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স, একজন গুড়ের ব্যবসায়ীর বাৎসরিক টার্নওভার ২২ কোটি টাকা। চালের আড়ৎ বা ধানের ব্যবসায় এখনও লাভ আছে। ঠিকাদারী ব্যবসাও বর্ধমানের তরুণদের ভালই আকৃষ্ট করে। বর্ধমানে ভুঁইফোর ধনীদের একটা বড় অংশ জুড়ে এঁরা। একগাড়ী ধান চোরাপথে চালান করলে ভাল টাকা লাভ। টেণ্ডারের মহিমায় আণ্ডার রেটে করা কাজের থেকে ওভারসীয়ার এঞ্জিনিয়ারদের পকেটে কিছু দিতে গিয়ে উন্নয়নের নামে টাকার হচ্ছে শ্রাদ্ধ। কাজের হচ্ছে দফারফা। রাস্তা ঘাটের বিস্তারের সাথে সাথে 'ট্রান্সপোর্ট' ব্যবসায় কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন। কারও বাস নেই রুট আছে, কোনও কিছু বিনিয়োগ না করে সকালে মুখে জল দিয়ে পাচ্ছে ৫০ টাকা রুটভাড়া, আবার ৩-৪ লাখটাকার বাস কিনে লগ্নী করে ফাইনান্সার বা ব্যাঙ্কের ধার মিটিয়ে দিনের শেষে 'হাত তোলা' যা পাচ্ছে তা কহতব্য নয়। এর মাঝে অর্থকেন্দ্রের দিশারী অর্থনীতির আর এক দিক 'সমবায়' আন্দোলনও চলছে। শুধু রেঞ্জ ১ এই ২৫ ধরনের সমবায় সমিতি আছে। মোট সমিতির সংখ্যা ৭৮৩টি। এ রকম জেলায় আরও ২ টি রেঞ্জ আছে।

মোটি কথা শিল্পের 'রূঢ়' রাজ্যের 'শস্যভাণ্ডার' হওয়া সত্তেও কোনও ক্ষেত্রেই এ জেলার সন্তোষজনক অগ্রগতি নেই। উদ্বৃত সৃষ্টি হচ্ছেনা। পুনর্বিনিয়োগের হার মন্থর, স্বতস্ফূর্ততার অভাব ঘটছে, অর্থলগ্নীতে মানুষ আশঙ্কিত।

নগরায়ন সমৃদ্ধির লক্ষণ। ১৯৮১ সালে সেন্সাস দপ্তর মারফৎ ১৩০ টি শহর গোষ্ঠী ও শহরে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ১২ টি শহর গোষ্ঠীর ৫ টিই বর্ধমান জেলাতে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শহর গোষ্ঠীর বৃদ্ধি মুখ্যত লোক সংখ্যার বৃদ্ধির ফল। নগর সুলভ সমৃদ্ধি, কার্যসংস্থান, বাসস্থান, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বিজলী, জলসরবরাহ, শিক্ষা, জলনিকাশী ব্যবস্থার পরিমাণ ও গুণগত মান বাড়েনি। ক্রমে শহরগুলি অসহনীয় ভীড়াক্রান্ত, মলিন বস্তিতে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামে কৃষকদের চেতনার বিকাশ ঘটেছে বটে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান বাড়েনি,

বাড়েনি চিকিৎসা, শিক্ষার সুযোগ। অর্থনৈতিক বাড়বাড়ন্ত স্বত্ত্বেও মৌলিক সমস্যাগুলির কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না। গর্ব করার মত কিছুই এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি।

আমরা কি শুধুই বেঁচে থাকব লোভী মানুষের অর্থ উপার্জনের জন্য এক ধ্বংস প্রাপ্ত শহর রাণীগঞ্জকে নিয়ে ? যন্ত্রনায় হাঁসফাস করব দুর্গাপুরের চিমনীর দূষিত ধোঁয়া ধূলো নিয়ে ? আর গরব করব শুধুই কাটোয়ার কার্ত্তিক নাচ অথবা শক্তিগড়ের ল্যাংচা নিয়ে। কি নিয়ে বলব, Burdwan is ever prosperous ?

তথ্য সূচী :-

১। পশ্চিমবাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব - তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি - অশোক রুদ্র

৩। Buddhism in Ancient Bengal — Dr. Puspa Niyogi

৪। ভূমি ব্যবস্থা কংগ্রেস ও কৃষক সভা - মদন ঘোষ

৫। 'পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি গবেষণা', চতুরঙ্গ/মার্চ ১৯৮৭

৬। 'জেলা চিত্র : বর্ধমান' - কলকাতা ২০০০/এপ্রিল - মে ১৯৮৩

৭। দর্পণে বাংলা - শান্তি কুমার মিত্র

৮। পশ্চিমবঙ্গের নগর সমস্যা - অশোক মিত্র, ২৭ মার্চ ১৯৮২

৯। Fiftyfifth Annual Meeting of the Association of Indian University - Souvenir, 1980

১০। সমবায় চিন্তা, ত্রয়োদশ সংখ্যা

১১। সপ্তপর্ণী - ১৯৮৯

১২। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বর্ধমান : কল্যাণব্রত ভট্টাচার্য, মিউনিসিপ্যাল স্কুল শতবর্ষ স্মরনিকা

১৩। জেলা গেজেটীয়র, ১৯১০ খৃ :

১৪। Industry in Burdwan

১৫। The Heritage of Burdwan : Agro-Economic Perspectives – Prof. Goutam Kr. Sarkar (1989)

১৬। উদয় অভিযান, যুবমেলা সংখ্যা ১৯৭৩

সংযোজন :

বর্ধমানের অর্থনীতি : কিছু তথ্য

১। ১৯৮১ সালের সেনসাস অনুযায়ী

জেলার মোট কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা = ১৩,৬৩,৬৭৬ জন (২৮.২০%)

(১৯৭১ এ ছিল = ১০,৯৩,৮০৯ জন (৩০.৭৩%)

কর্মনিযুক্ত নয় এমন লোকের সংখ্যা = ২৩,৫৫,১৪৯ জন (৬৯.৩৯%)

বছরে আংশিক সময়ের জন্য

	কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা	= ১,১৬,৫৬৩ জন (২.৪১%)
	কর্মনিযুক্ত লোকের মধ্যে কৃষি শ্রমিক	= ৪,১৬,৭৯০ জন ।
	কর্মনিযুক্ত লোকের মধ্যে কৃষক	= ৩,১৭,১৬০ জন।
	কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত	= ৪৩,৭০৭ জন।
	অন্যান্য পেশায়	= ৫,৮৬,০১৯ জন।
২।	স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে নিযুক্ত (১৯৮৮)	= ৬৯১৫৮ জন।
	নিবন্ধভুক্ত স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের সংখ্যা (১৯৮৮)	= ২৩,৬১৩ টি।
৩।	রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরীর সংখ্যা (১৯৮৫)	= ৪৬৪ টি।
	নিযুক্ত শ্রমিক (১৯৮৫)	= ১,১৬,৩৩৪ টি।
	রেজিস্টার্ড ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিট (১৯৮৫-৮৬)	= ১৮,৬০০ টি।
	নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	= ১,০৯,৩৫৪ টি।
	তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা (১৯৮৮)	= ৬,০৩,৯৯৯ জন।
৪।	ব্যাঙ্ক সমূহের মোট শাখা (১৯৮৭-র মার্চ পর্যন্ত)	= ৩৫৫ টি।
	সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের মোট সংখ্যা	= ৩৫ টি।
	গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	= ৬০ টি।
৫।	১৯৮৯-৯০ এ জেলা পরিকল্পনাখাতে মোট ব্যায়বরাদ্দ ধরা হয়েছে	= ১৯৮ কোটী ৯৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা।
	কৃষিতে	= ৫৬ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা।
	শিল্পে	= ৩৬ কোটী ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

সমকালীন শিল্পকলায় বর্ধমান

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঢ়বঙ্গের এই জেলার বাহ্যিক রুক্ষতার আড়ালে এক শৈল্পিক সজীবতা রসজ্ঞের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি কোনকালেই। কারু ও চারুশিল্পের দুই পথেই এই জেলার শিল্পীদের অনায়াস বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। তাদের শিল্পকর্মে জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যও নানাভাবে ফুটে ওঠে। দর্শক বা ক্রেতার মনোরঞ্জনের জন্য এই অঞ্চলে যেমন শিল্পসৃষ্টি প্রচেষ্টা দেখা গেছে তেমনি শিল্পী নিজের গভীর শিল্প দর্শন প্রকাশের জন্যেও আপন খেয়ালে শিল্পসৃষ্টি করে গিয়েছেন।

প্রথমে বর্ধমানের কারুকলার দিকটি নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। কারুকলায় ক্রেতার পছন্দ ও চাহিদার সঙ্গে লোকশিল্পীর শিল্পবোধের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটে গেলেই কারুকলার নিদর্শন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারুশিল্পী তো নিছক নিজের শিল্পরুচি প্রকাশের প্রয়োজনেই শিল্পসৃষ্টি করেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদেই তার শিল্পসৃষ্টি। সুতরাং দেশব্যাপী যে যান্ত্রিক শিল্পসৃষ্টির উদ্যোগ চলছে তার সাথে প্রতিযোগিতায় অপারগ হস্তশিল্পীরা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে, বাঁচার তাগিদে অনেকেই ভিন্ন জীবিকার সন্ধান করছেন। তবু এই জেলার সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রায় দেড় লক্ষাধিক অধিবাসী কারুশিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

শিল্পাঞ্চল আসানসোল ও দুর্গাপুরের অল্প কিছু সংখ্যক মৃৎশিল্পী ও পিতলকাঁসা ঢালাই শিল্পী ছাড়া অধিকাংশ হস্তশিল্পীই জেলার অপর তিন মহকুমার নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে তাদের শিল্প-সাধনা করে চলেছেন। এদের মাধ্যমে বৈচিত্র আছে। যেমন - তাঁত শিল্প, ঢোকরা, পোড়ামাটি, মাদুর, সোলা, বাঁশ, কাঠ খোদাই, পট, পাথর খোদাই ইত্যাদি।

সমকালীন হস্তশিল্পীদের মধ্যে বর্ধমান জেলার তাঁতশিল্পীদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে আগত তাঁতশিল্পীরাই মূলতঃ এই জেলার পূর্বস্থলী, কাটোয়া, কালনা, সমুদ্রগড়, মেমারী, দেবীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এদের তৈরী ধুতি ও শাড়ীর দাম দশ থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত।

টাঙ্গাইল জামদানী ঘরানার শাড়ী, বিশেষ করে বুটির কাজ যুক্ত শাড়ী এদের গুণগত উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। এরা যেমন দিনে একখানি শাড়ীও তৈরী করছেন, তেমনি আবার এক দেড়মাস ধরে একখানি শাড়ীও তৈরী করে থাকেন। সরকারী সাহায্য যদিও এদের অনেকে পান, তবু প্রয়োজনের তুলনায় সেই সাহায্য খুবই কম। উপযুক্ত পৃষ্টপোষকতা লাভ করলে এদের তৈরী শাড়ী আন্তর্জাতিক বাজারে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করবে।

তাঁতশিল্পের কথা বলতে গেলে কাটোয়ার ঘোষহাটে সম্পূর্ণ মেয়েদের একমাত্র তাঁত সমবায় কেন্দ্রটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৭৬ সাল থেকে 'কাটোয়া প্রাক্তন ছাত্রী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লি ঃ' নামে এই কেন্দ্রটি চালাচ্ছেন তাঁত শিল্পে শিক্ষণ প্রাপ্ত কিছু মহিলা। শতাধিক সদস্য নিয়ে এই কেন্দ্র 'তন্তুজ' থেকে প্রতি মাসে ২৮০০ শাড়ী সরবরাহ করার একটি স্থায়ী বরাত পেয়েছে। সরকারী 'জনতা শাড়ী' প্রকল্পে তন্তুজ এদের কাছ থেকে কাপড় কিনে ভরতুকি দিয়ে বাজারে বিক্রী করছে। মহিলা তাঁত শিল্পীরা শুধু কাপড় তৈরীর কাজে নয় - বিক্রীর জন্যে যেভাবে সমবায় গঠন করে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন তা প্রসংশনীয়।

তাঁতশিল্পের পর আউসগ্রাম থানার দরিয়াপুর সমবায় ভিত্তিক ঢোকরা শিল্পীদের কথা বলতে হয়। অতীতে মধ্যপ্রদেশের কোন অঞ্চল থেকে ঢোকরা উপজাতিদের একটি দল এসে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। কাঁচা পেতলের তৈরী মূর্তি নির্মাণে এই অশিক্ষিত শিল্পীরা বিশেষ পটু। দেবদেবীর মূর্তি থেকে প্রদীপদান, ধুনুচি পূজাউপকরণ ও ঘরের ছোটখাটো প্রয়োজনীয় উপকরণ এরা তৈরী করেন। কুড়ি-পঁচিশ টাকা থেকে দু-তিনশো টাকার মধ্যে এদের তৈরী শিল্প উপকরণ ক্রমশই রসিক মহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্তমানে সরকারী সাহায্যে এদের কাজের গুণগত উৎকর্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী অনুদান নিয়ে কাজ করে এরা লাভের মুখও দেখেছে কোন কোন ক্ষেত্রে। বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে এদের কাজ। এই জেলার কাঠ খোদাই-এর কাজও উল্লেখযোগ্য। পূর্বস্থলীর নতুনগ্রামের শ্রীশম্ভু ভাস্করের কাঠ খোদাই আজ সারা দেশে বহুল আলোচিত। নতুনগ্রামের অন্যান্য শিল্পীরাও গামার, শিমূল প্রভৃতি কাঠে নানা মূর্তি তৈরী করছে। রাবণ, শ্রীদূর্গা, লক্ষী-পেঁচা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মূর্তি তৈরী করে এরা প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। দেশের বাইরেও এদের কাজ যেতে আরম্ভ করেছে। মঙ্গলকোট অঞ্চলেও কিছু কিছু শিল্পী আছেন যারা কাঠখোদাই এর কাজ করেন। এছাড়া দামোদরের দক্ষিণ তীরে 'বড়াগ্রাম' -এ নিজস্ব শৈলিতে এবং জেলার অন্যান্য কিছু অঞ্চলেও কাঠ খোদাই এর কাজ হয়। তবে একদিকে ভাল কাঠের মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে কাঠের তৈরী তৈজসপত্রের চাহিদা ক্রমশ কমতে থাকায় এই মাধ্যমের শিল্পীরা এক সংকটজনক অবস্থায় পড়েছেন।

তাঁত শিল্পকে আশ্রয় করে এখনও এই জেলার কাটোয়া, দাঁইহাট, ঘোড়ামারা, সিঙ্গী, জগদানন্দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গরদ ও তসর শিল্প সামান্য পরিমাণে হয়ে থাকে। দুই শতাধিক কর্মী এই শিল্পের সঙ্গে আজো তাদের জীবনকে জড়িয়ে রেখেছেন।

গুসকরা অঞ্চলে আর একদল কারুশিল্পী আছেন-যারা কালো ও লাল রঙের মাটির ঘোড়া, মনসা মূর্ত্তি, ঘট ইত্যাদি রচনা করেন। রচনারীতি অনুযায়ী এদের কাজ বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া ও অন্যান্য স্থানের কাজের থেকে স্বতন্ত্র। আদিম রীতির অনুসরণে এদের কাজ অনেক মৌলিক । পানাগড় সন্নিকটস্থ ভরতপুর গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে আবিস্কৃত ঘোড়ার মূর্তির সঙ্গে বরং কিছু মিল খুজে পাওয়া যায়।

পিতল ও কাঁসার ঢালাই ও পেটাই এর মাধ্যমে তৈজসপত্র তৈরী করার প্রাণকেন্দ্র ছিলো এই জেলার কাটোয়ার বেগুন কোলা, বর্ধমান ও রায়না অঞ্চল, এখন অভাবের তাড়নায় এই পেশায় নিযুক্ত অধিকাংশ শিল্পী অন্য জীবিকার আশ্রয় নিয়েছে। স্টেনলেসের বাসন গৃহস্থের তৈজসপত্রে জায়গা করে নেওয়ায় পেতল, কাঁসার বাসনের চাহিদাও কমেছে। তবু কয়েকশো কর্মী আজো তাদের পৈতৃক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি তৈরী করতো যেসব শিল্পী তাদের অবস্থাও অনুরূপ। প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে এদের শিল্পকলা। মৃতপ্রায় কাঞ্চননগরে এখন শুধু মানুষ যায় বোধহয় কঙ্কালেশ্বরী কালী মায়ের দর্শনের ইচ্ছায়।

মঙ্গলকোট, ভাতাড়, সমুদ্রগড়, সিমলন প্রভৃতি অঞ্চলের একসময় হতে বোনা পাটির খুব কদর ছিল। বেত আর বাঁশের তৈরী চাটাই দরমা যথেষ্ট শিল্পসুষমা মণ্ডিত ছিল। তাও আজ নষ্ট হতে বসেছে।

কারুশিল্পের আর এক মাধ্যম সোলা। দেবীপ্রতিমার সাজের জন্য সোলা শিল্পের যথেষ্ট কদর ছিল প্রাচীন কালে। অতি সাম্প্রতিক কালে, সম্পূর্ণ সোলার তৈরী প্রতিমা করে যারা দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের অনেকেই এই জেলার

মানুষ। শ্রী অনন্ত মালাকার, আদিত্য মালাকার, তাঁর মা, রবীন মালাকার, অমৃত মালাকার এর নাম এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কাটোয়ার কাছে বনকাপাসী এবং পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের শিল্পীদের কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য। এক একটি প্রতিমার সাজ দেড়হাজার, দুহাজার, তিন হাজারে হয়ে থাকে। কয়েকজন শিল্পীর 'মাসাধিক' কালের পরিশ্রমে এগুলি সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ তথা বিভিন্ন মহাপুরুষের সম্পূর্ণ সোলার তৈরী মূর্ত্তি কারুশিল্পের বাজারকে বিস্তৃত করেছে। এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। নানারকম সোলার মুখস, বিয়ের টোপর, মূর্ত্তি, খেলনা প্রভৃতির মাধ্যমেও শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা এরা করে থাকেন। সোলার স্বল্প স্থায়িত্ব এবং অল্পদিনের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে পড়া এই মাধ্যমে কাজ করার অন্তরায় - নাহলে এই মাধ্যমে কারুশিল্প আরো জনপ্রিয় হতো।

মেমারীর কাছে সরকারী পরিচালনায় 'পঞ্চগ্রাম সমবায়' এর নাম প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। স্থানীয় পাঁচটি গ্রামের দেড়শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ কর্মী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের হস্তশিল্পের বিভিন্ন রকমের উৎপাদন চলছে। এদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি মুগা ও মাদুরের ওপর আঁকা দেওয়াল চিত্র, খাবার টেবিলের মাদুর, মাদুরের রোল, দেওয়াল পঞ্জী, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির কারুশিল্প এবং হাতে তৈরী কাগজ। শিল্পীদের প্রয়োজনীয় জলরং স্কেচ্ এর উপযোগী সুন্দর হাতে তৈরী কাগজ এরা তৈরী করে থাকেন। তবে বাজারে চাহিদার তুলনায় এদের উৎপাদন অত্যন্ত কম। সরকারী পৃষ্টপোষকতা আরো উদার হলে এঁরা উন্নতি করবেন।

বর্ধমান জেলার নানা জায়গায় এখন দেবী প্রতিমার চালের পটচিত্র অঙ্কনের সন্ধান পাওয়া যায়। চালচিত্র অঙ্কনের রীতিও প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কারুকলার পর চারুকলা আলোচনা করতে গেলে বর্ধমান রাজ পরিবারের সংগ্রহশালায় (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে) রক্ষিত বিদেশী বা বহিরাগত শিল্পীদের তেল রং এর কাজগুলোর কথা বলতে হয়। এই ছবিগুলির কয়েকটি খুবই উচ্চমানের। তবে বর্ধমানের মাটির সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব গভীর নয়।

স্বাধীনতা উত্তর কালে বর্ধমানে চারুকলার চেষ্টা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। মধু মোল্লা নামে একজন শিল্পী দ্রুত তুলির টানে তেল রং-এ কাজ করতেন। পরে তিনি অধুনা বাংলাদেশে চলে যান। খোসবাগান অঞ্চলে অরুণ নাগ মহাশয় শিল্পচর্চা করতেন। ভোলানাথ ঘোষাল একসময় চিত্রচর্চা করতেন।

ষাটের দশকে বর্ধমান খোসবাগানের জনপ্রিয় চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্টপোষকতায় তাঁরই নার্সিং হোমে গড়ে ওঠে আর্ট কলেজ। তিনি নিজেও চিত্রচর্চা করতেন রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে। ১৯৬৩ সাল থেকে এই কলেজ কয়েক বছর চলার পর উঠে যায়। বর্তমানে এখানে ঐ কলেজেরই ছাত্র শ্রী সমর মুখোপাধ্যায় 'চিত্র মন্দির' নামে একটি ছোটদের ছবি আঁকার স্কুল চালান।

তৎকালীন আর্ট কলেজের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী শিবশঙ্কর কুণ্ডু। সরকারী আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ইনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ড্রয়িং-এর শিক্ষকতা করেন। শিবশঙ্কর বাবুর তেল রং এর কাজ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। ঐ কলেজের যে সব ছাত্র পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করেছে তারা হলেন হরিহর দে, সমর মুখোপাধ্যায়, অনিল সিংহরায়, ঝন্টু সাউ, ঝর্ণা শেঠ, মদন দাস, অশোক দাশগুপ্ত, সুফল চৌধুরী অঞ্জলি সান্যাল প্রভৃতি। অশোক দাশগুপ্ত পরবর্তীকালে ফটোগ্রাফীতে সুনাম অর্জন করেন। বর্তমানে তার পেন্টিং এর থেকে ফটোগ্রাফ বেশি জনপ্রিয়। শ্রী গনেশ বসাক একসময় প্যাস্টেলে ভাল কাজ করতেন। হরিহর দে মূলতঃ মৃৎ শিল্পী হিসাবে বর্ধমানে জনপ্রিয় হলেও তার ভাস্কর্যের এবং

পেন্টিং এর হাত সমান মিষ্টি। সত্তরের দশকে দামোদরের কৃষক সেতুর ওপর তার তৈরী কৃষক দম্পতি কিম্বা গোলাপবাগ তারাবাগের মোড়ে আশির দশকে বিধান রায়ের মূর্তি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। দুটোই সিমেন্ট কাস্টিং। হরিহরের পুত্র পূর্ণেন্দু দেও বর্তমানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তার নানা পেন্টিং এর মাধ্যমে।

সমর মুখোপাধ্যায় স্টিল লাইফ সৃষ্টিতে বিশেষ দক্ষ। অতি সম্প্রতি 'ছাগ মুণ্ডু যুক্ত' একটি কাজ লায়ন্স ক্লাবের ৮৯ সালের প্রদর্শনীতে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অনিল সিংহরায় একসময় জলরং এ ভাল ছবি করতেন, ঝর্ণা শেঠ পট চিত্র করতেন, স্বর্ণকার মদন দাসের ছবি একসময় ফাইন আর্ট একাডেমীর বাৎসরিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এঁরা সকলেই প্রায় কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।

রানীগঞ্জ বাজার মোড়ে ব্যবসায়ী অনিল দে মিনিয়েচার কাজ সুন্দর ভাবে এখনও করে চলেছেন। অধ্যাপক সুরেশ সরকার একসময় মিনিয়েচার কাজ করতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন। স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায় প্যাস্টেলে খুব সুন্দর কাজ করতেন। এই শিল্পীদের প্রায় সকলেই ১৯৬৫ সালে বর্ধমানে 'প্রয়াসী শিল্পী গোষ্ঠী' নামে একটি শিল্পী গোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন। প্রতি বছর ১৫ই আগষ্ট এদের কাজের প্রদর্শনী হতো বর্ধমান উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারে। একসময় (৬৭ সাল) রামকিঙ্কর বেইজ এসেছিলেন এঁদের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে। একটা সার্বিক মিলনভূমি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কয়েক বছর চলার পর এই গোষ্ঠী উঠে যায়।

বর্ধমানের বাইরে কলানবগ্রামে মহীতোষ বিশ্বাস একসময় পটচিত্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বর্তমানে সমর দত্ত নামে এক তরুণ শিল্পী তেল রং এ কাজ করছেন বড়শূল অঞ্চলে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে কর্ম উপলক্ষে বর্ধমানে এসেছেন ক্ষিরোদবাবু এবং স্বপন রায়। তাঁরা বর্ধমানে শিল্পচর্চা করছেন বর্তমানে। আশির দশকে 'কনটেমপোরারী আর্টিস্ট' নামে একটি সংগঠন করে হরিহর দে প্রভৃতিরা প্রদর্শনী করছেন বছরে একবার।

এদের বাইরে বহুদিন থেকে কাজ করে চলেছেন হেনা দাশগুপ্তা। অশোক রায় বর্তমানে 'চালচিত্র' নামে একটি শিশু কিশোরদের ছবি আঁকার স্কুল চালাচ্ছেন। তাঁর কাজ দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

তরুণতম শিল্পীদের মধ্যে শ্রী শ্যামল বরণ সাহার নামে উল্লেখযোগ্য। শুভা প্রসন্নের 'আর্টস একরের' সঙ্গে যুক্ত এই তরুণ শিল্পী জল রঙের ইতিমধ্যেই কলকাতা ও সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছেন। কালনা রোডে 'চিত্রকলা' নামে একটি ছবি আঁকার স্কুল চালান এই শিল্পী।

এতো শুধু বর্ধমানের কথা বললাম। জেলার অন্যান্য মহকুমারেও অনেক শিল্পী কাজ করে চলেছেন সংগোপনে। বর্তমান লেখকের অজ্ঞতা ও সম্পূর্ণ তথ্য না থাকায় তাদের কথা লিখতে পারলাম না। সুতরাং পাঠকের কাছে এই অসম্পূর্ণতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে শেষ করার আগে শুধু এটুকু বলতে চাই সুযোগ সুবিধার অভাব স্থায়ী আর্ট গ্যালারী কিম্বা প্রদর্শনী করার স্থান, পৃষ্টপোষকতার অভাব সত্ত্বেও এই জেলার শিল্পীরা পিছিয়ে নেই। তাদের কিছু কাজ সর্বভারতীয় মানে পৌঁছানোর দাবি রাখে নিশ্চয়ই।

বর্ধমানের পত্রপত্রিকা ঃ অতীত থেকে বর্ত্তমান

কবিতা মুখোপাধ্যায়

আপাত অহল্যা ভূমি, সময়ে কর্ষিত হলে হয়ত উঠে আসত বহু মূল্যবান রত্ন। হতভাগ্য আমরা। হতভাগ্য আমাদের দেশ। তাই হারিয়ে যায় আমাদের বহু ইতিহাস। নতুবা কেন আজও অমীমাংসিত থেকে যায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা কোন টি ? - 'বাঙ্গাল গেজেটি', না 'সমাচার দর্পণ' ? কেন খুঁজে পাব না 'বাঙ্গাল গেজেটি '-র একটিও সংখ্যা ? কেন অনাদের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাবে বর্ধমান থেকে প্রকাশিত উনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকা গুলি ? কেন দীর্ঘ ৫০-৫২ বছর ধরে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ' বর্ধমান সঞ্জীবণী -' র একটি সংখ্যাও পাব না ? এত কেনর উত্তর দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়, আর প্রশ্ন করবই বা কার কাছে, কে তার উত্তর দেবে ?

প্রয়োজনের তাগিদেই বর্ধমানের সাময়িক পত্রের জগতটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে গিয়ে, যেতে হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশ হয়েছি। বর্ধমান জেলার যে একটা সাময়িক পত্রের জগত ছিল বা আছে, সাময়িক পত্র যে একটা সময়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট বাহক এ কথাটাও যেন আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। তাই অনুসন্ধানের উত্তরে অনেক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই শুনতে হয়েছে, 'এগুলিও যে কারও কাজে লাগবে তা তো কোন দিন ভাবিনি। তাই উই-এ কেটে ফেলেছে, নষ্ট করে ফেলেছি ....'। সুতরাং মুদ্রিত কিছু বিচ্ছিন্ন লেখা ছাড়া সবই অন্ধকারে।

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্ধমান একটু গৌরব বোধ করে। কেননা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যিনি ' বাঙ্গাল গেজেটি ' প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জন্মভিটা ছিল এই বর্ধমানে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ' বাংলা সাময়িক পত্র' (১ম খন্ড) বই-এ উল্লেখ করেছেন গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের নিবাস ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহড়া গ্রামে। কিন্তু পরবর্তী কালের অনুসন্ধানে জানা গেছে গঙ্গাকিশোর শ্রীরামপুরের বহড়া গ্রামের নয় বাসিন্দা ছিলেন কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার বহড়া গ্রামে। এই গ্রামটি ছিল ভাগীরথীর তীরে। পূর্বরেলের অগ্রদ্বীপ স্টেশান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। সরকারি নথি থেকে জানা যায় গঙ্গা কিশোর তাঁর ৪৫ নং চোরাবাগান স্ট্রীটে অবস্থিত ছাপাখানাটি স্থানান্তরিত করে তাঁর নিজের গ্রামে নিয়ে আসেন। এই কারণে এই জায়গাটি এখনও ছাপাডাঙ্গা বলে পরিচিত। অনেকেই দাবী করেন গঙ্গাকিশোর তাঁর নিজের গ্রাম থেকেও ' বাঙ্গাল গেজেটি ' প্রকাশ করতেন। ' বাঙ্গাল গেজেটি ' এক বৎসর কাল প্রকাশিত হয়েছিল এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে এটা সুস্পষ্ট পত্রিকাটি ঐ ৪৫নং চোরাবাগান স্ট্রীট থেকেই প্রকাশিত হত।

১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হবার মাত্র সাতাশ বছর, মতান্তরে একত্রিশ বছর পর বর্ধমান থেকে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। সেই হিসেবে ১৩৮ বা ১৪২ বছরের এক ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে বর্ধমানের সাময়িক পত্রের জগতে। যদিও এ জেলার সাময়িক পত্রের সূত্রপাত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে কোন পত্রিকাই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, একমাত্র ' বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী ' বিংশ শতাব্দীতেও প্রকাশিত হত এবং ' পল্লীবাসী ' আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যদিও ' বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী ' ১৯২৭ - ২৮

সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে একটি সংখ্যাও মেলে না। জানা যায় যে ' বৰ্দ্ধমান বানী ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে ' বর্ধমান সঞ্জীবনী ' -র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ' পল্লীবাসী ' অবশ্য একটি ব্যতিক্রম। বলা যায় এই পত্রিকাটি বর্ধমান জেলা তথা পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রেই একটা গৌরব সৃষ্টি করতে চলেছে। ১৮৯৬ -এ যার যাত্রা শুরু ১৯৯৬ সে পৌঁছে যাবে শতবর্ষে। নিয়মিত ভাবে একটি মহকুমা শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকার শতবর্ষ পূর্ণ করা নিশ্চয়ই গৌরবের, বর্ধমান বাসী হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব ' পল্লীবাসী ' তার শত বর্ষটি পূর্ণ করবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তাদের নাম পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র' (১ম খণ্ড)-এ। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই-এ উল্লেখিত দুটি পত্রিকার প্রকাশের সাল সম্পর্কে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায় বলাইদেব শৰ্ম্মা ও দাশরথি তা-র লেখায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ' বাংলা সাময়িক ' পত্র (১ম খন্ড) -এ ' বৰ্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িণী ' এবং ' বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয় -' এর প্রকাশ কাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন ১৮৪৯, ডিসেম্বর। কিন্তু বলাইদেব শৰ্ম্মা তাঁর ' বর্ধমানের ইতিহাস ' (পৃষ্ঠা ৮১) বই-এ এবং দাশরথি তা তাঁর ' সাংবাদিকতায় বর্ধমানের অবদান ' (লোকভারতী, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩) নিবন্ধে ' বৰ্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িণী ' এবং ' বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয় '-এর প্রকাশকাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন ১৮৫৫। যেহেতু এরা দুজনেই মৃত তাই সালটি কোন সূত্র থেকে তাঁরা পেয়েছিলেন সেটা জানা সম্ভব হয় নি।

বর্ধমান মহারাজাদের পৃষ্ঠাপোষকতায় ১৮৫০ - এ প্রকাশিত হয়েছিল ' সংবাদ বৰ্দ্ধমান '। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোন পত্রিকাই এক বৎসরাধিক কাল স্থায়ী হয় নি। প্রাসঙ্গিক ভাবেই আর একটি পত্রিকার উল্লেখ করছি যেটি সম্পর্কে অনেকেরই একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। পত্রিকাটি বর্ধমানের অম্বিকা কালনা থেকে প্রকাশিত হত বলে ধারণা করে থাকেন। পত্রিকাটির নাম ' অরুণোদয় '। সম্পাদক রেভাঃ লাল বিহারী দে। লাল বিহারী দে মিশনারি কাজের জন্য অম্বিকা কালনায় বসবাস করতেন এবং মিশনারি কাজের জন্য ' অরুণোদয় ' ব্যাপক ভাবে অম্বিকা কালনায় প্রচারিত ছিল। স্বভাবতই অনেকরই ধারণা ওখান থেকেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। কিন্তু অরুণোদয় '-এর যে দুটি বাঁধানো খণ্ড কলকাতার সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রয়েছে তা থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবেই বলা যায় পত্রিকাটি অম্বিকা কালনা থেকে প্রকাশিত হত না।

১৮৬৬ সালে ' বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি এক বছর প্রকাশিত হবার পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত ' শিক্ষা দর্পণ-' এর সঙ্গে মিশে যায়। বলাই দেব শৰ্ম্মা তাঁর ' বর্ধমানের ইতিহাস ' বই-এ পত্রিকাটির একটু ভিন্ন উল্লেখ করেছেন ' বৰ্দ্ধমান পত্রিকা ও বৰ্দ্ধমান ব্ৰহ্ম সমাজ '। এর চার বছর পর ১৮৭০-এ প্রকাশিত হয় ' প্রচারিকা '। ১৮৭৬ সালে বর্ধমান থেকে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, - ' ভারত - ভাতি ', ' দিবাকর', ' জ্ঞান দীপিকা '। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৭৭ - এ প্রকাশিত হয় দুটি পত্রিকা - ' আর্য প্রতিভা ' এবং ' কালনা প্রকাশ '। ' কালনা প্রকাশ ' পত্রিকাটিই সম্ভবত কালনা মহকুমার প্রথম পত্রিকা।

' বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ সালে। এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন যোগেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর এই পত্রিকাটি ১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত

প্রকাশিত হয়ে আর্থিক অভাবে বন্ধ হয়ে যায় । ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত শেষ পত্রিকাটি ' পল্লীবাসী ' । ১৮৯৬-এ প্রকাশিত ' পল্লীবাসী ' এখন শতবর্ষের পথে । শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ' পল্লীবাসী ' -র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন । বর্তমান সম্পাদক শ্রী অমূল্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

' পল্লীবাসী ' -র কয়েকটি সংখ্যা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত অন্য কোন পত্রিকার কোন সংখ্যায় পাওয়া না যাওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বর্ধমান কেমন ছিল বা পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হবার ক্ষেত্রে বিশেষ কি উদ্দেশ্য কাজ করত, বা সে সময়কার সংবাদ পরিবেশনের ধারা কেমন ছিল, সংবাদ সাহিত্য- এর স্বরূপই বা কেমন ছিল এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা হয় না ।

' কালিকাপুর গেজেট ' বিংশ শতাব্দীর প্রথম পত্রিকা । প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০-তে । এরপর প্রকাশিত হয় ১৯০৩-এ ' প্রসূন ' । কাটোয়া থেকে প্রকাশিত ' প্রসূন'ই কাটোয়া মহকুমার প্রথম পত্রিকা । ' প্রসূন ' পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল । দীর্ঘ বিরতির পর ১৯১৯-এ প্রকাশিত হয় ' নবারুণ ' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা । অবশ্য ১৯০৩ থেকে ১৯১৯ -র মধ্যে অন্য কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সেটা সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয় নি ।

স্বাধীনতা আন্দোলন কালে এ জেলা থেকে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল , যে গুলির বেশির ভাগই রাজরোষে বন্ধ হয়ে যায় । স্বাধীনতা আন্দোলন কালে প্রেস আইনের কঠোরতায় কোন পত্রিকাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত না । বিশেষত যে সমস্ত পত্রিকাগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করত । যেমন : 'বর্দ্ধমান' (১৯২২), ' শক্তি ' (১৯২৩), ' বর্দ্ধমান বাণী ' (১৯২৭) ' ডিমরুল ' (১৯২৭), ' তরুণ ' (১৯৩০), 'আসানসোল হিতৈষী' (১৯৩১) ' সাম্য ' (১৯৩২), 'শান্তিজল ' (১৯৩৪), ' সংবাদ ' (১৯৩৬), 'দামোদর' (১৯৩৬), 'বর্ধমানবার্তা' (১৯৩৮), 'ছাত্র' (১৯৩৯) ' শ্রী ' (১৯৪১) ' দৃষ্টি ' (১৯৪৪), ' আর্য্য পত্রিকা ' (১৯৪৬) । ' দামোদর ' পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় । স্বাধীনোত্তর কালে পুনরায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে । ' আসানসোল হিতৈষী- ' ও ১৯৩১ থেকে বিভিন্ন বাধা - বিপত্তির মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়ে চলেছে ।

স্বাধীনতা আন্দোলন কালে আরও অনেক পত্রিকাই এ জেলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল যাদের প্রকাশ সাল জানা যায় নি । ঠিক তেমনি ভাবেই হয়ত আরও অনেক পত্রিকাই প্রকাশিত হয়েছিল যাদের নামও হয়ত আমাদের অজানা থেকে গেছে । যেমন : ' আজান ', ' বিদ্রোহী ' ' অভিযাত্রী ', ' চাবুক ', ' অভিযান ', ' যুগশঙ্খ ' ইত্যাদি পত্রিকার প্রকাশ সাল সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয় নি ।

জাতীয় আন্দোলন চলাকালীন প্রকাশিত সাময়িক পত্রের অধিকাংশের ঝোঁক ছিল জাতীয়তাবাদী কর্মধারাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা এবং শক্তি যোগান । তবে ব্যতিক্রম যে দু- একটি ছিল না তা নয়, এবং তা সর্বক্ষেত্রেই থেকে যায় ।

স্বাধীনোত্তর কালে পত্র - পত্রিকার প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা জোয়ার লক্ষ্য করা যায় । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে বর্ধমান বোধহয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে । পত্রিকা প্রকাশের পিছনে কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন রুচি-চিন্তা ও মনন । সুস্থ সাহিত্য চেতনা গড়ে তোলা এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে, বিপরীত ভাবে শুধু রাজনৈতিক চিন্তা বা স্বার্থকে চরিতার্থ করা অথবা ব্যবসায়িক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য বা ব্যক্তিগত কিছু আক্রোশ নিয়েও অনেকে পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন । আবার দেখা যায় নিছক নিজের লেখা ছাপাবার উদ্দেশ্য নিয়েও অনেকে লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে

থাকেন । অবশ্য পত্র পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে চিন্তা -ভাবনার এই যে বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্য বোধ হয় সর্ব ক্ষেত্রে, সর্ব স্থানেই প্রযোজ্য ।

প্রকৃতিগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে এ জেলায় পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে ঝোঁকের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় । শিল্পাঞ্চলে যেমন সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ঝোঁক দেখা যায়, কৃষিঅঞ্চলে (বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া) দেখা যায় সংবাদ পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে । তবে লক্ষ্য করার বিষয় শিল্পাঞ্চল থেকে যে সাহিত্য পত্রিকা গুলি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে শিল্প কেন্দ্রিক যে জীবন ধারা তার প্রতিফলন সাহিত্যের মধ্যে খুব কমই হয়ে থাকে। তবে কয়েকটি পত্রিকা এর মধ্যে ব্যতিক্রম ।

বিপুল সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশের গৌরব বর্ধমান নিশ্চয়ই করতে পারে । এই সমস্ত পত্রিকার মধ্যে সংবাদ পত্র সহ বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রিক পত্রিকাও রয়েছে । এবং এই পত্রিকাগুলি রাজনীতি ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি - এক কথায় সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক গুলিই হয়ত এই পত্রিকা গুলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে স্থান পেয়ে থাকে । কিন্তু সামগ্রিক অর্থে সমাজ দর্পণ হয়ে উঠতে পারছে না । অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা পত্রিকা গুলির নিজস্ব উদ্দেশ্য বা আদর্শকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় একথা অস্বীকার না করেও বলা যায়, পত্রিকা গোষ্ঠির কিছুটা উদাসীনতাও কাজ করে এর পিছনে। নতুবা এতগুলি পত্রিকা যে জেলা থেকে প্রকাশিত হয় সেখানকার অর্থনৈতিক বনিয়াদটা কেমন ? এখানকার মানুষের জীবিকার মূল সূত্র কি ? শিক্ষার মান কেমন ? বা জেলায় ধর্মীয় ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য কি ? সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশ কেমন ? এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় না এ জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে। অবশ্য আশার কথা বর্তমানে এ জেলার বেশ কিছু পত্রিকাগোষ্ঠি আছেন যারা চেষ্টা করছেন প্রতিনিধিমূলক পত্রিকা সম্পাদনের, যার মাধ্যমে ধরা যাবে বর্ধমানের মূল সুর ।।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল, ধারাবাহিক ভাবে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার মোটামুটিভাবে একটা তালিকা দেওয়া হল। অবশ্য এই তালিকা বিশেষত এখনকার প্রকাশিত পত্রিকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নয়। শুধুমাত্র সরকারি নথিভুক্ত যে পত্রিকাগুলি রয়েছে সে গুলিরই তালিকার দেওয়া হল।

" ঊনবিংশ শতাব্দী "

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল
সংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িণী	বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪৯
বর্ধমান চন্দ্রোদয়	রামতারণ ভট্টাচার্য্য	১৮৪৯
সংবাদ বর্ধমান	কালিদাস বন্দোপাধ্যায়	১৮৫০
বর্ধমান মাসিক পত্রিকা	--	১৮৬৬
প্রচারিকা	প্যারীলাল সিংহ	১৮৭০
ভারত-ভাতি	রাজেন্দ্রলাল সিংহ	১৮৭৬
দিবাকর	--	১৮৭৬
জ্ঞান দীপিকা	রাখালদাস হাজরা	১৮৭৬
আর্য প্রতিভা	কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	১৮৭৭

কালনা প্রকাশ		১৮৭৬
বর্ধমান সঞ্জীবনী	যোগেশ চন্দ্র সরকার	১৮৭৮
পল্লীবাসী	শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯৬

বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা : ১৯৪৭ পর্যন্ত

পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল
কালিকাপুর গেজেট	কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয় কুমার জ্যোতিরত্ন	১৯০০
প্রসূন	মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯০৩
নবারুণ	চণ্ডীদাস মজুমদার	১৯১৯
বর্দ্ধমান	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী	১৯২২
শক্তি	বলাইদেব শর্মা	১৯২৩
* বর্দ্ধমান বাণী	মৌলভী নাজিরুদ্দিন আহমদ	১৯২৭
* আসানসোল হিতৈষী	গোপেন্দুভূষণ সাংখ্য তীর্থ	১৯৩১
দেশপ্রিয়	সুধাংশু মোহন ভট্টাচার্য	১৯৩৪
শান্তিজল	ভুজঙ্গভূষণ সেন	১৯৩৪
সংবাদ	ভুজঙ্গ ভূষণ সেন	১৯৩৬
দামোদর	দাশরথি তা	১৯৩৬
ছাত্র	অজিত কুমার রায়	১৯৩৯
শ্রী	বলাইদেব শর্ম্মা	১৯৪১
দৃষ্টি	কৃষ্ণ কিশোর রায়	১৯৪৪
আর্য্য পত্রিকা	বলাইদেব শর্ম্মা	১৯৪৬

স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন প্রকাশিত পত্রিকা গুলির মধ্যে 'বর্ধমান বাণী', আসানসোল 'হিতৈষী' এবং 'আর্য্য পত্রিকা' স্বাধীনোত্তর কালেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 'বর্ধমান বাণীর' বর্তমান সম্পাদক মবিনল হক, কিছুদিন হল পরলোক গমন করেছেন। 'আসানসোল হিতৈষী'-র বর্ধমান সম্পাদক মিনতি মিত্র এবং 'আর্য্য পত্রিকার' সম্পাদক প্রশান্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা

[বর্ধমান সদর]

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল
বর্ধমান	নারায়ণ চৌধুরী	১৯৪৮
বর্ধমানের ডাক	রাধা গোবিন্দ দত্ত	১৯৪৯
খোলা কথা	সদানন্দ দাস	১৯৬২
সাহিত্য সানাই	বিশ্বনাথ ঘোষ	১৯৬৬
উদয় অভিযান	সমীরণ চৌধুরী	১৯৬৭
চলমান	সচ্চিদানন্দ মণ্ডল	১৯৬৮

আলিকালি পত্রিকা	সুভাষ দেবরায়	১৯৬৮
বর্ধমান জ্যোতি	মদন দাস	১৯৭০
পূর্বক্ষণ	তারকনাথ রায়	১৯৭০
বিজয় তোরণ	সুধীর চন্দ্র দাঁ	১৯৭১
পল্লী বর্ধমান	সুকুমার সেন	১৯৭২
ভাবনা-চিন্তা	শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু	১৯৭৩
ধ্বনি	সুধীর অধিকারী	১৯৭৫
সময়ের ভীড়	শম্ভু কর্মকার	১৯৭৫
মুক্তি চাই	শ্যামাপদ চৌধুরী	১৯৭৫
বর্ধমান শ্রুতি	গোবিন্দ দাস	১৯৭৬
বর্ধমান রিপোর্টার	নীহারেন্দু আদিত্য	১৯৭৬
বর্ধমান ডায়েরী	সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	১৯৭৭
গণচিন্তা	নারায়ণ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	১৯৭৭
নতুন চিঠি	অশোক ব্যানার্জ্জী	১৯৭৭
দাঁইহাট বিচিত্রা	অজয় আইচ	১৯৭৭
খণ্ডঘোষ সমাচার	দেশবন্ধু হাজরা	১৯৭৭
অভিযান সাময়িকী	সমীরণ চৌধুরী	১৯৭৮
চাষ আবাদ	বিন্ধ্যনাথ ঘোষ	১৯৭৮
সংস্কৃতি সংবাদ	অলোক চ্যাটার্জ্জী	১৯৭৮
গ্রাম্য সমাচার	ভজন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৮
সুইট ইণ্ডিয়া	সমীর ঘোষ চৌধুরী	১৯৭৮
মেয়েদের বার্তা	তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৭৮
কৃষি সমবায় পত্রিকা	সদানন্দ দাস	১৯৭৯
কবুতর	পঞ্চানন দত্ত	১৯৭৯
ধন্যভূমি	তাপস সরকার	১৯৮০
দৈনিক মুক্তবাংলা	পুরুষোত্তম সামন্ত	১৯৮০
শুভ লিপিকা	প্রণয় কুমার ভট্টাচার্য্য	১৯৮১
পবিত্র বাণী	পল্লব কুমার রায়চৌধুরী	১৯৮১
মঙ্গল কোট বার্তা	দেবকুমার ভট্টাচার্য্য	১৯৮১
দেশমাতৃকা	সুধাংশু চৌধুরী	১৯৮২
ছোটদের কথা	কল্পনা সুর	১৯৮২
মহিলা মহল	অনীতা রায়চৌধুরী	১৯৮৪
স্বাস্থ্য ও মানুষ	বৃন্দাবন কুণ্ডু	১৯৮৫
আগামী আওয়াজ	শুভময় দে	১৯৮৫
বর্ধামন সমাচার [প্রথম অফসেট সাপ্তাহিক]	শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু ও সমীরণ চৌধুরী	১৯৮৭

[কালনা]

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল
সীমায়ন	গোবিন্দ চন্দ্র রায়	১৯৭৩
সঙ্গীত শিল্পীতীর্থ	কমল মুখোপাধ্যায়	১৯৭৫
চিন্তা	সমীর ঘোষ	১৯৭৬
দীপায়ণ	মন্মথ চন্দ্র সেন	১৯৭৯
জবা-ভবা	সদয় চাঁদ চৌধুরী	১৯৮০
হোত্রী	গোবিন্দ চন্দ্র রায়	১৯৮২

[কাটোয়া]

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল
সর্বোদয়	নন্দ দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৩
সাপ্তাহিক কাটোয়া	শশাঙ্ক শেখর চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৫
কাটোয়ার হিতৈষী	মদন চৌধুরী	১৯৭৭
কাটোয়ার কলম	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৭
কাটোয়া জোয়ার	নিমাই চন্দ্র প্রামাণিক	১৯৭৯
যুব জোয়ার	মোল্লা আবুল হায়াত	১৯৮০
তথ্য দর্পণ	শীলা ঘোষাল	১৯৮১
তোমাদের কথা	নিমাই চন্দ্র প্রামাণিক	১৯৮১
ধূলা মন্দির	লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮২

[আসানসোল]

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল
জি, টি, রোড	বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ	১৯৫৩
শ্রী লেখা	গীতাময় রায়	১৯৫৩
আসানসোল বাণী	সুধাকৃষ্ণ গুপ্ত	১৯৬২
কোলফিল্ড ট্রিবিউন	দামোদর গুপ্ত	১৯৬৩
পর্যবেক্ষক	সুশীল মালখণ্ডী	১৯৬৪
আসানসোল কথা (বাংলা + হিন্দী)	জগদীশ প্রসাদ কেডিয়া	১৯৭৬
আসানসোল অবজারভার	মির্জা ইউসুফ আহমেদ বেগ	১৯৭৭
কথা বলো	তুষার সরকার	১৯৭৭
দৈনিক লিপি	সত্যরঞ্জন কর্মকার	১৯৮১

[দুর্গাপুর]

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল
দুর্গাপুর বাণী	কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬৩
পানাগড় বার্তা	নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৩
কোলফিল্ড এক্সপ্রেস	সুবীর ঘটক	১৯৭৩
দুর্গাপুর সংবাদ	বিশ্বনাথ ঘোষ	১৯৭৬
বর্ধমান দুর্গাপুর হেরাল্ড	পি, কে, রায়	১৯৭৮
ইনডাসট্রি-লাইফ	গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা	১৯৭৮
দুঃসাহস	প্রসাদজী রঘুবীর	১৯৭৯
শিল্প পরিক্রমা	সমীর ঘোষ	১৯৮১
দুর্গাপুর পার্সপেক্টিভ	অশোক চ্যাটার্জী	১৯৮৩
দুর্গাপুর জন জীবন	ইরা ব্যানার্জী	১৯৮৪
দুর্গাপুর কথা ও কাহিনী	দেবব্রত ভট্টাচার্য	১৯৮৫

স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্ধমান

শ্যামাপ্রসাদ কুন্ডু

পূর্বকথা : ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তাচলে যায়। ভারতেতিহাসের এই 'ট্রাজিক' ঘটনার সঙ্গে বর্ধমানের কিঞ্চিৎ পরোক্ষ যোগাযোগ আছে। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে যে কাটোয়া শহরে বা কন্টকনগরে শ্রীচৈতন্যদেব কেশবভারতীর কাছে সন্যাস দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই কাটোয়া শহরকে রবার্ট ক্লাইভ ব্যবহার করেছিলেন সিরাজৌদ্দাল্লার বিরুদ্ধে সেনা ব্যূহ রচনার কাজে। কাটোয়া শহর থেকেই তিনি সৈন্য ও রসদ পারাপার করেছিলেন গঙ্গার ওপারে পলাশীতে। বলা যেতে পারে বিনা বাধায়। কেননা তখনও পর্যন্ত ইংরেজ বানিয়াদের অভিসন্ধি এদেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয় নি এবং জনসাধারণ 'রাজায় রাজায়' যুদ্ধ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। ততদিনে বর্ধমানে সঙ্গম রায়ের উত্তর পুরুষরা এক শতাব্দী ধরে জাঁকিয়ে বসেছেন - কিন্তু ইংরেজকে বাধা দেবার কথা ভাবেন নি। পলাশীর আম্রকুঞ্জে সেদিন যে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার প্রতীক্ষায় বর্ধমান সে বিষয়ে সচেতন ছিল না - বোধকরি অন্য কেউই তা অনুমান করতে পারেন নি।

পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে বর্ধমানের সম্পর্ক শুধু এইমাত্র নয় । এর তিন বছর পর ১৭৬০ সালে ইংরেজের হাতের পুতুল নামে মাত্র নবাব, মীর কাশিম বর্ধমান সহ তিনটি সমৃদ্ধ 'চাকলা' ইংরেজ কোম্পানীর হাতে তুলে দিলেন। অন্য দুটি হল চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। উপঢৌকন হিসাবে। এই ঐতিহাসিক হস্তান্তরের তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৭৬০ - ১৭ সফর ১১৭৪ হিজরা। যে চুক্তিবলে এই হস্তান্তর সম্পন্ন হয় তার দুটি প্রধান ধারা ছিল ঃ

4. The Europeans and Telingas of the English Army shall be ready to assist the Nabab Meer Mohamed Kassim Khan Bhadur in the management of all affairs and in affairs dependent of him, they shall extent themselves to the utmost of their abilities.

5. For all charges of the Cômpany and the said Army and provisions for the fields etc. of the land Burdwan, Midnapur and Chittagong shall be assigned and sannad for that purpose shall be written and granted. The company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries and will demand no more than the three assignments aforesaid.

ঐ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানের রাজনৈতিক ভাগ্য ইতিহাস-নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বানিয়া ইংরেজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল।

১৬৫৭ থেকে ১৭৫৭ বর্ধমান রাজবংশের পত্তন, বিবর্তন ও বিস্তৃতির ইতিহাস। ১৭৯৩ এর আগে রাজপরিবারের সঙ্গে ইংরেজের - বিশেষত ওয়ারেন হেস্টিংস এর বিরোধ হয়েছে খাজনা নিয়ে। কিন্তু ইংরেজ নিজ স্বার্থেই বর্ধমানের রাজপরিবারকে জমিদারী থেকে উচ্ছেদ করেনি। ১৭৯৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মাধ্যমে রাজপরিবারের স্থায়ী ও বংশানুক্রমিক করেছে। বর্ধমানের এই বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারের উত্তর পুরুষরা এর পর আর কখনও ইংরেজের সঙ্গে সরাসরি লড়াই-এ অবতীর্ণ হয় নি। ১৭৬০ এর পর থেকে ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় বর্ধমানের।

মীর কাশিমের সঙ্গে চুক্তি মত বর্ধমান চাকলা রাজপরিবারের হাতে থেকে গেল। কিন্তু কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান লোভ বর্ধমান তথা বাংলাদেশের ভূ-স্বামী জমিদারদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি বেশ কিছু কাল। সূর্যাস্ত আইন, পাঁচশালা বন্দোবস্ত, দশশালা বন্দোবস্ত এবং সর্বশেষে ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মাধ্যমে বেনিয়া ইংরেজ বাংলাদেশে এক বিপুল সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ভূ-স্বামীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে এবং স্থায়ী মিত্রতা গড়ে তোলে । কতকাংশে ইংল্যান্ডের ভূমি ব্যবস্থার অনুসরণে । কিন্তু ভারতবর্ষের জমির মালিকানা স্বত্ব অন্যরকম ছিল - ব্যক্তি মালিকানা প্রায় অনুপস্থিত ছিল । ধুরন্দর ইরেজ ভূমিব্যবস্থায় এই বৈশিষ্ট্যটি যোগ করে। ১৭৬০ থেকে ১৭৯৩ তার মধ্যে বহু জমি হাতবদল হয় অসংখ্য খাজনা আদায়কারী এবং স্বত্বাধিকারী জমিদার ভূস্বামীর সৃষ্টি হয় নীলাম বিক্রির মাধ্যমে। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৯ এর মধ্যে পত্তনি প্রথার সৃষ্টি ও স্বীকৃতির মাধ্যমে আরও বিপুল সংখ্যক মধ্যস্বত্বাধিকারীর সৃষ্টি হয়েছে - বিশেষতঃ বর্ধমান জেলায়। এই মধ্যবর্তী থাকে - কোম্পানী ও জমিদারের পরবর্তী স্তরে - এক বিপুল সংখ্যক ধনী ও উদ্যোগী মানুষ জমিতে আবদ্ধ হয়ে যান বিষয়ে আসযে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বর্ধমানে এদের কথা একটু বিস্তারে বলতে হবে - কেননা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে তার তাৎপর্য আছে।

বর্ধমান জেলায় ভূমি ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্ব কাঠাম কি রকম সুবিন্যস্ত হয়েছিল এবার আমরা তা দেখব। বর্ধমান মহারাজার জমিদারীর পরিমাপ ছিল ২,৫৯৯,৩৭৩ একর। এই বিশাল জমিদারী বিভক্ত ছিল ৩১১৭ টি জোত বা লটে (Lot)। এর মধ্যে ১৫১৯টি জোত বা লট পত্তনিদারদের হাতে বন্দোবস্ত দেওযা হয়। ৫৭টি জোত শর্তাধীনে 'লীজ' দেওয়া হয় এবং ৩৮ টি জোতকে সামযিক লীজ দেওয়া হয়। মাত্র ৫০৩ টি জোত ছিল সরাসরি মহারাজার অধীনে। দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই এই জেলার জমিতে এক বিপুল সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ঢুকে পড়েছেন। এই পত্তনিদাররা আবার নিজ নিজ এস্টেটকে দরপত্তনিদার, সে পত্তনিদার, দরদরপত্তনিদার, সে-দর পত্তনিদার — এই রকম নিম্নমুখী আরও কয়েকটি থাকে ভাগ করেন খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য। এইভাবে বর্ধমান জেলায় অসংখ্য বৃহৎ ও মাঝারি ভূম্যধিকারী পরিবারের জন্ম। স্থানীয় মানুষ এঁদেরকেও 'জমিদার' বলে মান্য করতেন। এইভাবে বর্ধমান জেলার ভূমি ব্যবস্থায় এক বিশাল কায়েমী স্বার্থ কাঠাম গড়ে ওঠে যা অন্য জেলায় হয়নি। জমি কেন্দ্রিক অর্থনীতি যে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে অনিবার্যভাবে তার মধ্যে এক ধরণের স্থিতিজাড্য তৈরী হয় - গতিশীলতা তেমনভাবে স্ফূর্তি পায়না। ঐতিহ্য এবং স্থিতাবস্থা মেনে নেওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় - এই জমিতে স্বাধীনতার আকাঙ্খার বীজ বপন সহজে হয় না।

ঐতিহ্য সংস্কার লালিত, টোল পাঠশালা মক্তবের শিক্ষার পরিবেশে-মেলা পার্ব্বণ-গাজনের-মাদকতার পরিমণ্ডলে বাইরের আলো হাওয়া প্রবেশাধিকার পায় না। বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকানেক স্মরণীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কৃতিত্ব ও আত্মবলিদানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বেগবান হয়েছে, মহিমান্বিত হয়েছে । কিন্তু তাঁরা কর্মক্ষেত্র রূপে বর্ধমান জেলাকে নির্বাচন করেন নি - কারণ ক্ষেত্রপ্রস্তুত ছিল না।

১৭৯৩ এর পর থেকে বর্ধমান জেলায় যে অসংখ্য ভূস্বামীর সৃষ্টি হল - তাদের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল - ইংরেজদের সরাসরি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই। এ জেলার অর্থকরী ফসলের যেমন নীলের চাষ

তেমন হত না। ফলে কুঠিয়াল আসে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে বর্ধমান তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছে বর্ধমান আর প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র নয়। নদনদীর গতিপথের বদলের সঙ্গে এর একটা যোগ আছে। পরে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি রাণীগঞ্জে কয়লা উত্তোলন শুরু হওয়ায় কলকাতা রাণীগঞ্জ রেলপথ বিছানো হয় - ইংরেজ সরাসরি শিল্পাঞ্চলে ঢুকে পড়ে। জেলার প্রাচীন অধিবাসী জনগোষ্ঠী বাউডি এবং বাগদীদের অনেকে খনিতে নিযুক্ত হয়, সদগোপ, উগ্রক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষ জমিতে মনোযোগী হয়। বর্ধমান তখন আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নয়। ১৮৬০ এর দশকের মারাত্মক 'বর্ধমান জ্বর' জেলার এক তৃতীয়াংশ মানুষের প্রাণ নিয়েছে এবং বাদবাকিদের আতংকিত করে রেখেছে। জেলার জলবায়ুও চরম ভাবাপন্ন, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও অপ্রতুল - ইংরেজরা এসব কারণে এই জেলায় এসে বসবাস স্থাপন করতে আগ্রহ বোধ করেনি। কিছু অপ্রতিরোধ্য মিশনারী ধর্মযাজক, সরকারী কর্মচারী ছাড়া জেলায় ইংরেজ আসে নি। ফলে ইংরেজের সঙ্গে জেলাবাসীর সরাসরি সম্পর্ক ও সংঘাতের পটভূমি তৈরী হয়নি। দ্বিতীয়তঃ জেলার প্রধান জমিদার বা রাজা সরাসরি প্রজাদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন পত্তনিপ্রথার মাধ্যমে। রাজা মন দিয়েছেন বিলাস ব্যসনে এবং কিছু জনহিতকর কাজে যেমন পুকুর কাটান, রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কার স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে। ফলে বর্ধমান রাজাদের মান বেড়েছে, জনদরদী একটা ভাবমূর্ত্তি বা ইমেজ তৈরী হয়েছে। রাজপরিবার নিজেদের নিকট আত্মীয়স্বজনকে জমিতে বসিয়ে দেন নি - ফলে একটা সম্ভ্রমের দূরত্বে থাকতে পেরেছেন। আর একটা কথা। জনসাধারণের ধর্মাচরণে এই পরিবার কোন হস্তক্ষেপ করেননি বরং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, স্তুপ, মঠ নির্ম্মাণে উৎসাহ ও অর্থ যুগিয়েছেন। এভাবে একটা 'সেকুলার' ভাবমূর্ত্তিও তৈরী হয়েছে বেশ।

এসব ছাড়াও জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাজপরিবার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা - সবক্ষেত্রেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বর্ধমানের অবনতির ফলে কৃষিই হয়ে দাঁড়ায় জনসাধারণের মুখ্য জীবিকাক্ষেত্র। পত্তনি প্রথার মাধ্যমে যে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জন্ম হয় - সেই শ্রেণী মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা সচলতা বর্ত্তমান ছিল। ওঠানামা ছিল। এরা নিজেদের স্বার্থেই সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ-বেদনাকে প্রশমন করেছেন - ছড়িয়ে যেতে দেন নি। ফলে কেন্দ্রমুখী কোন বিক্ষোভও সংগঠিত হয় নি।

বর্ধমান অত্যন্ত প্রাচীন জনপদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এ জেলায় জনগোষ্ঠীর বিন্যাসে বাউড়ি, বাগদী, তিলি, সদ্‌গোপ ও উগ্রক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য ছিল। সমস্ত জেলা জুড়ে অসংখ্য মেলা পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হতো যার মধ্য দিয়ে এক সুপ্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির ধারা বহমান ছিল। কৃষি কেন্দ্রিক জীবনে এ সবের ভূমিকা অপরিসীম। এক ধরণের ঘুম পাড়ানিয়া মনোভাবে আচ্ছন্ন রাখার পক্ষে আয়োজন ছিল বিপুল। স্বাধীনতার আকাঙ্খার বীজ রোপিত হবে যে জমিতে সেই জমিই বর্ধমানে তৈরী হয়নি। ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অপ্রত্যক্ষ, প্রতিযোগিতা ছিল না কোথাও। আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস শুরু হয়েছে যেমন দেরীতে তেমনি প্রসারিত হয়েছে শম্বুক গতিতে। সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এ জেলায় মাত্র ১৩টি স্কুলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যেখানে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হোত। ১৮৮১ তে প্রথম একটি কলেজ স্থাপিত হল রাজানুগ্রহে। মহামতি বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেছিলেন ১৮৫৮-র মধ্যে ১০টি মেয়েদের স্কুল এবং অনেক মাধ্যমিক স্কুলের

অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন তিনি। কিন্তু এসব প্রয়াস ফসপ্রসু হতে সময় লেগেছিল। বর্ধমানের তৎকালীন সমাজ কতখানি প্রাচীন ঐতিহ্য-বৃত্তমুখী ছিল এই ঘটনা থেকে তাঁর আভাস পাওয়া যাবে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ রামতনু লাহিড়ি এসেছিলেন বর্ধমানের একটি ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে (১৮৪৫)। তিনি স্ব-ইচ্ছায় উপবীত ত্যাগ করেছিলেন সেই কারণে তাঁর জীবন অতিষ্ট করে তোলা হয় তীক্ষ্ম বিদ্রূপ এবং কঠোর সমালোচনায়। তিনি পালিয়ে বাঁচেন। মেয়েদের স্কুলে উচ্চবর্ণের মেয়েরা যেতেন না 'জাত' যাবার ভয়ে। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলগুলি উঠে যায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় তা গড়ে ওঠে নি। বঙ্গীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রভাবও অনুভূত হয়নি এ জেলায়। উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই সংস্কৃত ও ফারসীর চর্চা চলছে। বর্ধমান টোল, পাঠশালা মাদ্রাসা মক্তবের ঘেরাটোপে আবদ্ধ। নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ আসেনি এ জেলায়, ব্রাহ্ম ধর্মেরও প্রসার হয়নি তেমনভাবে - যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করে গেছেন (১৮৫৫ নাগাদ)। এই মধবিত্ত শিক্ষিত সমাজই আমাদের দেশে বরাবর নতুন ভাবনাচিন্তায় ও ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাদের মধ্যেই প্রথম জেগেছে। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে রাজনীতি, জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতার চিন্তা, স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রবল হয়েছে। বর্ধমানে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রায় অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

সূচনাপর্ব

দুই ঃ এই অনুর্বর জমিতে কিভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্খার বীজ রোপিত হল এবং ক্রমে তা সমগ্রদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেগবতী হল এবার সেই কাহিনীর অবতারণা করতে হবে । তার আগে সূচনাপর্বের কথা বলে নেওয়া যাক ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে । ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের 'অধিবেশন হয় বর্ধমান শহরে । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর । অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার । ১৯০৪ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্সের আর একটি অধিবেশন হয় বর্ধমানে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ।

এ প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য আমাদের জানা দরকার । বর্ধমানে একটি পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৬৫ সালে । এরপর ১৮৬৯ সালে রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কালনা, কাটোয়া এবং দাঁইহাট পৌরসভা গঠিত হয় । প্রথমদিকে শুধুমাত্র ইংরেজদের হাতেই ছিল এই পৌরসভাগুলির পরিচালনভার । পরে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও পৌরসভার নির্বাচিত হন । নলিনাক্ষ বসু বর্ধমান পৌরসভার কমিশনার এবং পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন । মূলতঃ সম্পন্ন জমিদার এবং আইনজীবীরাই এইসব প্রতিষ্ঠানে আসতেন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য । পরে এদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন । সেই অর্থে পৌরসভাগুলি বর্ধমানের রাজনীতিতে অনুঘটকের কাজ করে ।

যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের কথা আগে বলা হয়েছে সেটি ছাড়া ১৮৭৬ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' এর তিনটি শাখা বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হয়। (ক) বর্ধমান ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (খ) কালনা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং (গ) পূর্বস্থলী হিতকারী সভা। এখানে

আমাদের একটু অন্যকথা বলে নিতে হবে। আমরা দেখব যে বর্ধমান জেলার কালনা থেকে কাটোয়া - এই বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে ব্যপকতা পেয়েছিল জেলার অন্য অঞ্চলে সে ব্যাপকতা পায় নি। বস্তুতঃ গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে স্বাধীনতা আকাঙ্খার যে ব্যাপ্তি - দামোদর অববাহিকা অঞ্চলে সে ব্যাপ্তি ঘটে নি। এর কারণ কি ? ভূগোলের সঙ্গে কি এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে ? দামোদর তীরভূমি জুড়ে আজ যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যাচ্ছে (ভরতপুর, বীরভান পুর) তা এক প্রাচীন আর্যেতর সভ্যতার স্মৃতিবাহী । গঙ্গাতীরবর্ত্তী কালনা, কাটোয়া নাদনঘাট পূর্বস্থলী অঞ্চল তুলনায় অর্বাচীন সভ্যতার ভূমি। আরও একটা কথা। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়েছিলেন গঙ্গার তীরবর্ত্তী কাটোয়া শহরে - পরবর্ত্তী কালে কাটোয়া থেকে কালনা মাঝখানে মন্তেশ্বর এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মমতের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। এর ফলে ঐতিহ্য সংস্কারলালিত প্রাচীন সমাজ সংস্কৃতির কাঠামোয় একটা বড় ঝাঁকুনি লাগে ভেঙ্গে যায় অনেক সংস্কারের বাঁধ - সমাজ জীবনে প্রবেশ করে পরিবর্ত্তনের হাওয়া। অতীত গৌরবের প্রাচীন খোলস থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ খুলে যায়। তা ছাড়া এই অঞ্চল জুড়ে গঙ্গানদী পেড়িয়ে বহিরাগত মানুষেরা দলে দলে এসে বন কেটে বসত গড়েছেন। ফলে শুধুমাত্র যে সমাজ বিন্যাসের অন্তরঙ্গ চেহারাটা বদলে গেল তাই নয় - নতুন মানুষের সঙ্গে নতুন যুগের ভাবভাবনাও এসে গেল। দামোদব তীরবর্ত্তী বর্ধমানে সে ঢেউ এসেছে অনেক দেরীতে। কালনা এবং কাটোয়া শিক্ষা কেন্দ্র রূপেও প্রসিদ্ধ ছিল। ওপারে নবদ্বীপ। কেরী সাহেব পৌঁছে গেছেন কাটোয়ায়। বিদ্যাসাগর ছুটে এসেছেন কালনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে। কালনা-কাটোয়ার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ শিক্ষা এবং বাণিজ্য উভয় কারণেই অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। তাই স্বাভাবিকভাবেই কালনা এবং কাটোয়া মহকুমা স্বাধীনতার আকাঙ্খায় অনেক বেশী উদ্বেল হয়েছে বর্ধমানের স্বাধীনতা আন্দোলনে এতদঅঞ্চলের ভূমিকা পরবর্ত্তী দিনেও প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।

তিন : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : জোয়ার এলো

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান শহর লর্ড কার্জ্জনকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদের নেতৃত্বে। কিন্তু ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে উদ্বেলিত হয়েছে কালনা। কালনার মহিষিমর্দিনী তলায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হিয়। উদ্যোক্তা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ হাজরা, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন। এই সভায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বক্তৃতা করেন। বর্ধমানের জননেতা আবুল কাশেমও বক্তৃতা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কালনার কাছে বাঘনাপাড়ায় বিদেশী কাপড় লুন্ঠন করে পোড়ানো হয়। পাঁচজন সাহসী তরুণ এই কাজে নেতৃত্ব দেন। এরা হলেন গৌরগোবিন্দ গোস্বামী, ননীগোপাল মুখার্জী, সন্তোষকুমার ব্যানার্জী, বৃন্দাবন মুখার্জী এবং বলাইচাঁদ গাঙ্গুলী। এঁদের বয়স ছিল চোদ্দ থেকে ষোল বৎসরের মধ্যে। বর্ধমানের তো বটেই সম্ভবতঃ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সংগঠিত রাজনৈতিক অপরাধ। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার যে কিভাবে এই অঞ্চলের কিশোর যুবক এবং এমনকি বয়স্কদেরও আবেগতাড়িত করেছিল তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কালনা অঞ্চলেই প্রথম স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খোলেন শ্যামলাল গোস্বামী। কালনার পাথুরিয়া ঘাটায় স্বদেশী ভাণ্ডার খোলা হয় - প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দেশী ভাণ্ডার পরে বিপ্লবীদের গোপন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কালনারই ভগবানপুর নিবাসী মোক্তার উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী ও উকিল পূর্ণচন্দ্র দত্ত সেই সময় তাঁত প্রতিষ্ঠা করেন স্বদেশী কাপড় তৈরীর জন্য। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আশী বৎসর বয়সী একজন আবেগী স্বদেশ প্রেমিক - নাম কৃষ্ণধন রায়। ইনি সিয়ারসোল রাজস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী শুধু স্বদেশী ছিলেন না - উত্তর রাঢ় অঞ্চলের বিপ্লববাদের অন্যতম প্রচারকও ছিলেন। অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ঐতিহাসিক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় - কালনা অঞ্চলের এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষকতা করতেন। পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, রমাপতি রায় ও বলাইচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায়। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আমরা খোঁজ করছিলাম উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল কালনা অঞ্চলে। আগেই বলা হয়েছে যে কলকাতার সঙ্গে কালনার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনে কালনা মহকুমাই সর্বাগ্রে অংশগ্রহণ করে।

ভারতে বিপ্লববাদের প্রধান পুরোহিত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানের চান্না গ্রামের সন্তান। প্রথম যৌবনে যতীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের অর্থাৎ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়র রাজ্যের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। উদ্দেশ্য যুদ্ধবিদ্যা রপ্ত করে বোমা তৈরী শিখে নিয়ে বিপ্লববাদী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করা। পরে যতীন্দ্রনাথ সোহং স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে স্বামী নিরালম্ব রূপে পরিচিত হন। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট রূপ নেবার আগেই বর্ধমান কোন কোন ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যতীন্দ্রনাথের কর্মভূমি বর্ধমান ছিল না। বর্ধমান জেলায় স্বদেশী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। কালনা, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী অঞ্চলে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতিগুলি হলো বান্ধব সমিতি, মহামায়া সমিতি, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর গোষ্ঠী প্রভৃতি। স্বামী বিদ্যানন্দ, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কার্তিক দত্তের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' কেন্দ্র খোলা হয়। বেশ কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতির ঘটনা জানা যাচ্ছে, এর মধ্যে 'বিঘাদি' ডাকাতি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রকাশ্য ধারা সেই পথেই আন্দোলনে জোয়ার আসে। বর্ধমানে চারটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কালনা, উপলতি, বর্ধমান সদর এবং বৈকুণ্ঠপুরে। কালনার পর কাটোয়ার নাম স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কাটোয়ার জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এই অঞ্চলে স্বদেশী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জোয়ার এনেছিলেন। জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ধমান জেলার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জননেতা। দক্ষ সংগঠক এবং অসাধারণ বাগ্মী হিসাবে তার সুনাম সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে কালনা, কাটোয়া এবং আসানসোল মহকুমায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের কথায় আবার আমাদের আসতে হবে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রেল ধর্মঘটে বর্ধমানের রেলকর্ম্মীরা যোগ দেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বর্ধমানে 'যুগান্তর' দলের কাজ কর্ম বেড়ে যায়। অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বর্তমানে সিপিএম দলের রাজ্যস্তরের দুই প্রধান নেতা সরোজ মুখার্জী

এবং বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর জন্ম ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। এঁরা পরে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল বর্ধমানে। অশীতিপর প্রবীণ বিপ্লবী ফকিরচন্দ্র রায়ও তখন সদ্যকৈশোরে পা রেখেছেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সিয়ারসোলে একটি বিপ্লবী গুপ্তসমিতি গঠন করেন। নিবারণ ঘটক এবং তাঁর পিসিমা দুকড়িবালা দেবী এই সমিতির দায়িত্ব নেন। বর্ধমানে বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে যুগান্তরের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সংস্পর্শে আসেন বলাই দেবশর্ম্মা (গাঙ্গুলী), যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং জিতেন্দ্রনাথ মিত্র। পাঁজা মশাই পরে পুরোপুরিভাবে গান্ধীবাদী আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্রও তাই। বলাই দেবশর্ম্মা পরে শ্রীকুমার মিত্রের সঙ্গে হিন্দুমহাসভায় সঙ্গে যুক্ত হন। অনুশীলন সমিতির দুজন নেতা ছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন এবং মানকরের জমিদার রাধাকান্ত দীক্ষিত। শ্রদ্ধেয় ফকিরচন্দ্র রায় রাধাকান্ত দীক্ষিতের অবদানের কথা সবিস্তারে তার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থে বলেছেন। রাধাকান্তবাবু বাংলাদেশের প্রথম জমিদার যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জেল খাটেন।

চার : সারা জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল

১৯০৫ থেকে ১৯২০ এই পনেরো ষোল বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কালনা এবং কাটোয়া মহকুমায় যে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার উঠেছে তা ধীরে ধীরে সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে । মূলতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উকিল, ডাক্তার এবং কিছু কিছু জমিদার বংশীয় লোক এই আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লববাদের চর্চাও চলছে। অনেকেই এই দুই ধরনের আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বর্ধমানে কংগ্রেস সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠে ১৯২০ সাল নাগাদ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বর্ধমান থেকে দুজন মাত্র প্রতিনিধি যোগ দেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং অমরনাথ দত্ত। গান্ধীজি তখন কিছুদিন হল ভারতবর্ষে ফিরে এসে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন সাহেব প্রথম সভাপতি হন। ইনি বর্ধমানের লোক নন কিন্তু এঁর কর্মক্ষেত্র এবং রাজনীতিক্ষেত্র ছিল বর্ধমান জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সালে। হিন্দুমহাসভা ১৯০৬ সালে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও বর্ধমানে লীগের কোন অস্তিত্ব ছিল না। জেলার প্রধান মুসলমান নেতাগণ স্বদেশী আন্দোলনে এবং কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আবুল কাশেমের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ইনি পরে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন। ইয়াসিন সাহেব জেলা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। এছাড়া আবুল হায়াত, আব্দুল কাদের এবং কচি মিয়া, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ নেতারা স্বদেশী ও কংগ্রেসী আন্দোলনেই আত্মনিয়োগ করেন। কচি মিঞা পরে রাণীগঞ্জে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আব্দুস সাত্তার পরে জেলা কংগ্রেস নেতা হন। সুবক্তা, দক্ষ সংগঠক এই অসাধারণ মানুষটি পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হন এবং জেলায় বহু জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কাশেম সাহেব (যাঁর নামে কাশেম নগর নাম হয়েছে) এবং ইয়াসিন সাহেবের অবদান জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং কংগ্রেস সংগঠনে অতুলনীয়। আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁদের অবদান

স্মরণ করা হয়। বর্ধমানে এঁদেরই জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঠাঁই পায়নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বলাইদেব শর্ম্মা এবং শ্রীকুমার মিত্র হিন্দুমহাসভায় যোগ দেন। কিন্তু জেলায় এই সংগঠনের কোন প্রভাব ছিল না। বর্ধমান জেলায় আজও যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হয়নি তার যাবতীয় কৃতিত্ব তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। বর্ধমানবাসী এই সব নেতাদের প্রতি একারণেই শুধুমাত্র কৃতজ্ঞ বোধ করবে চিরদিন।

পূর্ণ জোয়ার :

জালিওয়ালানাবাগের জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয় ১৯১৯ সালে। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বর্ধমান থেকে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং অমরনাথ দত্ত যোগদান করেন। ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ধমান জেলায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম সভাপতি মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন। এরপর থেকে জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে। অবশ্য পাশাপাশি একটা সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টাও বর্ধমানে অব্যাহত থেকেছে - যদিও তার কোন ব্যাপক প্রভাব পড়ে নি। বর্ধমানের পর কাটোয়া এবং কালনাতেও কংগ্রেস কমিটি গড়ে তোলা হয়। গান্ধীজী প্রদর্শিত ও প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন কালনা এবং কাটোয়া মহকুমায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনেও এই দুই মহকুমার মানুষ ব্যাপক সাড়া দিয়েছিলেন সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। খুব স্বাভাবিকভাবেই অসহযোগ আন্দোলন এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কালনার আন্দোলনের নেতা ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, কাটোয়ায় ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তিলক স্বরাজ ফাণ্ডে টাকা তুলতে বর্ধমানে আসেন ১৯২১-২২ সালে। কংগ্রেসে তখন 'প্রোচেঞ্জার' এবং 'নো চেঞ্জার' গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই চলছে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেন এ জেলার মহম্দ ইয়াসিন, আবুল কাসেম, অনিলবরণ রায়ের মত প্রখ্যাত নেতারা। অন্যদিকে গান্ধীজির আদর্শে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন যাদবেন্দ্র পাঁজা এবং অন্যান্যরা।

মহাত্মা গান্ধীর বর্ধমান আগমন এই পর্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি বর্ধমান টাউন হলে জনসভায় ভাষণ দেন ১৯২৫ সালের ৮ই মে। তখন জেলায় যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা হলেন যাদবেন্দ্র পাঁজা, কাটোয়ার অন্নদাপ্রসাদ সাহা ও ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরেরাম মণ্ডল, কালনার গোপেন কুণ্ডু, রাণীগঞ্জের ভীমাচরণ রায়, বরাকরের কালুরাম মারোয়ারী এবং বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম প্রমুখ। কাজী নজরুল বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। লক্ষণীয় এই যে প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার তখন স্তিমিত হয়ে পড়েছে - তৎসত্ত্বেও গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসীরা সভা করছেন। কলকাতা থেকে শরৎ বসু প্রমুখ আসছেন জেলায় কংগ্রেসীদের সংগঠিত করতে । ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে বর্ধমানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসী আন্দোলনে আরো বেশী সংখ্যায় মানুষ অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এই দশকে বর্ধমান জেলায় কংগ্রেসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের যুগ বলা যেতে পারে। বর্ধমানের ঘুমিয়ে থাকা জনজীবনে কংগ্রেস রাজনৈতিক গতি ও উদ্দেশ্য প্রদান করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার শতাব্দী সঞ্চিত আলস্য কাটিয়ে প্রবলবেগে স্বাধীনতার মহাসংগ্রামে প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বর্ধমান শহরেও 'পূর্ণস্বরাজ' দাবী দিবস উদযাপিত হয়। এই সময় হুগলী জেলা থেকে বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বর্ধমান কংগ্রেসের হাল ধরতে এসেছেন। যাদবেন্দ্র পাঁজা, আবুল হায়াত, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিজয় ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে 'পূর্ণস্বরাজ' দিবস উদযাপিত হয়। সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সরোজ মুখার্জী, দাশরথি তা, আব্দুস সাত্তার, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শ্রীকুমার মিত্র, বলাইদেব শর্মা, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী প্রমুখ। ছাত্র ও যুবকরা দলে দলে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। ছাত্রযুবদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রকৃতিভূষণ গুপ্ত, ভীমাচরণ রায়, ফকির চন্দ্র রায়, প্রণবেশ্বর সরকার, শ্যামাচরণ চ্যাটার্জী, মধুসূদন বিশ্বাস প্রমুখ। এই ছাত্র যুবদের অনেকেই পরে মার্ক্সবাদী মতবাদে আকৃষ্ট হন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ জেলায় অনেকবার এসেছেন মার্ক্সবাদ প্রচার করার জন্য। বঙ্কিম মুখার্জীও এসেছেন। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ মুখার্জী, শাহেদুল্লাহ, হেলারাম চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা পরে মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন।

যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে লবণ সত্যাগ্রহে বর্ধমান থেকে তড়িৎ কুমার দে, চণ্ডীচরণ মিত্র, দাশু রায়, ডাঃ অরিণ গুপ্ত, নিরঞ্জন হাজরাচৌধুরী, ভক্তভূষণ সোম এবং সরোজ মুখার্জী যোগ দিতে যান। পরে বর্ধমান শহরে বে-আইনীভাবে তৈরী লবণ বিক্রী করেন বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী এবং সরোজ মুখার্জী। অল্পবয়স্ক হওয়ায় পুলিশ এঁদের গ্রেপ্তার করেনি। এই সময়ে ফকির চন্দ্র রায়, সরোজ মুখার্জী, কালুরাম আগরওয়ালা, আমোদবিহারী বসু প্রমুখ যুবকের নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন স্থানে পথসভা এবং হরতাল, বক্তৃতা ও পিকেটিং শুরু হয়। কালনায় আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে।

দিকবদলের শুরু

ব্যাপকতা এবং সার্থকতার দিক থেকে আইন অমান্য আন্দোলন বর্ধমানের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। এক ঝাঁক তরুণ নিবেদিতপ্রাণ যুবক এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে খণ্ডঘোষের কিশোরীমোহন রায় এবং অম্বুজাভূষণ বোস, রায়নার দাশরথি তা, জামালপুরের মুক্তাকর মণ্ডল, মেমারীর প্রমথনাথ বিষয়ী, মহাপ্রসাদ কোনার ও দুর্গাদাস নন্দী, হাট গোবিন্দপুরের হেলারাম চ্যাটার্জী, গুসকরার মুক্তিপদ চ্যাটার্জী, গলসীর অতুলচন্দ্র সামন্ত, মেমারীর হরেকৃষ্ণ কোঙার, ভাতারের সস্ত্রীক ভোলানাথ চৌধুরী এবং ষষ্ঠীদাস চৌধুরী এবং সদরের বিনয় চৌধুরী ও সরোজ মুখার্জী অন্যতম। বর্ষীয়ানদের মধ্যে বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র এবং আবুল হায়াত এ আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। এঁদের শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসেন উপরোক্ত যুবকেরা। পরবর্তী জীবনে সরোজ মুখার্জী, বিনয় চৌধুরী, দাশরথি তা, গুলাম রহমান, জগন্নাথ সেন, আব্দুল রসুল, মোল্লা জাহেদ আলি প্রমুখেরা সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হন। কালনা মহকুমায় আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যায় কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যোগ দেন। এমনকি জমিদার শ্রেণীর অনেকেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এই সময় জেলার মহিলারাও ব্যাপক সংখ্যায় যোগ দেন। রেণু দিদি, সুরমা মুখার্জী, নির্ম্মলা স্যান্যাল প্রমুখ মহিলা নেত্রী এই আন্দোলন থেকে উঠে আসেন। ব্রিটিশ পুলিশ কঠোর হস্তে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করে, বহু অত্যাচার নিপীড়ন হয় এবং বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী গেপ্তার হয়ে কারাবাস করেন।

১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। এই নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয় এবং বর্ধমানেও চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের অহিংস গান্ধীবাদী আন্দোলনে অনেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলেন। যুবকদের মধ্যে অস্থিররতা বাড়তে থাকে । পুরনো গান্ধীবাদী নেতারা যুবকদের আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। যুবকদের মধ্যে পরিস্কার দুটো ঝোঁক দেখা যায়। একদল গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন অন্যদল মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হন। ততদিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে মার্ক্সবাদী দল ও গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সরোজ মুখার্জী, হেলোরাম চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার ব্যানার্জী কম্যুনিষ্ট পার্টীতে যোগ দেন। ফকিরচন্দ্র রায়, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী এবং হরেকৃষ্ণ কোঙাররা তখনও গোপন বিপ্লবী আন্দোলনে আস্থাশীল। অবশ্য এদের অনেকেই প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কও বজায় রেখে চলতেন।

বর্ধমানে বিপ্লবীদের অন্যতম আড্ডা ছিল শক্তি পত্রিকা দপ্তর। দুর্লভকিশোর মিত্র ছিলেন এর উদ্যোক্তা। অম্বিকা নাগ, বিনয় বসু, দেবকীকুমার বসু, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, গুলাম রহমান এবং কচি মিয়া এই গ্রুপে যোগ দেন। বলাইদেব শর্মাও কিছুদিন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফকির চন্দ্র রায়ও এদের সংস্পর্শে আসেন ছাত্রাবস্থায়। ঢাকার শ্রী সঙ্ঘ বর্ধমানে শাখা স্থাপন করেন । এই সঙ্ঘে যোগ দেন আমোদবিহারী বসু বসন্তকুমার মিত্র, পুরুষোত্তম চ্যাটার্জী, কমলাকান্ত বসু এবং ফকিরচন্দ্র রায়।

কলকাতার প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেন ফকিরচন্দ্র রায় এবং সুধীন্দ্রনাথ রায়। এই সময় থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত বর্ধমানে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির কথা আগেই বলা হয়েছে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র, ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বারবার বর্ধমানে এসে যুবকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। গুপ্ত সমিতিভুক্ত যুবকেরা সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ছেন। শিবশংকর চৌধুরী, অতুলচন্দ্র সামন্ত নেতৃত্বে আসছেন। বর্ধমানে বোমা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। নবকুমার বাজপাই, ফকির রায় এই কাজে ব্রতী হন। বিনয় চৌধুরী এবং তরুণ হরেকৃষ্ণ কোঙার স্বদেশী ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফকির রায় গ্রেপ্তার হন এবং এরপর দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন কারাগারে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। হরেকৃষ্ণ কোঙার গ্রেপ্তার হন এবং আন্দামানে প্রেরিত হন। বিনয় চৌধুরী আত্মগোপন করেন। সরোজ মুখার্জী কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। বিনয়বাবু বীরভূম, আসানসোল এবং বাঁকুড়ায় বিপ্লবী কার্যকলাপ সংগঠিত করতে ব্যস্ত থাকেন। পরে ১৯৩৪ সালে বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় বিনয়বাবু গ্রেপ্তার হন। চারবছর পরে ১৯৩৮-এ তিনি মুক্তি পান এবং কম্যুনিষ্ট পার্টীতে যোগ দেন।

দেখা যাচ্ছে ১৯৩১-র পর জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলনে জোয়ার এসেছে এবং স্পষ্টতঃই বিপ্লববাদী রাজনীতি মুখ্য ঝোঁক হিসাবে দেখা দিচ্ছে। পরে এই বিপ্লববাদী রাজনীতির নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই কম্যুনিষ্ট পার্টীতে যোগদান করেন।

কৃষক আন্দোলনের সূচনা

বর্ধমানে কংগ্রেসের উদ্যোগে কৃষক সমিতি গঠিত হয় ১৯৩১ সালে। হেলোরাম চ্যাটার্জী এই সমিতির প্রথম সভাপতি এবং রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী প্রথম সম্পাদক। হাটগোবিন্দপুর অঞ্চল ছিল এই সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র। ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

সভাপতিত্ব করেন। মজার ব্যাপার এই যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও এই সভায় বক্তৃতা করেন। এরপর বর্ধমানের প্রথম জোরদার কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয় ১৯৩৫ সালে। এই আন্দোলন দামোদর ক্যানেল আন্দোলন নামে খ্যাত। কৃষক সমিতি ও বর্ধমান জেলা রায়ত সমিতি যৌথভাবে প্রস্তাবিত ক্যানেল কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। টাউন হলে মহম্মদ ইয়াসিনের সভাপতিত্বে ৫০০ জন চাষীর এক সভায় হয় ১৯৩৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর। কংগ্রেস নেতৃত্বে এই আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৭ সালে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি গঠিত হয়। মূলতঃ এটা ছিল রায়ৎ, সাধারণ কৃষক এবং জমিদার শ্রেণীর এক যৌথ সমিতি। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জী, মুজফফর আহমেদ (কাকাবাবু) প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতারা কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করেন। কিন্তু বাস্তবে এই আন্দোলনের কোন শ্রেণী চরিত্র ছিল না। এমনকি বর্ধমানের মহারাজাও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। হাটগোবিন্দপুর, করুরি, মণ্ডলগ্রাম, ওরগ্রাম, বেলগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে মিটিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাদবেন্দ্র পাঁজা, আব্দুস সাত্তার, আব্দুল্লা রসুল, দাশরথি তা, বঙ্কিম মুখার্জী, হেলারাম চ্যাটার্জী প্রমুখ কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৯ সালে আউসগ্রামে সত্যাগ্রহ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চাশ জন সত্যাগ্রহীর একটি তালিকা প্রস্তুত হয়। ননীবালা সামন্ত নামে একজন সাহসী রমণীও এই দলে ছিলেন। সরকার সত্যাগ্রহ ভাঙার জন্য চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালান। সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ব্যাপক আন্দোলনের চাপে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সরকার প্রস্তাবিত কর হার কমাতে বাধ্য হন। আন্দোলন আংশিকভাবে জয়ী হয়। এই সত্যাগ্রহ উপলক্ষে কলকাতা থেকে নীরদ দাশগুপ্ত নামে একজন কম্যুনিষ্ট কর্মী বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তুলতে আসেন। সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই আন্দোলনের তিনিই একমাত্র শহীদ।

১৯৩১ সালে বর্ধমানে ছাত্রযুবদের সম্মেলন হয়। প্রণবেশ্বর সরকার (টৌগো) ছিলেন তৎকালে বর্ধমানের ছাত্রযুবদের অবিসংবাদিত নেতা। ফকিরচন্দ্র রায়, বামাপতি ভট্টাচার্য, আমোদবিহারী বসু এবং সরোজ মুখার্জী ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। এই সমাজতান্ত্রিক যুব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব। সম্ভবতঃ তিনি অর্থসাহায্য করে থাকবেন। বিনয় চৌধুরী, দাশরথি তা ও আব্দুস সাত্তারও এতে অংশ নেন। ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বঙ্কিম মুখার্জীও এসেছিলেন। কুচুটে একটি সমাজতন্ত্রী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ সেন। এখানে শিক্ষকতায় যোগ দেন সরোজ মুখার্জী, আমোদবিহারী বসু, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, দাশরথি তা, দুর্গাপদ নন্দী এবং গোপীকৃষ্ণ রায়। এঁদের থাকার জন্য একটি দোকানের উপরে একটি ঘর নেওয়া হয়। নাম দেওয়া হয় 'সাম্যাবাস'। 'সাম্য' নামে একটি পত্রিকা গোপনে ছাপা ও বিলির কাজ হতো এখান থেকে। বিজয় ভট্টাচার্য এবং যাদবেন্দ্র পাঁজা এই গোষ্ঠীকে সাহায্য করতেন।

বিজয় ভট্টাচার্য গান্ধীজির আদর্শ অনুসরণে বর্ধমানে একটি হরিজন বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেন। ফকিরচন্দ্র রায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর বর্ধমান রাজনীতিতে গুপ্ত সমিতি পরিচালিত রাজনীতিতে ভাটা পড়ে এবং গোপন বিপ্লবী রাজনীতি থেকে যুবকরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে চলে যান। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন এঁদের নেতা এবং প্রেরণা স্বরূপ। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ছিলেন আবুল

কাশেমের দৌহিত্র এবং জমিদার পরিবার ভুক্ত। তিনিও কম্যুনিষ্ট পার্টীতে যোগ দেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ এর মধ্যে বর্ধমান জেলায় কম্যুনিষ্ট দলের প্রতিষ্ঠা হয়।

শেষ পর্যায়

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু বর্ধমানে আসেন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন উপলক্ষে। নূতনগঞ্জের ঈশ্বরীতলা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি বক্তৃতা করেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল অফিসে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন চেয়ারম্যান এবং মহম্মদ আজম ভাইস চেয়ারম্যান। প্রণবেশ্বর সরকার এবং ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ ছিলেন নির্বাচিত কমিশনার। সুভাষচন্দ্র বসু পরে ১৯৩৯ সালে আরো একবার বর্ধমানে আসেন - তবে তখন তিনি কংগ্রেস ছেড়েছেন।

১৯৪২ সালে ভারতছাড়ো আন্দোলনে বর্ধমানে গ্রেপ্তার হন ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায়, অজিত কুমার রায়, ভরতচন্দ্র গাঙ্গুলী, অসীম ঘোষ, নারায়ণ দাস হাজরা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শিবকুমার মিত্র, দাশরথি তা, ডাঃ অম্বুজা বসু প্রমুখ। নারায়ণ চৌধুরী শক্তি প্রেসে গ্রেপ্তার হন। বিজয় ভট্টাচার্য কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। কালনা কাটোয়ায় জোরদার আন্দোলন হয়। কম্যুনিষ্টরা তখন এ আন্দোলনে যোগ দেন নি। দাশরথি তার নেতৃত্বে রায়নায় বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা হয়। এতদসত্ত্বেও বর্ধমানে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তেমন জোরদার হয়নি।

উপসংহার ঃ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে বর্ধমান জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তারিত পরিচয় উত্থাপন করা সম্ভব নয়। স্থানাভাবে এবং উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম এই প্রবন্ধে উল্লিখিত করা গেল না। অনেক স্মরণীয় নাম বাদ গেছে। সুকুমার ব্যানার্জী এ জেলার প্রথম রাজনৈতিক শহীদ। রাণীগঞ্জে তাঁকে অত্যাচারী ব্রিটিশ খুন করে। ডাঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু, প্রভাসচন্দ্র বসু, আসানসোলের নিবারণচন্দ্র ঘটক এবং তাঁর মাসী ছ'কড়ি বালা দেবী, সিয়ারসোলের রাজা প্রমথনাথ মালিয়া এবং তাঁর বড়ছেলে পশুপতিনাথ মালিয়া, সনৎ গাঙ্গুলী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, দাঁইহাটের হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যোগাক্ষেপা, স্বামী কমলানন্দ, গৌরহরি সোম, পশুপতি গঙ্গোপাধ্যায় সমুদ্রগড়ের বউদিদি এবং ধাত্রীগ্রামের খুড়িমা - এইসব নমস্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল না স্থানাভাবে। ডাঃ বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাণীগঞ্জে প্রথম কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। 'সরস্বতী মন্দির' জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল । ভীমাচরণ রায়, সেখ কাল্লু, অমূল্যরতণ দে, দুর্গাদাস হালদার, বনোয়ারিলাল ভালোটিয়া, অমরেন্দ্র বসু, রাণীগঞ্জের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত উখড়াতে কংগ্রেসের শাখা গড়ে তোলেন।

কাটোয়ায় অন্নদাপ্রসাদ সাহাচৌধুরী, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, মুন্সি বাহারুদ্দিন, তমাল সাহা, ক্ষুদিরাম মোদক, বালককৃষ্ণ কোঙার, শেখ রমজান স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। হরেরাম মণ্ডল কাটোয়া কংগ্রেসের স্তম্ভ ছিলেন। বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে কাটোয়ার পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসেবী যোগ দেন। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, হেমগিরি বিশ্বাস, ক্ষুদিরাম মোদক, রাধাশ্যাম সাহা কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। বহু গ্রামে কংগ্রেসের শাখা ও চরকা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কেতুগ্রাম থানার বৈষ্ণব দাস ও রাখাল রায় গান্ধীবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। মহীয়সী মহিলা নির্মাল্য

স্যান্যাল ওজস্বিনী বক্তা ছিলেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রফুল্ল পাঁজা ও নিরঞ্জন মল্লিক অর্থসাহায্য দিয়ে আন্দোলনকে সক্রিয় রেখেছিলেন।

স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে জেলার প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অনেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রয়েছেন। সরোজ মুখার্জী সিপিআই (এম) দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান। মনসুর হবিবুল্লাহ স্পীকার ও মন্ত্রী পদ অলংকৃত করেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার সারাভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে ছিলেন এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। সৈয়দ শাহেদুল্লাহও সিপিএম এর একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা ও তাত্ত্বিক। আমোদবিহারী বসু এ,বি,টি এর সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। আবদুল্লা রসুল বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা হয়েছিলেন। দাশরথি তাও কয়েকবার এম, এল, এ এবং একবার মন্ত্রী হয়েছিলেন। ফকিরচন্দ্র রায় বামপন্থীদের সমর্থনে একাধিকবার এম, এল, এ নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টীতে যোগ দেন নি। কংগ্রেসে যারা থেকে গেলেন তাঁদের মধ্যে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও আব্দুস সাত্তার মন্ত্রী হয়েছিলেন। যাদবেন্দ্র পাঁজা পরে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কংগ্রেস এবং গান্ধী আদর্শই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বিজয় ভট্টাচার্য গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং কলানবগ্রাম শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন গান্ধীআদর্শে। নারায়ণ চৌধুরী দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতিতে থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন।

পুরনোদের মধ্যে মহম্মদ ইয়াসিন, আবুস কাশেম, আব্দুস সাত্তার, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, যাদবেন্দ্র পাঁজা, আব্দুস সাত্তার, হরেকৃষ্ণ কোঙার, কালী কিংকর সেনগুপ্ত, বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া, দাশরথি তা, বলাই দেবশর্মা প্রমুখ আজ আর জীবিত নেই। বিজয় ভট্টাচার্য, ফকিরচন্দ্র রায় এবং শ্রীকুমার মিত্র এই তিন প্রধান অশীতিপর স্বাধীনতা সংগ্রামী রোগশয্যায় কালাতিপাত করছেন। বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ এখনও সুস্থ রয়েছেন এবং রাজনীতি অথবা সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত রয়েছেন।

ফকিরচন্দ্র রায় এবং সরোজ মুখার্জী আত্মজীবনীমূলক বই লিখেছেন। বলাইদেব শর্মাও স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। নারায়ণ চৌধুরী 'বর্ধমান পরিচিতি' ছাড়াও বর্ধমানের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে ধারাবাহিক লিখে চলেছেন। এ ছাড়াও আরো অনেকে এ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমানের অবদান বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কোন গবেষক যদি এবিষয়ে উদ্যোগী হন তাহলে বর্ধমানবাসী উপকৃত হবেন। বর্ধমানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় এই কালপর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঋণস্বীকার

১। Freedom Movement in Burdwan — Prof. Bhaskar Chatterjee & Prof. Ramakanta Chakraborty (Burdwan District Congress Centenary Celebration Committee (1985) Burdwan.

২। 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়' (১ম খণ্ড) - ফকিরচন্দ্র রায়।

৩। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টী ও আমরা (১ম খণ্ড) - সরোজ মুখোপাধ্যায়।

৪। স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান - বলাই দেবশর্মা
(বর্ধমান সম্মিলনীর সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ)

স্বাধীনোত্তর বর্ধমানের রাজনৈতিক চিত্র

সুমন সরকার

প্রথম নির্বাচন :

বর্ধমান জেলার রাজনৈতিক পরিচয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর সবারই মোটামুটি জানা। 'লালদূর্গ' হিসাবেই রাজনৈতিক মহলে এর পরিচিতি। রাজনীতির ক্ষেত্র দুর্গ কথাটির অর্থ কি, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, কারণ ভিন্নজনের কাছে একথার অর্থ ভিন্ন। ১৯৬৭ সাল থেকে এ জেলায় কমিউনিস্টদের প্রাধান্য শুরু হয়। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে এ প্রাধান্য বজায় ছিল না, ঐ নির্বাচনকে যদিও অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেন। ১৯৬৯, ৭১, ৭৭, ৮২, ৮৭-র নির্বাচনে CPM-এর জয়ের ধারায় একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষণ করলে, CPI এবং পরে CPM-এর ক্রমোন্নতি এবং কংগ্রেসের পক্ষে তা হল ক্রমাবনতি। ১৯৭৭ সাল থেকে CPM-এর ছিল স্থিতিশীল নিরংকুশ প্রাধান্য। ১৯৮২ সালে কংগ্রেস এই জেলার কোনো বিধান সভা আসনেই জিততে পারেনি। ১৯৮৭ সালে তারা শিল্পাঞ্চলে তিনটি আসনে জেতে। কিন্তু শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে কোন রাজনৈতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। তৎকালীন পরিবেশ, ঘটনাবলী এবং দেশ বা রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থাকেও বিবেচনাতে আনতে হবে। তা না হলে শুধু পরিসংখ্যান আলোচনা করাটা এক অর্থহীন কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এই নিবন্ধে যদিও খুঁটিনাটি তথ্য বা তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার পর্যাপ্ত সুবিধা নেই, তা হলেও পরিসংখ্যানের পাশাপাশি কিছু ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে মাত্র, এই আলোচনায় শুধু মাত্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকেই ভিত্তি হিসাবে ধরা হচ্ছে। এ জেলায় বর্তমানে লোকসভা আসন চারটি। এর ফলাফল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, যেমন নয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিশাল পরিসংখ্যানকে সেভাবে বিশ্লেষণ করা।

দেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। এক সঙ্গে সমস্ত রাজ্য বিধান সভা এবং লোকসভার জন্য অনুষ্ঠিত হল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মোট আসন ছিল ২৩৮ টি। বর্ধমান জেলায় আসন সংখ্যা ছিল ২০টি। এই আসন গুলির মধ্যে রায়না, গলসী, আউসগ্রাম, রাণীগঞ্জ, কুলটি এবং কালনায় ছিল দুটি করে আসন। অর্থাৎ সেখানকার অধিবাসীরা দুটি করে ভোট দিতেন জাতিগত ভাবে তপশীল জাতি উপজাতির লোকেদের জন্য একটি করে আসন, অন্যটি সাধারণ। বর্ধমান জেলার বাকী আসনগুলি ছিল বর্ধমান, খণ্ডঘোষ, আসানসোল, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর, কাটোয়া মোঙ্গলকোট এবং কেতুগ্রাম। অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি লাভ করে ২ টি আসন (বর্ধমান এবং কাটোয়া), কংগ্রেস ১৩টি আসন, কে এম পি পি ২ টি, হিন্দু মহাসভা ১ টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ১ টি এবং নির্দল ১ টি। কে এম পি পি পার্টির নাম নবীন পাঠকদের হয়ত অচেনা লাগবে, দলটির পুরো নাম হল 'কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি' যার স্রষ্টা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার ঘোষ এবং এই দল পরে পি এস পি বা প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বর্ধমান জেলার বিধান সভা আসনগুলির ফলাফল দেখুন।

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত %
১	বর্ধমান	৫৩১৯২	২২৪৬২	বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী (সি পি আই)	৫০.৯	উদয়চাঁদ মহতাব (কংগ্রেস)	৪২.২
২	খণ্ডঘোষ	৫০৪৯২	১৭৬১১	মহঃ হোসেন (কংগ্রেস)	৩৭.০	এ বি বসু (নির্দল)	৩১.৪
৩,৪	রায়না (সাঃ + তপঃ)	১০২,২৬১	৭৩,৯৬৬	মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক এবং	২১.২	জি পাকড়ে এবং	২০.৪
				দাশরথি তা (কে এম পি পি)	২০ ৪	এন সিনহারায় (কংগ্রেস)	২০.১
৫,৬	গলসী (সাঃ + তপঃ)	১০২,৬১৭	৭৩,৫৬৯	যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা ও	২৪.১	পি সি রায় (নির্দল)	১৯.২
				মহীতোষ সাহা (কংগ্রেস)	২২.৯	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (সি পি আই)	১৯.১
৭,৮	আউসগ্রাম (সাঃ + তপঃ)	১০৭,৮৪১	৬৮,০৫৫	কানাইলাল দাস ও	২৬.০	ডি নাথ রায় (ফঃ বঃ মাঃ)	৯.৭
				আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস)	২৪.০	এ কে চট্টোপাধ্যায় (নির্দল)	৭.৭
৯, ১০	রাণীগঞ্জ (সাঃ + তপঃ)	৯৯৬২৮	৭২,৫৮১	পি নাথ মালাইয়া (নির্দল)	২৭.৪	সি, এল কেজরিওয়াল (কংগ্রেস)	১৫.৭
				বি বি মণ্ডল (কংগ্রেস)	১৬.৩	প্রবীর সেন (নির্দল)	১১.৫
১১, ১২	কুলটি (সাঃ + তপঃ)	১০২২০২	৬২,২০৩	বৈদ্যনাথ মণ্ডল	২২.১	রজনী বারুই ও	৯.৩
				জয় নারায়ণ শর্মা (কংগ্রেস)	১৫.৭	এম চট্টোপাধ্যায় (নির্দল)	৯.০
১৩	আসান-সোল	৫৩,৮৯৬	১৯,৭৬৪	এ এন বসু ফঃ বঃ	৪০.১	জে এন রায় (কংগ্রেস)	২৫.৫
১৪, ১৫	কালনা (সাঃ + তঃ উঃ)	১০৬,৫০৪	৯৩৯১৩	বৈদ্যনাথ সাঁওতাল ও	২২.৫	জমাদার মাজি (সি পি আই)	১৯.২
						এ জি কোনার	১৮.৬
				আর, বি, সেন (কংগ্রেস)	১৯.৬	(কে এম পি পি)	

১৬	পূর্বস্থলী	৫০,৬৫৯	২৪,৬০৭	বি এন তর্কতীর্থ (কংগ্রেস)	৫৬.৯	মনোরঞ্জন সেন (বি জি এস)	২৭.০
১৭	মন্তেশ্বর	৫২,৮৯৭	২৯,৫৭৬	এ আর মণ্ডল (কংগ্রেস)	৫২.৫	এস চৌধুরী (কে এম পি পি)	৪৭.৫
১৮	কাটোয়া	৫৭,৪৪৯	২৮,৫৮৮	সুবোধ চৌধুরী (সি পি আই)	৩৫.১	বি কে বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস)	২৭ ৯
১৯	মঙ্গলকোট	৫৪,৯৯৯	২২৩৩৮	বি, সি, রায় (কংগ্রেস)	৩৯ ৯	এস সি বন্দ্যোপাধ্যায (নির্দল)	৩২.৬
২০	কেতুগ্রাম	৫৪,৭১১	৩১০২৩	টি বন্দ্যোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভা)	৩৭ ৪	আবদুল কাশিম (কংগ্রেস)	৩৭.২
		১,০৪৯,৩৭৮	৬০৪,২৫৬		৫৭.৫৮		

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, জেলায় কোন আঞ্চলিক দলের প্রভাব ছিল না। জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সব দলই এই নির্বাচনে তাদের শক্তির প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যে রাজনীতি এই নির্বাচনে ফুটে উঠল, তা হল বহুধা বিভক্ত রাজনীতি। প্রধান দল কংগ্রেস ছাড়া বিরোধী পক্ষে বহু দল, যেমন কে এম পি পি, হিন্দু মহাসভা বি জি এস, ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি আই, আর এস পি প্রভৃতি। এখনকার দিনে নির্বাচনে এ জেলায় মেরুভবন যেখানে সম্পূর্ণ ১৯৫২ সালে কিন্তু তা নয়। কুড়িটি কেন্দ্রের মধ্যে আঠারটিতে বিজয়ী এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিলিত ভোট সংখ্যা ৮৫ শতাংশের বেশী নয়। অর্থাৎ প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট কেড়ে নেবার মত রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ছিল সে সময়ে।

আর প্রশ্ন হল ১) এই কে এম পি পি বি জি এস হিন্দু মহাসভার মত দলগুলো বর্ধমান জেলায় পা রাখার মত ঠাঁই পেল কি ভাবে ? ২) বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ ১৯৫২ সালের আগেও সাধারণ প্রজাদের মধ্যে মোটামুটি জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রথম নির্বাচনেই তিনি হারলেন কেন ? ৩) বর্ধমান ছাড়া কাটোয়াতেও কমিউনিস্টরা জিতেছেন। এই জেতার পেছনে কি প্রার্থীর নিজস্ব জনপ্রিয়তা দায়ী না, কমিউনিজমের যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে, তা কাটোয়াতেও নির্বাচনের প্রাক্কালে সেখানকার জনসাধারণ কে প্রভাবিত করেছিল ? বর্ধমান আর কাটোয়া এই দুই জায়গায় কমুনিস্টরা প্রথম ঘাঁটি গাড়লেন কিভাবে ?

এখন এই প্রশ্নগুলোর উপযুক্ত উত্তর খোঁজা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্ভবতঃ এটাই, যে, মহারাজ উদয়চাঁদ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ তো দূরের কথা, সাধারণ পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন না। অপরদিকে বিনয় বাবু বহুদিন কংগ্রেসে ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তি ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, সাধারণ মানুষ মনে করেছিলেন উদয়চাঁদের কংগ্রেসকে প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতাই ছিল না, বরং বিনয়বাবু পুরনো কংগ্রেসের সার্থক উত্তরসূরী। হিন্দু মহাসভা নিঃসন্দেহে এক ধমভিত্তিক রাজনৈতিক দল, যার ইতিহাস প্রায় কংগ্রেসের মতই পুরনো। এমন দল কোন অঞ্চলে কেমনভাবে প্রথম ঘাঁটি তৈরী করে, সেটা

বুঝতে অসুবিধা হয়না। কিন্তু কে এম পি পি বা ঐ ধরনের দলগুলোর সবই হচ্ছে প্রধান দল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা বিক্ষুব্ধদের সংগঠন। স্বাভাবিক ভাবেই এরা সংখ্যালঘু। কিন্তু বৃহত্তর স্তরে যদি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী তৈরী হয় নীচু পর্যায়েও তার প্রভাব পড়ে। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে, বর্তমানের ছোটখাটো রাজনৈতিক দল যে ভাবে এবং যে কারণে তৈরী হয়, আগেকার দিনের তুলনায় তা গুরুত্বহীন - যদি গুরুত্বের মাপকাঠি ভোটের ফলাফল হয়। ১৯৫২ সালে কিন্তু কোনো ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে না যে এই জেলা ভবিষ্যতে রামপন্থী রাজনীতি বিশেষতঃ সি, পি, এম এর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হবে।

দ্বিতীয় নির্বাচন : বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। আসন সংখ্যা এবং কেন্দ্রগুলির ভৌগলিক সীমানার পুনর্বিন্যাস ঘটে এই নির্বাচনে। ১৯৫৭ সালে রাজ্য বিধান সভায় মোট আসন বেড়ে দাঁড়ায় ২৫২টি। পূর্বে যে সব কেন্দ্রে দুটি আসন ছিল তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় কেতুগ্রাম, জামুরিয়া ও অণ্ডাল। ১৯৫২ সালের দ্বৈত আসন সম্বলিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে আউসগ্রাম একক আসনে পরিণত হয়। নতুন আসন তৈরী হয় হীরাপুর, ভাতাড়, জামুড়িয়া, অণ্ডাল প্রভৃতি। ১৯৫৭ তেও দুর্গাপুর কেন্দ্র তৈরী হয় নি। কংগ্রেস পায় ১১টি আসন, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ৩টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ৩ টি, নির্দল ৩টি, মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক - ১টি। খণ্ডঘোষ কেন্দ্রের ফলাফল যোগাড় করা সম্ভব হয় নি। স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাসে যে দুজন ব্যক্তিত্ব বর্ধমানের তথা রাজ্যের ইতিহাসে অপরিসীম প্রভাব ফেলেন তাদের অন্যতম শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৯৫৭তেই নির্বাচনে দাঁড়ান এবং জেতেন, অপর জন অর্থাৎ বিনয় চৌধুরী তো প্রথম নির্বাচনেই জেতেন, দ্বিতীয়টিতেও। ১৯৫৭র নির্বাচনে পি এস পি প্রথম জেতে কিন্তু তাদের অন্যতম জয়ী সদস্য ছিলেন শ্রী দাশরথি তা। প্রথম নির্বাচনে দাশরথি বাবু কে এম পি পি হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জেতেন। দ্বিতীয় নির্বাচনে দল পালটে পি এস পিতে আসেন এবং জেতেন। বর্ধমান কেন্দ্রে মর্যাদা পূর্ণ লড়াই হয় বিনয় চৌধুরী এবং জেলা কংগ্রেস নেতা নারায়ণ চৌধুরীর মধ্যে। অল্প ভোটের ব্যবধানে নারায়ণ বাবু হেরে যান। কাটোয়া কেন্দ্রে ৫২ সালে বিজয়ী কমিউনিস্ট প্রার্থী সুবোধ চৌধুরী হেরে যান কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে। বিজয়ী কমিউনিস্টদের তালিকায় যুক্ত হন জমাদার মাঝি (কালনা তপঃ কেন্দ্রে)। কংগ্রেসের দখল থেকে চলে যায় কালনার দুটি আসনই। কেতুগ্রাম কেন্দ্রে ১৯৫২ সালে হিন্দু মহাসভায় প্রার্থী জিতেছিলেন, কিন্তু ৫৭র নির্বাচনে ঐ দলের অস্তিত্ব জেলা থেকে বিলুপ্ত হয়। কেতুগ্রামের দুটি আসনেই বিজয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থীরা। সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রথম এবং শেষ সাফল্য ১৯৫২ তেই। তারপর সাম্প্রদায়িকতা আর এ জেলায় আশ্রয় পায় নি। ১৯৫২য় মোঙ্গলকোট কেন্দ্রে শ্রী বি সি রায় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্দল প্রার্থীকে হারিয়ে নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ১৯৫৭তেও নির্বাচনে দাঁড়ান নির্দল প্রার্থী হিসাবে এবং পরাজিত করেন কংগ্রেস প্রার্থী এ পি মণ্ডল কে, তবে এবার লড়াইটা হয় মন্তেশ্বরে। মণ্ডলবাবু কিন্তু মন্তেশ্বরে ১৯৫২তে জেতেন। ফলে কংগ্রেস-এর হাত থেকে মন্তেশ্বর আসনটি হাতছাড়া হয়।

১৯৫৭ সালের বিধান সভা নির্বাচনে এ জেলার ফলাফল।

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত %
১,২	কেতুগ্রাম (সাঃ + তপঃ)	১,২৩,৯৭০	১,১৬,৬৭২	শঙ্কর দাস (কং)	৩০.৬	আর এস সাহা	১৩.২
				ও		ও	
				আবদুস সাত্তার (কংগ্রেস)	২৭.৩	জে সি সিনহা (সি পি আই)	১৪.২
৩	কাটোয়া	৬৫,২১৪	৩৭,০২২	টি চৌধুরী (কংগ্রেস)	৫৪.৩	এস, চৌধুরী (সি পি আই)	৪২.৭
৪	পূর্বস্থলী	৫৮,৯৪২	৩৩,১৯৪	বি, তর্কতীর্থ (কংগ্রেস)	৫৬ ৩	বি সি ভাওয়াল (সি পি আই)	৪৩.৭
৫	মন্তেশ্বর	৬০৭০৮	২৮৬২৮	বি, সি, রায (নির্দল)	৪৫.১	এ পি মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৩.৯
৬,৭	কালনা	১২৭,৭১৬		হরেকৃষ্ণ কোঙার	২৬.০	বৈদ্যনাথ মাজি	২১.২
				এবং		ও	
				জমাদার মাজি (সি পি আই)	২৫.২	রাস বিহারী সেন (কংগ্রেস)	১৭.৪
৮,৯	রায়না	১০৮,৯১৭		দাশরথি তা	২৭.৮	কিষণলাল তা	২৩.২
				ও		ও	
				গোবর্ধন পাকড়ে (পি এস পি)	২৬.৫	মৃত্যুঞ্জয় প্রমাণিক (কংগ্রেস)	২২.৬
১০	বর্ধমান	৬৭৬১২	৩১৯২৫	বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী সি পি আই	৪৮.৬	নারায়ণ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৪৭.৪
১১, ১২	গলসি	১২৩৭২৭	৯৯৮২৬	এফ সি রায় (নির্দল)	২৮.৪	মহীতোষ সাহা (কংগ্রেস)	২০.৫
				পি এন ধীবর (ফঃ বঃ মঃ)	২০.৫	মহঃ হোসেন (কংগ্রেস)	১৯.৪
১৩	আউসগ্রাম	৬০২০৬	২৩০৩৫	কানাইলাল দাস (কংগ্রেস)	৪৫.২	এ কে চাটার্জী (নির্দল)	২৭.৯
১৪	ভাতাড়	৬৮৯৮৩	৩০১৮০	আভালতা কুণ্ডু (কংগ্রেস)	৪৯.৪	এস জি মিত্র (আর এস পি)	৩৪.০
১৫, ১৬	জামুরিয়া	৯৮৭৩৫	৫৯১০০	ডি মণ্ডল (কংগ্রেস)	২১.৫	ডি বি এল সিংহ (পি এস পি)	১৯.২
				এ মণ্ডল (পি এস পি)	২১.৫	ইউ চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	১৬.৭
১৭, ১৮	অণ্ডাল	১০৪৩৫০	৭৭২২২	আনন্দ গোপাল মুখার্জী	২৮.৭	রবীন সেন	১৯.৮
						পি বি সুরথ	১৫.৭

				ও		(সি পি আই)	
				ডি মণ্ডল (কং)	২৭.৮		
১৯	কুলটি	৪০১২৭	১৭৮৮৬	বি পি ঝা (আর এস পি)	৪৮.৯	জে শর্মা (কংগ্রেস)	২৮.৪
২০	হীরাপুর	৪৮৮৪৬	২৩৯৪২	তাহের হুসেন (নির্দল)	৫৫.২	এ আর আচার্য্য (কংগ্রেস)	৩৫ ৪
২১	আসান সোল	৫৯৯০৬	২৩৩০২	এস ডি ঘটক (কংগ্রেস)	৪৫ ৪	বিজয় পাল (সি পি আই)	৩৯ ৪
২২	খণ্ডঘোষ	-	-	-	-		-

কম্যুনিস্টরা যে বর্ধমানে এক বড় শক্তি হিসাবে ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে, তার প্রতিশ্রুতি ১৯৫৭ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। ৫২ সালে তারা দুটি আসনে দ্বিতীয় হন, কিন্তু ৫৭ সালে ৬ টি আসনে দ্বিতীয় হন। বামপন্থী দল হিসাবে অন্য যে দলটি সাফল্য লাভ করে তা হল মার্কসিস্ট ফঃ বঃ। মিলিতভাবে এরা কংগ্রেসের বিরোধী এক শক্তিশালী পক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তৃতীয় নির্বাচন : কম্যুনিস্টরা প্রধান শক্তি

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে। দ্বৈত আসনগুলির অবলুপ্তি ঘটে এই নির্বাচনে। সৃষ্টি হয় কিছু নতুন আসন, যেমন অণ্ডাল আসনটি ভেঙ্গে হয় দুর্গাপুর ও রাণীগঞ্জ আসন। জামুরিয়া আসন থেকে তৈরী হয় বারাবনী নামের নতুন আসন। ফলাফল নিচে দেওয়া হল।

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত %
১	কেতুগ্রাম	৬৭৭৯৬	৩৫৩২৬	এস এম ঠাকুর (সি পি আই)	৩৮%	আবদুল কাশিম (নির্দল)	২৫%
২	কাটোয়া	৭৬৬২৭	৪৩০৮৯	এস চৌধুরী (সি পি আই)	৫৬.৮	এস ঠাকুর (কংগ্রেস)	৪৩.২
৩	পূর্বস্থলী	৭৪৯৫১	৪২৬৩৫	বি তর্কতীর্থ (কংগ্রেস)	৫১ ৪	বি সি ভাওয়াল (সি পি আই)	৪৫.৩
৪	মন্তেশ্বর	৭৩৫২৬	৩৯৫৯৪	এস এ এম হবিবুল্লাহ (সি পি আই)	৫০.৬	নারায়ণ চৌধুরী	৪৯.৪
৫	কালনা	৭৭৯১৮	৪৪৮৩৬	হরেকৃষ্ণ কোঙার (সি পি আই)	৫৩.৪	ডি বি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৫.১
৬	রায়না	৭২৫৪৮	৪১১৯৯	পি কে গুহ (কংগ্রেস)	৬৬.০	দাশরথী তা (এস এস পি)	৩০.৫

৭	বর্ধমান	১০২৪৮০	৫১৩০৩	রাধারানী মহতাব (কংগ্রেস)	৬৭.৪	বিনয় চৌধুরী (সি পি আই)	৩১.১
৮	গলসী	৭০২০৪	২৯৯১৭	কানাইলাল দাস (কংগ্রেস)	৫৪.৯	পি এন ধীবর (ফঃ বঃ মাঃ)	৪৫.১
৯	খণ্ডঘোষ	৬৮২১২	২৩০৩৮	জে এল ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৫৩.০	এফ সি রায় (নির্দল)	১৯.০
১০	আউসগ্রাম	৭১৭৪৬	২৮১১৮	মনোরঞ্জন বক্সী (নির্দল)	৩০.৯	এল জি ঘটক (কংগ্রেস)	২৮.৯
১১	ভাতার	৮২৫৪৫	৩৮৪৭৪	অশ্বিনী রায় (সি পি আই)	৫৫.৪	এস এস গুপ্ত (কংগ্রেস)	৪০.০
১২	রাণীগঞ্জ	৭১৩৩৬	২৪১৯৫	লক্ষণ বাগদী (সি পি আই)	৫২.৬	ডি মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩৯.৮
১৩	দুর্গাপুর	৮১৬৫৩	৩৫১৫৪	আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস)		অজিত সেন (এফ বি এল)	২১.০
১৪	জামুরিয়া	৬২৬০০	১৯৭৮৬	এ মণ্ডল (কংগ্রেস)	৫৭.৬	তিনকড়ি মণ্ডল (পি এস পি)	৩৩.৪
১৫	বারাবনী	৬৫৬৩৪	২২৩২৬	এইচ জি চক্রবর্তী (সি পি আই)	৪২.৫	আর কে রায় (কংগ্রেস)	৩৬.৮
১৬	কুলটি	৪১৫০৬	২০৪৮০	জে শর্মা (কংগ্রেস)	৩৯.৩	তাহের হোসেন (সি পি আই)	২৯.৪
১৭	হীরাপুর	৬১১৯৬	২৭৬৯২	জি আর মিত্র (কংগ্রেস)	৪৯.৮	সি এস মুখার্জী (সি পি আই)	৩৫.৬
১৮	আসানসোল	৭০৭৭৫	৩০০৭৪	বিজয় পাল (সি পি আই)	৪৩.৭	এস ডি ঘটক (কংগ্রেস)	২৭.৭

কয়েকটি আসনের ফলাফল এখানে দেওয়া গেল না। ১৮ আসনের মধ্যে ৮টি আসনে সি পি আই ৯টি আসনে কংগ্রেস এবং ১টি আসনে নির্দল প্রার্থীরা বিজয়ী হন।এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট, যে ১৯৫৭ সালে ভোট বিভাজনের যে চরিত্রটা অস্ফূট ভাবে প্রকাশিত, ১৯৬২ তা অনেক বেশী জোরদার হয় কংগ্রেস এবং সি পি আই এর ভেতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকে, তৃতীয় দল বা গোষ্ঠীকে ভোটদাতারা অপ্রয়োজনীয় হিসাবে মনে করেন। সরাসরি লড়াই বজায় থাকলেও কংগ্রেস কিন্তু এ জেলার এক নম্বর আসনটি বজায় রাখে প্রাপ্ত আসন বা ভোটের নিরিখে। ১৯৫২ বা ১৯৫৭ কংগ্রেসের আসন ক্রমান্বয়ে কমেছে, ১৯৬২ তে তা প্রায় সমান হয়ে দাড়ায় সি পি আই এর সঙ্গে। ১৯৬২ সালে নির্বাচনে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, সর্বত্র যখন সি পি আই এর শক্তি বেড়ে চলেছে তখন বর্ধমান কেন্দ্রে বিনয় চৌধুরী হেরে

গেলেন মহারাজ উদয় চাঁদের স্ত্রী রাধারাণী মহতাবের কাছে। এ হারের বহুজন সমর্থিত ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় না। অনেকে একে আবেগের ভোট বলে অভিহিত করেছেন। কাটোয়া, কেতুগ্রাম আসন দুটি কংগ্রেসের হাতছাড়া হল। রায়না কেন্দ্রে দাশরথি বাবু হেরে গেলেন কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে। ১৯৫৭র তুলনায় ১৯৬২ কংগ্রেসের এই একমাত্র লাভ। দাশরথি বাবুর এ জেলার রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতি তার মধ্যে কাজ করেছে, তাই ভোটাররা তাঁকে মেরুকরণের ঝোঁক মেনে, শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। ভাতার কেন্দ্রে ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস বিজয়ী হলেও ৬২ সালে এখানে জয়ী হন সি পি আই প্রার্থী। তবে সি পি আই-এর সব থেকে বড় জয় আসানসোল কেন্দ্রে। ১৯৫২ সালে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী এখানে জয়ী হন, ৫৭ সালে লড়াইটা হয় কংগ্রেসের এস ডি ঘটক ও সি পি আই-এর মধ্যে, এবং তাতে জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী। ১৯৬২ সালেও একই লড়াই এর পুনরাবৃত্তি, তবে ফলাফল ঠিক উল্টো।

১৯৬২-র নির্বাচনে মেরুভবনের চিত্রটি অনেক পরিস্কার হলেও একটা ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। যেমন ১) কোন দল শহরে বা গ্রামে বেশী শক্তিধর । ২) শিল্প এবং কৃষি ভিত্তিক অঞ্চলে কোন দলের প্রভাব বেশী। শিল্পাঞ্চলে আসনগুলো যেমন, আসানসোল, দুর্গাপুর, জামুরিয়া, রাণীগঞ্জ, বারাবনী প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন কংগ্রেস সি পি আই-এর আসন সমান সমান, কৃষিভিত্তিক অঞ্চলেও তাই। ১৯৫২ বা ৫৭র তুলনায় সর্বত্র বামপন্থীদের শক্তি বাড়লেও কংগ্রেস কে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। সি পি আই-এর এই জয় তাদের ট্রেড ইউনিয়ন নীতি এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত নীতির জয় বলে অনেকে মনে করেন, তেমনি কংগ্রেসের ক্রম হ্রাসমান শক্তির জন্য দায়ী করা হয় তাদের সাংগঠনিক অব্যবস্থাকে।

চতুর্থ নির্বাচন ঃ বর্ধমান ভিন্ন পথে

দেখা যাক ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে গত তিনটি নির্বাচনে যে ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে, তার কোন পরিবর্তন হল কি না। ১৯৬৭র নির্বাচনে পঃ বঙ্গ বিধান সভার মোট আসন হল ২৮০টি আর বর্ধমান জেলার আসন সংখ্যা বেড়ে ২৫।

ক্রনং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত %
১	হীরাপুর	৬৪১৩৬	৪১৭৮৯	শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৩৮.৩	চন্দ্রশেখর মুখার্জী (সিপিএম)	৩৬.৫
২	কুলটি	৬৭২০৯	৩৭২৫২	জয় নারায়ণ শর্মা (কংগ্রেস)	৩৫.১	টি এন চক্রবর্ত্তী (এসএসপি)	৩২.৭
৩	বারাবনী	৬৪৩৮৮	৩৬৬৪০	মিহির উপাধ্যায় (কংগ্রেস)	৪৯.২	এস বি রায় (সিপিএম)	৩৯.০১
৪	আসানসোল	৬৯৩২০	৩৯৪১৩	জি আর মিত্র (কংগ্রেস)	৪৫.০	বামাপদ মুখার্জী (সিপিএম)	৩৩.৯

৫	রাণীগঞ্জ	৬৪১৪৯	৩৭৬৯৪	হারাধন রায় (সি পি এম)	৪৮.১	এস সি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৫ ১
৬	জামুরিয়া	৪৮৬৫৭	২৫৪২২	তিনকড়ি মণ্ডল (সি পি এম)	৫৩.৯	অমরেন্দ্র মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৩.২
৭	উখরা	৬৬১২৬	৩৭২৫৯	হারাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৬.৯	লক্ষণ বাগদি (সি পি এম)	৪০.৩
৮	দুর্গাপুব	৮৯৯৮৯	৫৯৪৭৮	দিলীপ মজুমদার (সি পি এম)	৪৯ ৬	আনন্দ গোপাল মুখার্জী (কং)	৪৬ ৬
৯	ফরিদপুর	৬৪৩৯১		মনোরঞ্জন বক্সি (বি এ সি)	৪৯.৫	এল জি ঘটক (কংগ্রেস)	৪৬.৯
১০	আউসগ্রাম	৭৪৭৬৮	৩৭১০৩	কৃষ্ণচন্দ্র হালদাব (সি পি এম)	৫১ ৯	কানাইলাল দাস (কংগ্রেস)	৩৮.৮
১১	ভাতার	৬৫৩৮৫	৩৫৫৭৫	শান্তিময় হাজরা (কংগ্রেস)	৩৮.২	অশ্বিনী রায় (সি পি আই)	৩৬.৯
১২	গলসী	৬৮০৫৯	৪১৯৫১	ফকির চন্দ্র রায় (নির্দল)	৫৭.৬	সুধীর চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৪.৮
১৩	বর্ধমান (উঃ)	৭১২৬৮	৪৫৪১৮	সৈয়দ শাহে-দুল্লাহ (সি পি এম)	৪৮.৫	জি বসু (কংগ্রেস)	৪১.৯
১৪	বর্ধমান (দঃ)	৮২২৭৪	৪৬৫৫৭	এস বি চৌধুরী (কংগ্রেস)	৪৫.৭	বিনয় চৌধুরী (সি পি এম)	৪১.৮
১৫	খণ্ডঘোষ	৬৫৩৩৮	৩৩৩৯৬	পি এন ধীবর (কংগ্রেস)	৪৫.০	গোবর্ধন পাকড়ে (এস এস পি)	৪০.৪
১৬	রায়না	৭০৮৯১	৪৪৭৭৪	দাশরথী তা (পি এস পি)	৩৭.৯	প্রবোধ গুহ (কংগ্রেস)	৩৬.০
১৭	জামালপুর	৬৬০৯২	৩৭৪৪২	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৬৪.৫	টি সরকার (সি পি এম)	২৪.৯
১৮	মেমারী	৭৩৩১৩	৫০১২৬	পি বিষয়ী (কংগ্রেস)	৪৯.৫	বিনয় কৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম)	৪৭.৬
১৯	কালনা	৬৯৪৭১	৪৮৭৫৪	হরেকৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম)	৪৭.৬	ডি বি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৪.৯
২০	নাদনঘাট	৭০২২৩	৫২৭৭০	পি সি গোস্বামী (কংগ্রেস)	৫১.৩	এস সি ভাওয়াল (সি পি এম)	৪১.৬
২১	মন্তেশ্বর	৭০৯৫২	৪৭৫৮১	নারায়ণ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৫৬.৮	এ এম হবিবুল্লাহ (সি পি এম)	৩৭.৪
২২	পূর্বস্থলী	৭০৫৯৭	৪৭৭১১	ললিত হাজরা (সি পি এম)	৪৬.৮	রমা দেবী (কংগ্রেস)	৪৩.১

২৩	কাটোয়া	৭৪৪৪৫	৪৪৯০১	সুবোধ চৌধুরী (সি পি এম)	৪৮.৮	টি ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৪৭.৪
২৪	মঙ্গল কোট	৭০০৫০	৩৭৯৩৫	এন সাত্তার (কংগ্রেস)	৫২.৪	এস এস চৌধুরী (সি পি এম)	৪৭.৬
২৫	কেতুগ্রাম	৭৬৩২৪	৪১৩২৪	প্রভাকর মণ্ডল (কংগ্রেস)	৫২.৬	নারায়ণ দাস (সি পি এম)	৪৭.৫

১৯৬৭-র নির্বাচনে প্রচুর ওলোটপালট ঘটেছে। সমগ্র ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল ১৯৬৭র বর্ধমান জেলার ফলাফলেও তার প্রভাব পড়েছে। ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, সি পি আই ও সি পি এমে। বর্ধমানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই পুরোধা বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার সি পি এমেই যোগদান করেন। মোটামুটি ভাবে এ জেলার সমগ্র কমিউনিস্ট শক্তি সি পি এমের পেছনে দাঁড়ায়। পার্টি বিভাজনের ফলে সি পি আই পন্থী অর্থাৎ ডাঙ্গে পন্থীরা হতাশ হয়ে নির্বাচনী কাজে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। তাদের এই কাজে সি পি এম কেও কিছুটা ভুগতে হয়েছে। ১৯৬২-র বেশ কয়েটি জেতা সিট কমিউনিস্টদের হাতছাড়া হয়। সামগ্রিকভাবে সি পি এমের আসন সংখ্যা বাড়লেও পার্টি বিভাজনের জন্য সি পি এমের ক্ষতিও হয়েছে। একটু হিসাব নিকাশ করা যাক। এই নির্বাচনে সি পি এম পেল ৮ টি আসন, কংগ্রেস ১৪টি, পি এস পি ১, নির্দল ১, বি এ সি ১টি। ১৯৬২ সালের মত ১৯৬৭ সালেও বিনয় বাবু পুনরায় পরাজিত হলেন মাঝে ১৯৬৪র উপ নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। দাশরথি বাবু পরাজয়ের অন্ধকার থেকে আবার জয়ের আলোয় ফিরলেন, আনন্দগোপাল মুখার্জী প্রথম পরাজিত হলেন বর্তমানের বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা (সিটু) দিলীপ মজুমদারের কাছে।

এই নির্বাচনে বেশ কয়েকটি নতুন আসনের সৃষ্টি হয়, যেমন বর্ধমান কেন্দ্র ভেঙ্গে বর্ধমান (উত্তর) বর্ধমান দক্ষিণ সৃষ্টি হয়। উখরা নামের নতুন কেন্দ্রও তৈরী হয়। জামালপুর, ফরিদপুর আসনও এই নির্বাচনে আত্মপ্রকাশ করে। কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির সুফলটা গেছে পুরোপুরি কংগ্রেসের খাতে। বারাবনী কেন্দ্রটি কমিউনিস্টদের হাত থেকে কংগ্রেস কেড়ে নেয় তেমনি জামুরিয়া কেন্দ্রটি চলে যায় কংগ্রেস থেকে সি মি এমের হাতে। দুর্গাপুর কেন্দ্রে ১৯৬২ তে কংগ্রেস জয়ী হলেও ১৯৬৭তে সি পি এম সেখানে জেতে, আবার ভাতার কেন্দ্রটি কংগ্রেস ছিনিয়ে নেয় কমিউনিস্টদের হাত থেকে। আউসগ্রাম কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী জয়ী হন ১৯৬২ সালে, কিন্তু ৬৭ সালে সি পি এম এর প্রবীন নেতা কৃষ্ণচন্দ্র হালদার সেখান থেকে জেতেন। বর্তমানে যে কেন্দ্রগুলি সি পি এমের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত, যেমন মোঙ্গলকোট, রায়না, খণ্ডঘোষ, মেমারী, জামালপুর প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি কংগ্রেস প্রার্থীরা জেতেন। হীরাপুর কুলটি প্রভৃতি আসন কংগ্রেসেরই থেকে যায়, কংগ্রেসের লাভের মধ্যে হল আসানসোল আসনটি, ১৯৬২ তে বিজয় পাল এখানে জয়ী হলেও ১৯৬৭ তে জিতলেন কংগ্রেসের জি আর মিত্র।

সমগ্র ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরপর তিনবার কংগ্রেসের শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও ৬৭ তে এ জেলায় কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। সি পি এমের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকটভাবে প্রকাশিত হয় এই নির্বাচনে। তা ছাড়া দল বিভাজনের কারণগুলি কমিউনিস্টরা ঠিকভাবে জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হন নি।

ইংরাজীতে যাকে বলে 'ডিভাইডেড হাউস', তাঁর ওপর ভরসা করার 'ঝুঁকি' সম্ভবত বর্ধমানের জনগণ নিতে চান নি। অবধারিত ভাবেই এর সুফল চলে যায় কংগ্রেসের খাতে। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম একটি অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয় কংগ্রেসের পরাজয়ের ফলে। বাংলা কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে। অথচ সে বছর বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটি বলে পরিচিত এ জেলায় কমিউনিস্টরা বেশ বড় একটা ঘা খায়, কারণ ৫২, ৫৭, ৬২-র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যেটা বেশী প্রত্যাশিত তা হল বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি । সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ছিল এরকম : মোট আসন ২৮০, সি পি এম ৪৩, ফরোয়ার্ড ব্লক ১৩, আর এস পি ৬, সি পি আই ১৬, কংগ্রেস ১২৭ এবং অন্যান্য ৭১। ১৯৫২, ৫৭, ৬২ সালে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের শক্তি ছিল এরকম।

	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২
কমিউনিস্ট	২৮	৪৬	৫০
ফরোয়ার্ড ব্লক	১২	৮	১৩
আর এস পি	১	৩	৯
কংগ্রেস	১৪৯	১৫২	১৫৭
অন্যান্য	৪৭	৪১	২৩

১৯৬২ সালে কমিউনিস্টদের আসন ছিল ৫০, ১৯৬৭ সালে সি পি আই এবং সি পি এম পরস্পরের বিরুদ্ধে অনেক জায়গায় প্রার্থী দেয়, এবং দুদলের মিলিত আসন সংখ্যা ৪৩ + ১৬ = ৫৯। কিন্তু নির্দল সহ অন্যান্য ছোটখাট দলের সদস্যদের মিলিত সংখ্যা দাঁড়াল ৭১, যা কিনা ৬২ সালে ছিল মাত্র ২৩। অন্যান্যদের সাফল্যই বলে দেয় রাজনৈতিক অস্থিরতার মাপটি। বলা বাহুল্য এদের অনেককে নিয়ে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন বাংলা কংগ্রেস ও বামপন্থীরা তা বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। অথচ প্রথম একটি অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হওয়ায় বিভিন্ন মহলে এক পরিবর্তন সূচিত হয়, এবং অনেকেই আশা করেন যে এবার বৈপ্লবিক কার্যসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বহু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু যে সরকার নিজেদের সংখ্যাগত প্রাধান্য বজায় রাখতেই হিমসিম খাচ্ছে, তার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করা মুশকিল। ফলে যারা আশাবাদী ছিলেন তারা হলেন হতাশাগ্রস্ত। নকশাল আন্দোলনের সূত্র এই হতাশা থেকেই। সমগ্ররাজ্যে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বর্ধমান জেলায় ভূমি সংস্কারের কাজে হাত পড়ে স্বয়ং হরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বে। বহু মানুষ যেমন উপকৃত হন, অনেকেই হন ক্ষুব্ধ। খুঁটিনাটি ঘটনাবলী উল্লেখ ব্যতিরেকেও এটা বলা যায় বামপন্থীদের ভূমি সংস্কার নীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন নীতি এক সঙ্গে শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে আশা সঞ্চার করে যার প্রভাব পড়ে ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে। দেখা যাক সে নির্বাচনের ফলাফল।

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত %
১	হীরাপুর	৭৪৩৬৮	৪৫২১৬	রামাপদ মুখার্জী (সি পি এম)	৫৭.৮	শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৪২.২

২	কুলটি	৬৯৪৪৮	৩৫৪০০	টি এন চক্রবর্তী (এসএসপি)	৬০.৭	জয়নারায়ণ শর্মা (কংগ্রেস)	৩৬.৫
৩	বারাবনী	৭১৪৩৮	৩৮১৫৮	এস বি রায় (সিপিএম)	৬১.৩	মিহির উপাধ্যায় (কংগ্রেস)	৩৮.৭
৪	আসানসোল	৬৯৩২০	৩৯৪১৩	লোকেশ ঘোষ (সিপিএম)	৫৫.৯	জি আর মিত্র (কংগ্রেস)	৩৮.৭
৫	রাণীগঞ্জ	৭৫৫০৬	৪৪৪২৬	হারাধন রায় (সিপিএম)	৫৪.৩	এস সি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪১.৭
৬	জামুরিয়া	৫৫৫০৪	২৮২৬৬	অমরেন্দ্র মণ্ডল (কংগ্রেস)	৫০.৭	দুর্গাদাস মণ্ডল (এসএসপি)	৪৭.৪
৭	উখরা	৭১৮৩২	৩৫৯৯৭	লক্ষণ বাগদী (সিপিএম)	৫৩ ৭	হারাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৬.৫
৮	দুর্গাপুর	১২৮৭৩১	৭৯৬৬৮	দিলীপ কুমার মজুমদার (সিপিএম)	৫১.৬	আনন্দ গোপাল মুখার্জী (কংগ্রেস)	৪৮.৪
৯	ফরিদপুর	৬৯৩৮৪	৩৯৬৩৬	মনোরঞ্জন বক্সী (বাংলা কং)	৫১.৭	এল জি ঘটক (কংগ্রেস)	৪৬.৮
১০	আউসগ্রাম	-	-	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (সিপিএম)	৬০.১	শঙ্কর দাস (কংগ্রেস)	৩৫.৬
১১	ভাতার	৬৬৬১৪	৩৯৩৭৯	অশ্বিনী রায় (সিপিআই)	৬৮.৭	শান্তিময় হাজরা (কংগ্রেস)	২৪.২
১২	গলসী	৬৯১৮৬	৪৩৩১৬	ফকির চন্দ্র রায় (নির্দল)	৬৬.১	এস কে চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৩.৯
১৩	বর্ধমান (উঃ)	৭৩৫৯৪	৪৭৮২৮	দেবব্রত দত্ত (সিপিএম)	৬০.৯	জে কে বিশ্বাস (কংগ্রেস)	৩৩.৭
১৪	বর্ধমান (দঃ)	৯০৬৬৫	৫৩১৬১	বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী (সিপিএম)	৫৫.৫	এস বি চৌধুরী (কংগ্রেস)	৪৪.৫
১৫	খণ্ডঘোষ	৬৬০৪৩	৩৭২৯৯	গোবর্ধন পাকড়ে (এসএসপি)	৬৬.৯	পি এন ধীবর (কংগ্রেস)	৩০.৮
১৬	রায়না	৭২৩২২	৪৮৫৫৯	পি জি গুহ (সিপিএম)	৫৫.২	দাশরথী তা (কংগ্রেস)	৩৭.৪
১৭	জামালপুর	৬৬৬৫৭	৪২৪৮৫	বাসুদেব মালিক (বাংলা কং)	৬০.৪	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৯.৬
১৮ .	মেমারী	৭৫৭৯২	৫৪৫৪৮	বিনয় কোঙার (সিপিএম)	৫৮.৯	পি বিষয়ী (কংগ্রেস)	৪০.৮
১৯	কালনা	৭২০৯৫	৫২৫৫৯	হরেকৃষ্ণ কোঙার (সিপিএম)	৫৭.০	ডি বি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৩.০

২০	নাদন ঘাট	৭১৫২৫	৫৪০৪৪	এ এম হবিবুল্লাহ (সিপিএম)	৫৩.৫	পি, সি, গোস্বামী (কংগ্রেস)	৪৫.৯
২১	মন্তেশ্বর	৭২০৬৬	৪৮৭৮৮	কে এন এইচ চৌধুরী (সিপিএম)	৫৩.৫	নারায়ণ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৩৭.২
২২	পূর্বস্থলী	৬৯৪৫০	৫০১৬৮	এইচ কে মোল্লা (সিপিএম)	৫২.৮	রমা দেবী (কংগ্রেস)	৪৫.৭
২৩	কাটোয়া	৭৬২৫৮	৫২৫২৪	নিত্যানন্দ সরকার (কংগ্রেস)	৫১.৪	এইচ এম সিনহা (সিপিএম)	৪৭.২
২৪	মঙ্গলকোট	৭০৯৬২	৪২৫২৭	নিখিলানন্দ সর (সিপিএম)	৬৩.১	এন সাত্তার (কংগ্রেস)	৩৬.৯
২৫	কেতুগ্রাম	৭৭০২৯	৪৩৬০৪	রামগতি মণ্ডল (সিপিএম)	৫৬.৭	প্রভাকর মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৩.৩

বর্ধমান কংগ্রেসের হাতছাড়া হলো :

অর্থাৎ ২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেল ২টি (জামুরিয়া কাটোয়া) এস এস পি ২টি (কুলটি, খণ্ডঘোষ), বাংলা কংগ্রেস ২টি (ফরিদপুর, জামালপুর), নির্দল ১টি (গলসী) সি পি আই ১ টি (ভাতার) এবং সি পি এম ১৭ টি কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই হয়েছে সরাসরি, ভোট বিভাজন তাই হয়ে দুপক্ষে, ফলে কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ১৯৬৯ সাল থেকে এ জেলায় সি পি এমের পুরোপুরি প্রাধান্য শুরু হয়। আলাদা করে কোন প্রার্থীর নামোল্লেখের প্রয়োজন না থাকলেও দুজনের কথা বলতেই হয়। পরপর দুটো নির্বাচনে (৬২, ৬৭) হেরে বিনয়বাবু যেমন আবার জিতলেন, তেমনি দাশরথি বাবু এবার কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ৬৭র জেতা আসন হাতছাড়া করেন। শিল্পাঞ্চল বা কৃষিভিত্তিক অঞ্চল, গ্রাম বা শহর প্রভৃতি কোন ব্যাপারই সি পি এমের জয়ে প্রতিবন্ধক হয়নি। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যদি সি পি এম নঞর্থক ভোটে জিতে থাকে, তবে ১৯৬৯ সালে তারা জিতেছে সদর্থক ভোটে। কিন্তু যে জিনিসটার ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল, তা হল কংগ্রেসের এই অবস্থা হল কেন। ১৯৬৭ সালে ১৪টি আসন থেকে ৬৯-এ কমে দাঁড়াল মাত্র দুটিতে। এর ব্যাখ্যা দুটি হতে পারে, ১) ৬৭তে বামপন্থী সরকারকে ভেঙে দেওয়ায় কংগ্রেস পরাজিত হল অথবা ২) সি পি এম তথা বামপন্থীদের সাংগঠনিক শক্তি ছিল কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশী। তবে একথাও মনে রাখা সম্ভবত জরুরী যে, শুধু মাত্র সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকাটাই সব নয়, কিছুটা আদর্শগত ভিত্তিও প্রয়োজন। বামপন্থীদের মধ্যে এই দুটিই বোধহয় প্রয়োজনীয় মাত্রায় ছিল, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বামপন্থীদের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ছিলেন এবং তাদের প্রধান দুই স্তম্ভ ছিল শ্রমনীতি এবং ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর।

১৯৬৯ সালের সার্বিক রাজ্য পরিস্থিতিও দেখে নেওয়া যাক। মোট আসন ২৮০, সি পি এম ৮০, ফঃ বঃ ২১, আর এস পি ১২, সি পি আই ৩০, কংগ্রেস ৫৫, মুসলিম লীগ ৩, এস ইউ সি ৭ এবং অন্যান্য (বাংলা কংগ্রেস সহ) ২৯। অর্থাৎ গোটা রাজ্যেই

কংগ্রেসের অবস্থা খুব খারাপ। বর্ধমান জেলাও গোটা রাজ্যের মতই এক ছক অনুসারে ভোট দেন। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশী দিন স্থায়ী হল না। এর কারণ বাংলা কংগ্রেস, আর এস পি, ফঃ বঃ এস ইউ সি প্রভৃতির সঙ্গে সি পি এমের মত বিরোধ এবং আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যাপার যা মোটামুটি সবারই জানা। তা সত্ত্বেও একটা কথা বলা প্রয়োজন যে বিরোধী পক্ষ যেন তেন প্রকারেণ সরকারকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করবেই কিন্তু তা কখনই একটা সরকারকে ফেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয় যদি না সরকার পক্ষের মধ্যে থাকে অনৈক্য। ফলে কংগ্রেস মাত্র ৫৫টা আসন পাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ১৩ মাসের বেশী স্থায়ী হল না। মাত্র এক বছরের মধ্যে প্রয়োজন হল তৃতীয় নির্বাচনের।

১৯৭১ ঃবর্ধমান আবারও বামপন্থীদের

বিরক্ত মানুষের মধ্যে তাই প্রশ্ন দেখা দিল এত নির্বাচনের প্রয়োজন হচ্ছে কেন ? বলা বাহুল্য ছোট বা মাঝারি দলগুলি রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে এমনভাবেই দর কষাকষি চালাচ্ছিল যাতে শাসক গোষ্ঠীর বৃহত্তম দলকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হত সরকার বাঁচানোর জন্যে। ছোট দলগুলির এই নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরক্ত ভোটদাতারা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই আসেন যে কংগ্রেস এবং সি পি এম ছাড়া আর কাউকে ভোট দেওয়া অর্থহীন। ফলে ১৯৭১-এর নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস পেল ১০৫টি, সিপিএম ১১৩, সিপিআই ১৩, ফঃ বঃ ৩টি, আর এস পি ৩টি। আর বর্ধমান জেলায় চিত্র ছিল এরকম - মোট আসন ২৫টি, তার মধ্যে সি পি এম ২২ কংগ্রেস ১টি, ফঃ বঃ মাঃ ১টি এবং ১টি আসনে (উখরা) নির্বাচন হয়নি। বাংলা কংগ্রেস এস এস পি, পি এস পি প্রভৃতি দলগুলি একেবারে মুছে গেল বর্ধমান জেলা থেকে। আর এস পি, ফঃ বঃ, সি পি আই প্রভৃতি একই সঙ্গে কংগ্রেস এবং সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে বুঝে গেল এ জেলায় তাদের পক্ষে কোন আসনে জেতা সম্ভব নয়। ওদিকে কংগ্রেসও দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে ১৯৬৭ এ মোরারজী দেশাই, নিজলিঙ্গাপ্পা প্রভৃতির সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর মত পার্থক্য ঘটে এবং সৃষ্টি হয় আদি কংগ্রেস এবং নব কংগ্রেস। নব কংগ্রেসই কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকে এবং কংগ্রেসের বৃহত্তম অংশ ইন্দিরা গান্ধীর পাশে দাঁড়ান। ১৯৬৭ তে যেমন সি পি আই সি পি এম পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামে ১৯৭১-এ তেমনি দুই কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ল। ফলাফল স্পষ্ট, সাধারণ মানুষ স্বীকৃতি দিলেন ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামী কংগ্রেস এবং সি পি এম কে। যদিও রাজ্যস্তরে ৬৯এর তুলনায় কংগ্রেসের আসন বাড়ল অনেক। দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় সমান সংখ্যক আসন পেল বিধান সভায়। অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে জোড়াতালি দিয়ে কংগ্রেস একটা সরকার গঠন করল বটে কিন্তু তিন মাস পরেই বোঝা গেল এ সরকার চলাতে পারে না। রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হল এবং পাঁচ বছরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের নির্বাচন, যার ফলাফল সি পি এম কখনই জন সাধারণের মনোভাবের প্রতিফলন বলে মনে করে না, কারণ তাদের মতে এই নির্বাচনে অস্বাভাবিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, গোছা গোছা ব্যালটে ফল্স্ ভোট দেওয়া হয়েছে। প্রাসংগিক প্রমাণ সহকারে এই অভিযোগের বিচার করা সম্ভব নয়, তবে ১৯৫২, ৫৭, ৬২, ৬৭ এবং ৬৯-এর নির্বাচনী ফলাফলকে মাথায় রেখে এবং ১৯৭১ সালের ফলকে পাশাপাশি রেখে বরং অভিযোগের যৌক্তিকতা বিচারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

১৯৭১ এবং বাহাত্তরের ভোট : অস্বাভাবিক ফলাফল

কেন্দ্র	১৯৭১		১৯৭২		
হীরাপুর	সি, পি, এম	১৮,৬০৩	সি, পি, এম	১৮,০৬৮	(বামাপদ মুখার্জী)
	কংগ্রেস	৯,৯৪৫	কংগ্রেস	১৯,০৬৮	(তৃপ্তি আইচ)
	সি, পি, আই	১১,১৪৩	এস, এস, পি	২,০৮১	
	আদি কং	১,১৪৪			
	বাং কং	৩৫৭			
কুলটি	কংগ্রেস	১২,৮২৮	কংগ্রেস	১৬,৬৮৭	(বাম দাস ব্যানার্জী)
	সি, পি, এম	১০,৫০৯	সি, পি, এম	৮,৫৪১	(চন্দ্রশেখর মুখার্জী)
	বাং কং	৪,২৭২	এস, এস, পি	২,৮৩২	
	এস, এস, পি	৩,৬৭৮			
	আদি কং	১,৩৪৯			
বারাবনী	সি, পি, এম	২০,২১১	সি, পি, এম	১১,১৫০	(সুনীল বসু রায়)
	কংগ্রেস	১৩,৮৭৭	কংগ্রেস	২৯,২১৪	(সুকুমার ব্যানার্জী)
	সি, পি, আই	৫,৬০৮			
আসানসোল	সি, পি, এম	১৯,০৬৩	সি, পি, এম	১৫,৯৪০	(বিজয় পাল)
	সি, পি, আই	১৮,৩০৫	সি, পি, আই	২৪,০২১	(নিরঞ্জন ডিহিদার)
	আদি কং	৫,২৬৩			
রাণীগঞ্জ	সি, পি, এম	৩২,১৬১	সি, পি, এম	২১,৮৪০	(হারাধন রায়)
	কংগ্রেস	৭,৭৫১	কংগ্রেস	১৩,৫৯৮	(রবীন্দ্র নাথ মুখার্জী)
	সি, পি, আই	৬,৭৭৩			
জামুরিয়া	সি, পি, আই	১৫,৩৯৮	সি, পি, এম	১০,৩৯০	(দুর্গা দাস মণ্ডল)
	কংগ্রেস	১০,৪৪৮	কংগ্রেস	১৪,৫০৮	(অমরেন্দ্র মণ্ডল)
	এস, এস, পি	১,২৬২			
উখরা	নির্বাচন হয় নি		সি, পি, এম	১৩,৪৯০	(লক্ষণ বাগদী)
১৯৬৯	সি, পি, এম	১৮,১৪৪	কংগ্রেস	২১,৩২৯	(গোপাল মণ্ডল)
	কংগ্রেস	১৫,৮৯৯			
দুর্গাপুর	সি, পি, এম	৪০,৯৯৯	সি, পি, এম	১৩,৪৯০	(দিলীপ মজুমদার)
	আদি কং	৩৬,২২৩	কংগ্রেস	৪৭,৩৯০	(আনন্দ গোপাল মুখার্জী)
	সি, পি, আই	৬,২১০			

ফরিদপুর	সি, পি, এম	১৭,৩৫৬	সি, পি, এম	১৮,৮৪০	(তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
	কংগ্রেস	৯,১৬০	কংগ্রেস	২১,২৭৪	(অজিত ব্যানার্জী)
	সি, পি, আই	৭,০৩৬			
	আদি কং	৫,৫০১			
আউসগ্রাম	সি, পি, এম	২৮,৪৪৫	সি, পি, এম	২৪,০২১	(শ্রী ধর মালিক)
	বাং কং	১৭,৮৪৯	কংগ্রেস	২৩,৬৯২	(বংশীধর সাহা)
	সি, পি, আই	৩,৭০৪			
ভাতার	সি, পি, এম	১৮,৫১৬	সি, পি, এম	১১,৯৭৪	(অনাথ বন্ধু ঘোষ)
	বাং কং	১২,৪৭৭	কংগ্রেস	৩১,৮২২	(ভোলা নাথ সেন)
	সি, পি, আই	৫,৩৯৯			
	আর, এস, পি	২,৫৯৫			
গলসী	সি, পি, এম	২১,২৯৯	সি, পি, এম	১৮,১৪৫	(অনিল রায়)
	বাং কং	১২,৩১৪	সি, পি, আই	২২,৪১৬	(অশ্বিনী রায়)
	ফঃ বঃ	২,৫৯৮			
	আদি কং	১,৪৪৩			
বর্ধমান উ ঃ	সি, পি, এম	৩৩,৯৫৪	সি, পি, এম	১৭,৫৯৫	(দেবব্রত দত্ত)
	কংগ্রেস	১৮,৪৩০	কংগ্রেস	৩৬,৮০৮	(কাশী নাথ তা)
	ফঃ বঃ	১,৩৪৯			
বর্ধমান দ ঃ	সি, পি, এম	২৮,২৫৭	সি, পি, এম	১৮,৫৪৪	(বিনয় চৌধুরী)
	কংগ্রেস	২৬,৯৮৫	কংগ্রেস	৪৭,০৯২	(প্রদীপ ভট্টাচার্য)
	আদি কংগ্রেস	৮১৮			
	নির্দল	৩৯৪			
খণ্ডঘোষ	সি, পি, এম	২২,৮৭১	সি, পি, এম	১৭,৪৫১	(পূর্ণ চন্দ্র মালিক)
	কংগ্রেস	১৭,৫৮৮	কংগ্রেস	২৯,৪৬৩	(মনোরঞ্জন প্রামাণিক)
	আর, এস, পি	২,৪০৩			
রায়না	সি, পি, এম	৩১,৫৪৯	সি, পি, এম	২২,৬৭১	(গোকুলানন্দ রায়)
	কংগ্রেস	১৯,১৪২	কংগ্রেস	২৯,২৯৭	(সুকুমার চ্যাটার্জী)
	আদি কংগ্রেস	১,৬৫৬			
জামালপুর	ফঃ বঃ মা	২২,৩৯৬	ফঃ বঃ মা	১৫,৯৩৫	(নরেন্দ্র সরকার)

	কংগ্রেস	১৮,৭১৩	কংগ্রেস	৩০,৮২৭	(পুরঞ্জয় প্রামাণিক)
মেমারী	সি, পি, এম	৩৯,৩৬৫	সি, পি, এম	১১,২৩৯	(বিনয় কোঙার)
	কংগ্রেস	২১,১৬৬	কংগ্রেস	৫৩,১১৯	(নব কুমার চট্টোপাধ্যায়)
কালনা	সি, পি, এম	৩২,৮৯৬	সি, পি, এম	৯২৯	(দিলীপ দুবে)
	কংগ্রেস	২৪,৯৩০	কংগ্রেস	৬২,৩৩৬	(নুরুল ইসলাম)
	আদি কংগ্রেস	১,৭৫৪			
মন্তেশ্বর	সি, পি, এম	২৯,৭৫০	সি, পি, এম	৫,১৫৯	(কাশী নাথ হাজরা চৌধুরী)
	কংগ্রেস	১৭,৬৭২			
	বাং কং	১,৯৭০	কংগ্রেস	৫৩,৭৬৮	(তুহীন সামন্ত)
পূর্বস্থলী	সি, পি, এম	৩০,৬১৭	সি, পি, এম	১৪,৭৪৬	(মোল্লা হুমায়ুন কবীর)
	কংগ্রেস	২৫,২৯২	কংগ্রেস	৩২,৪৮৬	(নুরুন্নেসা সাত্তার)
কাটোয়া	সি, পি, এম	২৭,৬৫৯	সি, পি, এম	২১,৭০৩	(ডাঃ হরমোহন সিংহ)
	কংগ্রেস	২০,৯৯০	কংগ্রেস	৩৩,০৬১	(সুব্রত মুখার্জী)
	আদি কং	১,৯১৬			
মোঙ্গল কোট	সি, পি, এম	২৮,৮১৪	সি, পি, এম	১৮,১১৮	(নিখিলানন্দ সর)
	বাং কং	১৬,৮১৪	কংগ্রেস	২৫,৩৭৯	(জ্যোতির্ময় মজুমদার)
কেতুগ্রাম	সি, পি, এম	১৮,৪০৮	সি, পি, এম	১৭,৪৮৩	(দীনবন্ধু মজুমদার)
	কংগ্রেস	১৭,৪৮২	কংগ্রেস	৩০,০৪৪	(প্রভাকর মণ্ডল)
	সি, পি, আই	৫,৭৯৭			

ওপরের সারণি থেকেই অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে যায়, বিশেষত : কালনা কেন্দ্রের দিকে তাকালে। বস্তুত আসানসোলের শিল্পাঞ্চলকে বাদ দিলে সর্বত্র ১ বছরের মধ্যে যে ফলাফলের পার্থক্যটা চোখে পড়ে তার ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। দুর্গাপুর কেন্দ্রের পরিবর্তনটাও লক্ষণীয়। যে ফলাফলের ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল তার রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করাটা নিরর্থক হতে পারে।

১৯৭২-এ সি, পি, আই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে নামে। গ্রামাঞ্চলে বিশেষতঃ কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় ভোটে সবথেকে বেশী অস্বাভাবিক ফলাফল হয়। তুলনায় শিল্পাঞ্চলে অনেকাংশে বৈধ নির্বাচন হয়েছিল দেখা যাচ্ছে।

১৯৭৭ ঃ কংগ্রেস আবার মুছে গেল নির্বাচনী মানচিত্র থেকে

১৯৭২ পর পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন হয় ১৯৭৭ সালে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরী অবস্থা জারি হয়। তোলা হয় ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে। এই জরুরী অবস্থা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক বিতর্কিত অধ্যায়। শ্রীমতী গান্ধীকে পর্যন্ত দিল্লীর ক্ষমতা থেকে সাময়িকভাবে সরে যেতে হয়। ১৯৭৭-এর মার্চে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মাত্র লোকসভায় ১৫৪ টি আসন পেল, জনতা পার্টি দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা পেয়ে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত হয়। তার পরই বহু বিধানসভার নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। পঃ বঙ্গে তখন তিন প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং জনতা। লোকসভা নির্বাচনে জনতা বামফ্রন্ট আসন রফা হয়েছিল, তাবই জের টেনে পঃ বঙ্গের জনতা নেতা বিশেষতঃ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন বেশীর ভাগ আসনে জনতা প্রার্থী দেবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সে প্রস্তাব মেনে নেয় নি, বরং তারা উল্টো প্রস্তাব দেন, অর্থাৎ জনতাকেই তারা ছোট শরিক হিসাবে পেতে চান। দু পক্ষই অনড় থাকায় শেষ পর্যন্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বলাই বাহুল্য কংগ্রেসের সংগঠনের অবস্থা তখন শোচনীয়। তা সত্ত্বেও খুবই ঔৎসুক্যের সঙ্গে সবাই অপেক্ষা করেন, কেন্দ্রে সর্বপ্রথম এক অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা কাকে জয়মাল্য পরিয়ে দেন। বর্ধমান জেলাতেও সেই একই ব্যাপার। দেখা যাক ১৯৭৭-এর চিত্রটা কি।

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত %
১	কুলটি	৯১৭৮০	৩৭৩৫৮	মধু ব্যানার্জী মাঃ ফঃ বঃ	৩৪.৩	শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৩৩.৩
২	বারাবনী	১০৩৮২৩	৪৬৫১২	এস বি রায় (সি, পি, এম)	৪৯.৬	সুকুমার ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৩৪.৫
৩	হীরাপুর	৯২৭০০	৪১৭৭৫	বামাপদ মুখার্জী (সি, পি, এম)	৫৮.৬	শান্তিময় আইচ (কংগ্রেস)	২২.৪
৪	আসানসোল	১০৪৭২৮	৩৮১৭০	বিজয় পাল (সি, পি, এম)	৪৬.৬	জি আর মিত্র (জনতা)	৩৩.৫
৫	রাণীগঞ্জ	৯৭৯৫৩	৪২৩৮৯	হারাধন রায় (সি, পি, এম)	৫৯.৪	এস মুখার্জী (কংগ্রেস)	১৪.৯
৬	জামুরিয়া	৯০৭২৮		বিকাশ চৌধুরী (সি, পি, এম)	৫২.২	চন্দ্র শেখর ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	২৩.১
৭	উখরা	৯৯৬৩৯	৪২৪০৩	লক্ষণ বাগদী (সি, পি, এম)	৫২.৬	গোপাল মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩০.৮
৮	দুর্গাপুর-১	১২৩০৫৯		দিলীপ মজুমদার (সি, পি, এম)	৫৯.৩	টি ডি গুপ্ত (কংগ্রেস)	২১.৪
৯	দুর্গাপুর-২	১৪৪৭১৫	৫৪২৬৯	তরুণ চ্যাটার্জী	৬৪.১	অজিত ব্যানার্জী	২২.৩

				(সি, পি, এম)		(কংগ্রেস)	
১০	কাঁকসা	৮০৪১১	৪৫৯৪৯	এস এন সাহা (সি, পি, এম)	৬৩.৫	এস কে সাহা (কংগ্রেস)	২২.০
১১	আউসগ্রাম	৮৬৩১৯		শ্রীধর মালিক (সি, পি, এম)	৬৩.৫	মদন লোহার	১৮.৩
১২	ভাতার	৮৮০৪৭	৫২৮৫২	ভোলানাথ সেন (কংগ্রেস)	৫৬.৫	এস পি চ্যাটার্জী (এফ এব এল)	৩৯.৭
১৩	গলসী	৮৫৪১৩	৪৩৬২৩	দেবরঞ্জন সেন ফঃ বঃ	৬২.৩	নিরদেন্দু কোঙার	১৮.৯
১৪	বর্ধমান (উঃ)	৯৪৭১৪	৫৫৫১৬	ডি এন তা (সি, পি, এম)	৬৫.৫	এস সি দাঁ (কংগ্রেস)	২০.৮
১৫	বর্ধমান (দঃ)	১৩১১৯৮		বিনয় চৌধুরী (সি, পি, এম)	৫১.৮	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	২৯.৮
১৬	খণ্ডঘোষ	৮২৭৪৩		পূর্ণ চন্দ্র মালিক (সি, পি, এম)	৫৯.৩	মনোরঞ্জন প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩০.৮
১৭	রায়না	৯০২৩১	৫৩০৪৪	রাম নারায়ণ গোস্বামী (সি, পি, এম)	৬৩.৪	এ কে ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	২২.৩
১৮	জামালপুর	৮০৫৪৭	৪৩৪৯৩	সুনীল সাঁতরা (ফঃ বঃ মাঃ)	৪৮.০	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৩.৩০
১৯	মেমারী	৯৫৫০১	৫৬৭২০	বিনয় কোঙার (সি, পি, এম)	৬৫.২	এস এন পাল (জনতা)	১৭.৮
২০	কালনা	৮৯৩৪২	৫৭৬২১	জি এস রায় (সি, পি এম)	৫৬.১	ডি বি ঘোষ (জনতা)	২৩.০
২১	নাদনঘাট	৮২৩৬৫	৫৫৩৭০	এস এ এম হবিবুল্লাহ (সি, পি, এম)	৬৫.৭	বিশ্বনাথ বসু (কংগ্রেস)	২২.৯
২২	মন্তেশ্বর	৮৬৩৭২	৫০২৭৯	এইচ কে রায় (সি, পি, এম)	৬৩.৬	তুহীন সামন্ত	২৪.১
২৩	পূর্বস্থলী	৮৩৫০৮	-	মনোরঞ্জন নাথ (সি, পি, এম)	৬৬.০	রমা দেবী (জনতা)	২৩.১
২৪	কাটোয়া	৯৬৮৫৮	৬০৩৩২	এইচ এম সিনহা (সি, পি, এম)	৬১.২	এন ঠাকুর (জনতা)	২১.২
২৫	মঙ্গলকোট	৮১৩২২	৪৯৭২৭	নিখিলানন্দ সর (সি, পি, এম)	৬০.৮	মদন চৌধুরী (জনতা)	২৮.৮
২৬	কেতুগ্রাম	৮৬০৩৪	৪৮১৪১	রাই চরণ মাজি	৬০.৮	প্রভাকর মণ্ডল	১৯.৫

(সি, পি, এম) (কংগ্রেস)

১৯৭৭ সালে জনতা সরকার কেন্দ্রে আসার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বর্গত চরণ সিংহের উদ্যোগে ৯টি রাজ্য বিধান সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বেশীর ভাগের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং বাকীদের অল্প সময় বাকী ছিল। উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা , মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে জনতা দল রাজ্য সরকার গঠন করে কেন্দ্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, কিন্তু ব্যতিক্রম এই পশ্চিম বঙ্গ। এখানকার মানুষ রাজ্যের ক্ষমতার জন্য বামফ্রন্টকে নির্বাচিত করেন। ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল বটে তবে তাতে বামফ্রন্টের ফলাফলে বিশেষ পরিবর্তন আসে নি, কেন্দ্র ওয়াড়ি শতকরা ভোটের হার এর প্রমাণ। বরং লড়াইটা হয় দ্বিতীয় স্থানের জন্য কংগ্রেস এবং জনতার মধ্যে। এ লড়াই-এও জনতা পার্টি হেরে যায়। এ জেলায় মাত্র পাঁচটি কেন্দ্রে জনতা দল দ্বিতীয় হয়। শুধু ভাতার কেন্দ্রটিতে কংগ্রেস প্রার্থী তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন বিজয়ী হন। বাকী ২৫টি কেন্দ্রেই বামফ্রন্ট বিজয়ী এবং তার মধ্যে ২২টি শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ভোট পেয়ে এবং ১২টি কেন্দ্রে শতকরা ৬০ ভাগের বেশী ভোট পেয়ে। এই ফলাফলের কারণ সম্ভবত জনতা ও সি, পি, এমের আদর্শ এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার পার্থক্যের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে সি, পি, এম একাই পায় ১৭৭ টি আসন। ১৯৬৯তেও সি, পি, এম একক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও সরকার গঠনের জন্য ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এবারে আর সে ব্যাপার ছিল না। ফলে বামপন্থী মনোভাবের পরিচায়ক সমস্ত নীতিমূলক সিদ্ধান্ত এবং তার রূপায়ণ এই সরকারের আমলেই দ্বিধাহীন ভাবে শুরু হয়। ভূমি সংস্কার হচ্ছে বর্তমান বামফ্রন্টের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালের নির্বাচনী ফলাফল সম্ভবত বাম মনোভাবের ওপর সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বীকৃতিকেই প্রতিফলিত করে। তা ছাড়া ১৯৬৭-৭৭ এই সময়ে যে রাজনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতা ছিল, তা দূর হয়ে সুস্থিতি ফিরে আসে। শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে বামফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা মূলত এই সুস্থিতির কারণেই। ১৯৮২ এবং ৮৭ তেই তাই প্রায় একই ফলের পুনরাবৃত্তি ঘটে এই রাজ্যে এবং বর্ধমান জেলায়।

১৯৮২		১৯৮৭	
কুলটি ৯১৮৮৪ / ৬৪২০০		১৩১,৩৭৫ / ৭১৫০০	
মধু ব্যানার্জী (ফঃ বঃ)	৫১.৪ %	তুহীন সামন্ত (কংগ্রেস)	৩৯২৯০
জি ডি নাগ (কংগ্রেস)	৩৯.৫ %	মধু ব্যানার্জী (ফঃ বঃ)	২৯১৩১
বারাবনী ১০৮১৪৫ / ৭১৮৬৭		১৩২,২৫৯· / ৯৩৫৫৬	
অজিত চক্রবর্ত্তী (সি, পি, এম)	৫২.৪%	অজিত চক্রবর্ত্তী (সি, পি, এম)	৪৪,৪৪৮
ধীরাজ সাঁই (কংগ্রেস)	৩৪.৫%	মানিক উপাধ্যায় (কংগ্রেস)	৪১,৯৮৯
হীরাপুর ১০১০৯৭ / ৬৫৭৬৮		১৩২,২৫৯ / ৯৩,৫৫৬	
বামাপদ মুখার্জী (সি, পি, এম)	৫১.৫%	সুহৃদ বসু মল্লিক (কংগ্রেস)	৪২,৪৯০

শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৪৫.০%	বামাপদ মুখোপাধ্যায় (সি, পি, এম)	৩৬,৮৫৬
আসানসোল ১১২০৭৪ / ৬৭৬৫৭		১৩৪,৭৪৭ / ৮০৪৮৫	
বিজয় পাল (সি, পি, এম)	৫২.৭%	প্রবুদ্ধ লাহা (কংগ্রেস)	৩৮১৪৩
সুকুমার ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৪৫.৭%	গৌতম রায় চৌধুরী (সি, পি, এম)	৩৬৬৫১
রাণীগঞ্জ ১০৭৩১৪ / ৭১৩৫১		১৩৩১৮৫ / ৮৯১৬৬	
হারাধন রায় (সি, পি, এম)	৫৮.৩%	বংশ গোপাল চৌধুরী (সি, পি, এম)	৫৫৯৮৮
এইচ কে গোস্বামী (কংগ্রেস)	৩৩.৮%	কল্যাণী বিশ্বাস (কংগ্রেস)	২৮৫৯৩
জামুরিয়া ১০৩০৭১ / ৭১৫৭০		১৩২৩৩৬ / ৯২৪৯০	
বিকাশ চৌধুরী (সি, পি, এম)	৫২.৪%	বিকাশ চৌধুরী (সি, পি, এম)	৫৩১৮৪
পি ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৪৪.২%	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (কংগ্রেস)	৩১৫০৬
উখরা ১১৬৪৩২ / ৬৮৪৯৫		১৭৮৩১০ / ১০৬৬১৭	
লক্ষণ বাগদী (সি, পি, এম)	৫১.১%	লক্ষণ বাগদী (সি, পি, এম)	৫২৮৭৯
হারাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৪.৫%	হারাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৬৪৩৫
দুর্গাপুর - ১ ১০০৭৭ /৭৩৯৫২		১২০৩৬৪ / ৯০৬৬৯	
দিলীপ মজুমদার)সি, পি, এম)	৪৮.৬%	দিলীপ মজুমদার (সি, পি, এম)	৪৬১৭০
সুদেব রায় (কংগ্রেস)	৪৩.৯%	সুদেব রায় (কংগ্রেস)	৩৯০৫৫
দুর্গাপুর - ২ ১৩৯৪৩৫ /৯৭৮৫৯		১৭২১৯৮ / ১২২৬১৬	
তরুণ চ্যাটার্জী (সি, পি, এম)	৫৫.১%	তরুণ চ্যাটার্জী (সি, পি, এম)	৬৭,১০৭
বরেণ রায় (কংগ্রেস)	৪১.৫%	নারায়ণ হাজরা (কংগ্রেস)	৪৯,৯৩৬
কাঁকসা ৯৬১৯৬ / ৭৬৭১২		১১৫৯৬৫ / ৮৯৬১২	
এল এন সাহা (সি, পি, এম)	৬৩.৩%	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (সি, পি, এম)	৫৭৪৬৪
এস এন সাহা (কংগ্রেস)	৩১.৩%	সমীর সাহা (কংগ্রেস)	৩০২৬৯
আউস গ্রাম ৯৯০১৯ / ৮০৮৫৯		১২৪০৬৮ / ৯৫২৬৬	
শ্রীধর মালিক (সি, পি, এম)	৬৭.৪%	শ্রীধর মালিক (সি, পি, এম)	৬৫৬১১
সি কে মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩১.৩%	বিশ্বম্ভর সাহা (কংগ্রেস)	২২২৪৫
ভাতার ১০৪৭৯৪		১২৩৭৮১ / ৯৭৪২৬	
সৈয়দ মহম্মদ মসীহ (সি,পি,এম)	৫৪.১%	সৈয়দ মহম্মদ মসীহ (সি, পি, এম)	৫৫৯৫৮
ভোলানাথ সেন (কংগ্রেস)	৪৫.৫%	বনমালী হাজরা (কংগ্রেস)	৩৮৪৯৩

গলসী ৯৭৮৩৪ / ৭৯৩৯৬		১১৯২৯৩ / ৯২৯৮৯	
দেবরঞ্জন সেন (ফঃ বঃ)	৫৯.০%	দেবরঞ্জন সেন (ফঃ বঃ)	৫৭৩০৩
এইচ বি রায় (কংগ্রেস)	৩৬.৪%	অজিত ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৩০৫৬৫
বর্ধমান (উঃ) ১১২৩৯৯ / ৮৯১২৪		১৩৯৪৯২ / ১০১৪১৩	
রামনারায়ণ গোস্বামী (সি,পি,এম)	৬৫.২%	বিনয় চৌধুরী (সি, পি, এম)	৬৫৭০৪
এল এন রেজ (কংগ্রেস)	৩৩.১%	সন্তোষ সাহা শিকদার (কংগ্রেস)	৩৭৪৭৭
বর্ধমান (দঃ) ১৩১৫২৯ / ৮৮৬৭৫		১৫৪২১৫ / ১১৪১৪০	
বিনয় চৌধুরী (সি, পি, এম)	৫১.১%	নিরূপম সেন (সি, পি, এম)	৬০০২৭
এস ডি ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৪৭.১%	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৪৮০৬৯
খণ্ডঘোষ ৯৪০৬৮ / ৮০৯৪৯		১১১৭১১ / ৯১৩৬০	
পূর্ণ চন্দ্র মালিক (সি,পি,এম)	৬০.৬%	শিবপ্রসাদ দলুই (সি, পি, এম)	৫৯২১২
মনোরঞ্জন প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৯.৪%	প্রমথ নাথ ধীবর (কংগ্রেস)	৩০৮৯৭
রায়না ১০০৬৯০ / ৮১৮৩১		১১৫৫৩৪ / ৯১৫৫২	
ধীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী (সি,পি,এম)	৬৫.৪%	ধীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী (সি,পি,এম)	৫৯৫৬৫
এস চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩২.৭%	উদয় শঙ্কর সাঁই (কংগেস)	৩০০২৪
জামালপুর ১০৩২৫৪ / ৮৬৫৪০		১২২৫২৪ /. ১০২১৮৮	
সুনীল সাঁতরা (মাঃ ফঃ বঃ)	৫৭.০%	সুনীল সাঁতরা (মাঃ ফঃ বঃ)	৫৮৪৭৯
পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৪০.৯%	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৯৩৪৩
মেমারী ১১৪২৬৮ / ৯৩০৬২		১৪৪১৮২ / ১১৬৬৮৪	
মহারাণী কোনার (সি,পি,এম)	৬৩.৯%	মহারাণী কোনার (সি, পি এম)	৭৩৫২১
এস সামন্ত (কংগ্রেস)	৩৫.৭%	নব কুমার চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৯৯০৪
কালনা ১০৩৯৬২ / ৮৫৭৯৪		১২০৯৯৬ / ৯৯৩৯৭	
অঞ্জু কর (সি, পি, এম)	৫৬.৮%	অঞ্জু কর (সি, পি, এম)	৫৯০৯২
সুধীর ঘোষ (কংগ্রেস)	৪০.৮%	ধীরেন চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৬৯৭৮
নাদন ঘাট ১০৪০৯৯ / ৮৮০৬২		১২৬৯৪৯ / ১০৬২৪৯	
সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ (সি, পি, এম)	৫৮.৩%	সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ (সি, পি, এম)	৬০,৩৯৬
পরেশ চন্দ্র গোস্বামী (কংগ্রেস)	৩৯.৭%	স্বপন কুমার দেবনাথ (কংগ্রেস)	৪৩,১৩২

মন্তেশ্বর ১০২৪৩৭ / ৭৬২৫৫		১২৩৪৭৮ / ৯২৭৮৪	
এইচ কে রায় (সি, পি, এম)	৬০.৫%	হেমন্ত কুমার রায় (সি,পি,এম)	৫৫,২৫৭
পি, সি, গোস্বামী (কংগ্রেস)	৩৯.৭%	গৌর গোপাল রায় (কংগ্রেস)	৩১,৭৯১
পূর্বস্থলী ৯৮৭২১ / ৭৮০৫২		১১৯০২৬ / ৯৩৩২৫	
মনোরঞ্জন নাথ (সি, পি, এম)	৫৪.৬%	মনোরঞ্জন নাথ (সি, পি, এম)	৫১০৩৮
মুকুল ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৪৩.১%	মুকুল ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৩৭০৭৫
কাটোয়া ১১১১৫৮ / ৮৫৬৭৬		১২৮৬৭৬ / ১০০০৯১	
এই এম সিনহা (সি,পি,এম)	৫৩.৩%	অঞ্জন চ্যাটার্জী (সি,পি,এম)	৫৩২৩৩
এস মুখার্জী (কংগ্রেস)	৪৩.১%	রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৪২৭৪১
মঙ্গলকোট ১০০১৪৮ / ৭৯৬৫৬		১২২৫৯৩ / ৯১১৮৯	
নিখিলানন্দ সর (সি,পি,এম)	৬২.২%	নিখিলানন্দ সর (সি,পি,এম)	৫৬৮৬০
শেখ বোরশেদ (কংগ্রেস)	৩৭.০%	জগদীশ দত্ত (কংগ্রেস)	২৭৩৭০
কেতুগ্রাম ১০১৪৬৮ / ৭৯০৪২		১২১২৭৯	
রাইচরণ মাজি (সি,পি,এম)	৫৬.৪	রাইচরণ মাজি (সি,পি,এম)	৫৮৮৬৮
এল এন সিনহা (কংগ্রেস)	৪৩.৬	প্রভাকর মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩৩৫৮৮

উপসংহার : উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বর্ধমান জেলার রাজনীতির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৮৯ এই ৩৭ বছরে এ জেলার রাজনীতির মেরুভবন সম্পূর্ণ হয়েছে। একদিকে সি, পি, এম অন্যদিকে কংগ্রেস - মাঝখানে অন্যকোন দলের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সি, পি, আই এবং ফরোয়ার্ড ব্লককে এখানে একান্তভাবেই নির্ভর করতে হয় সি, পি, এম এর উপর। অন্যদিকে জনতা ও প্রাক্তন স্যোসালিষ্টরা কংগ্রেসে ফিরে গেছেন। ১৯৬৪-এর কম্যুনিষ্ট পার্টীর বিভাজন এবং ১৯৬৯ এর নকশাল অভ্যুদ্যয় জেলার সি, পি, এম এর শক্তি কমাতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী বীরভূম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতে প্রবল নকশাল আন্দোলনের প্রভাব এ জেলায় পড়েনি। বর্ধমানকে কেন্দ্র করেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বীরভূম জেলায় বামপন্থীদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে এবং এখনও এরাজ্যে বামপন্থীদের প্রধান শক্তি রাঢ় অঞ্চলেই সর্বাধিক। অর্থাৎ কৃষিপ্রধান এলাকাতে বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ মুখার্জী, মনসুর হবিবুল্লাহর মত বামপন্থী নেতারা এই জেলা থেকেই উঠে এসে রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করেছেন। অন্যদিকে যাদবেন্দ্র পাঁজা, আবদুস সাত্তার এবং নারায়ণ চৌধুরীর মত জননেতা বর্ধমান জেলা কংগ্রেসে না থাকায় জেলায় কংগ্রেসের জনভিত্তি কমে গেছে।

১৯৬৭ তে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন কংগ্রেসের বিপক্ষে রায় দিয়েছে বর্ধমান জেলা তখন কংগ্রেসকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে। আবার ১৯৭১-এ কংগ্রেস যখন ১৯৬৯ এর ধাক্কা সামলিয়ে অনেকখানি হারানো জমি ফিরে পেয়েছে সে সময় বর্ধমান উল্টোপথে হেঁটেছে - কংগ্রেসকে মাত্র ১ টি আসন দিয়েছে। ১৯৭৭-এ একটি, ১৯৮২ তে একটি আসনও নয় আবার ১৯৮৭ তে চারটি (উপনির্বাচনে কংগ্রেস ১ টি আসন পায় বারাবনীতে) পেয়েছে। শিল্পাঞ্চলেই এই সাফল্য সীমাবদ্ধ যদিও ১৯৮২ এবং ১৯৮৭ তে কংগ্রেসের ভোটের হার বৃদ্ধির মুখে। মনে হচ্ছে বামফ্রন্ট বিরোধী কিছু নঞর্থক ভোট কংগ্রেসের পক্ষে যাচ্ছে।

এছাড়া সমস্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে :

১) বর্ধমান জেলায় প্রতিটি কেন্দ্রই নিদেনপক্ষে একবার হাতবদল হয়েছে।

২) বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে কোনো দলেরই রাজনৈতিক আধিপত্য স্থায়ী হয়নি।

৩) জেলার গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীদের আধিপত্য সুদৃঢ় হয়েছে।

৪) কংগ্রেস এবং সি, পি, এম - উভয় পক্ষেরই একটা নির্দিষ্ট ভোট ব্যাংক আছে যার পরিমাণ শতকরা ৩০ এর নীচে কখনই নামে নি - ১৯৭৭ ছাড়া। কংগ্রেস ভোট ব্যাংকে বামপন্থীরা এখনও ফাটল ধরাতে পারে নি।

খুব স্বাভাবিক কারণেই এই আলোচনা ও বিশ্লেষণ সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। বর্ধমানের মত একটি প্রাচীন জনপদের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা খুব সহজ কাজ নয়। শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। এখানে আমরা শুধুমাত্র বিধানসভার ভোটের পরিসংখ্যানকে সামনে রেখেই আলোচনা করেছি - এই ব্যাপারটা মনে রাখলে ভালো হবে।

বর্ধমানের ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষি পরিচয়

বিদ্যানন্দ চৌধুরী

ভূমি-স্বত্বের পূর্বকথা :

কৃষি কার্য বা চাষ বাস যেখানে হয়, সেই ক্ষেত্রকে 'কৃষিক্ষেত্র' বা চলতি কথায় জমি বলা হয়। আজকের এই জমি বা কৃষিক্ষেত্র সৃষ্টির আদিতে ছিল - অনাবাদী বন্ধুর ভূমি বিশেষ। সভ্যতার প্রারম্ভে মানুষ নিজ প্রয়োজনে এই অনাবাদী ভূমিকে চাষযোগ্য করে তোলে।

জমি স্থাবর, উৎপাদনের ক্ষেত্র, জমির ক্ষয় আছে কিন্তু বিনাশ নেই। এহেন এক মূল্যবান সম্পত্তি জমি বা ভূমির মালিক কে ? 'মনু' বলেছেন - 'রাজাই হচ্ছেন সার্বভৌম, সর্ব ভূমির মালিক'।

পরবর্তী কালে, অর্থাৎ মুসলমান যুগের আগে হিন্দু রাজাদের আমলে জমি জমার মালিকানার উপর কোন বিশেষ বিধিনিষেধ ছিল না। তখন জমিদার শ্রেণী বলেও কেউ ছিল না। প্রজারা উৎপাদিত ফসলের $\frac{১}{৬}$ অংশ 'বলি' বা 'ভোগ' রাজকোষে জমা দিত। উৎপাদিত ফসলের এই $\frac{১}{৬}$ অংশই ছিল প্রজা-রাজস্ব বা খাজনা।

"... মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম স্বত্বভোগী ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। প্রধানতঃ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখবার উৎসাহে এবং দিল্লীর মসনদের ভিত শক্ত করবার প্রয়োজনে একটি নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা হল 'জাগীরদার' নামে। ..." পূর্বভারতেও 'তালুকদারী' নামে এক শ্রেণীর জমির স্বত্বাধীকারীর উল্লেখ শোনা যায়। অষ্টাদশ শতকে বাংলা বিহার এলাকায় এই সব তালুকদারগণ মোগল শাসনাধীন এলাকায় সরাসরি রাজস্ব অর্থাৎ খাজনা আদায় দিয়া 'মাল ওয়াজির জমিদার' বলে গণ্য হয়। এই সকল তালুকদার বা মাল ওয়াজির জমিদারগণ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন।

" ... আর্য সভ্যতার যে ধারাটি হিন্দু রাজাদের আমলে বজায় ছিল তাতে জমিদার পদ ছিল না মোটেই। প্রধানতঃ রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে এবং রাজ দরবারে অনুগ্রহ প্রার্থী একটি বিশ্বাসী গোষ্ঠী তৈরী করার চেষ্টায় 'জমিদার' বা স্বত্বভোগী ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্কী সুলতানদের আমল থেকে মুঘল বংশের শেষ বংশধর পর্যন্ত যে মুঘলযুগ গেছে, তার মধ্যে চার শ্রেণীর জমিদারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা (১) জমিদার (২) জাগীরদার (৩) ইজারাদার (৪) মুকদ্দম। "

মুঘল যুগ এবং বাংলার নবাবী আমলের শেষ দিকে১৭৬০ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য কয়েকটি ভূখণ্ডের সঙ্গে 'বর্ধমান' ভূখণ্ডের স্বত্ব পায় 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌল্লার পতনের পর হতেই সুবে বাংলায় ইংরাজদের বকলমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রবরবা । প্রত্যক্ষ ভাবে রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে শাসন ক্ষমতা যাওয়ার আগে পর্যন্ত এদেশে রাজস্ব আদায়ের হকদার ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

"... 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' জমিদার শ্রেণীকে নিজ স্বত্বের অপরিপন্থী সবরকমের লীজ দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দশসালা বন্দোবস্তর ৫২ নং ধারায় এই ঘোষণাটি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দেই করা হয়েছিল। বর্ধমান মহারাজার অধীনে এই সময় ছোট

ছোটি তালুক পত্তন হতে আরম্ভ করে। ... বর্ধমান রাজের দেখাদেখি এই 'পত্তনি তালুক' অন্যান্য সমস্ত জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ে । ..."

প্রকৃতপক্ষে বর্ধমানের মহারাজা রাজা ছিলেন না। তিনি বাৎসরিক একটি নির্দ্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে ইংরাজদের থেকে বর্ধমান জেলা ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদারীত্ব ক্রয় করেন। এবং নিজ জমিদার ভুক্ত অঞ্চলে উচ্চহারে জামানত ও সেলামী নিয়ে নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনার বিনিময়ে ছোট ছোট 'মোকরারী পত্তনী' চালু করেন। এই পত্তনি উত্তরাধীকারী যোগ্য হওয়ায় ইহা 'ইস্তিমরারী পত্তনি'র রূপ নেয়।

এই তালুক পত্তনি বা পত্তনিদার প্রথা এটি একান্তভাবে বর্ধমান রাজ এষ্টেটের নিজস্ব সৃষ্টি। এদের সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন ধারনাই ছিল না। যেজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এদের কোন উল্লেখই নেই। এদের সম্পত্তি বা তালুক নামে মাত্র। অবশ্য কয়েক জন পত্তনিদার ছোট ছোট অনেক তালুকের মালিক হয়ে নিজেদের জমিদার বলত, বা প্রজা ও রায়তিরাও তাদের জমিদার হিসাবে গণ্য করত। আসলে এরা হল পত্তনিদার ।

মধ্যস্বত্ত্বভোগী প্রথা : "... রেগুলেশন নং-১, ১৭৯৩ বিধিতে যাদের বলা হয়েছে অধীনস্থ তালুকদার রায়ত ও অন্যান্য প্রকৃত কৃষকশ্রেণী, এরা তার অন্তর্গত নয়। এরা একেবারে ভুঁইফোড়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যস্বত্ত্বাধিকারী। কেননা জমিদারের মতই খাজনা আদায় করার অধিকার আর রায়ত দিয়ে চাষবাস করানোর অধিকার দুইই এদের করায়ত্ত ছিল। " এইভাবে বর্ধমান রাজ এষ্টেট কর্তৃক সৃষ্টি হয় মধ্যস্বত্ত্বভোগী শ্রেণী। এই মধ্যস্বত্ত্বধিকারী শ্রেণীর হাতে রায়ত বা চাষীর কোন নিরাপত্তা ছিল না, এরা যে কোন সময়ে বে-ওজর চাষী বা রায়ত কে উৎখাত করতে পারত।

অবশেষে চাষী বা রায়ত কে অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে জমিদার বা পত্তনিদার প্রথার কুফল হতে তাদের রক্ষা করতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৫৩ সালের ৫ই মে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় 'জমিদারী অধিগ্রহণ অধিনিয়ম ১৯৫৩' বিল পেশ করা হয়। এটি আইনে পরিণত হয় ১৯৫৪ সালে। এই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের ধারাটি প্রবাহিত হতে শুরু করল একটি নতুন খাতে - ভূমি সংস্কারের যুগে। জমিদার, পত্তনিদার, মধ্যস্বত্ত্বভোগী এই ত্রিস্তর প্রথা বিলুপ্ত হয়ে রায়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তিত হল।

[বিঃ দ্রঃ * "............"* এই অংশ গুলি "পশ্চিম বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব" তারকনাথ বন্দোপাধ্যায়" এর বই থেকে সংকলিত - লেখক]

ভূমিকা :

অবিভক্ত বাংলার নদনদী দ্বারা বিধৌত জেলা বরিশালকে বাংলার শষ্য ভাণ্ডার বলা হত। দেশ বিভাগের পর এপার বাংলায় অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার শষ্য ভাণ্ডার বলে কথিত বর্ধমান জেলা। উন্নাসিক মহলে প্রচলিত আছে 'বর্ধমানের কালচার মানেই এগ্রিকালচার' । মন্তব্যটি নস্যাৎ করে দেবার মত নয়। ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশে কৃষিকে দাবিয়ে রেখে সার্বিক ও স্থায়ী উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। সেই বিচারে বর্ধমান জেলায় কৃষির প্রসার ও উন্নতি এবং রাজ্যের কৃষি মানচিত্রে বিশেষ স্থান লাভ করা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, রাজ্যের বিচারে বর্ধমান জেলা বিশেষ স্থান পেলেও সমগ্র দেশের বিচারে পাঞ্জাব

হরিয়ানা রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার কৃষিজাত ফসলের গড় উৎপাদন অনেক বেশী। এর মূল কারণ (১) জন ঘনত্ব ও (২) ক্ষুদ্র জোত। চাষের জমির আয়তন ছোট (দ্রষ্টব্য : পরিসংখ্যান - ১) হওয়ায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার সীমিত এবং যেটুকু ব্যবহার হয়, তাও যথাযথ ভাবে ব্যবহার হয় না। (৩) অধিকাংশ (প্রায় ৮০ হতে ৮৫ শতাংশ) চাষীই দরিদ্র, ফলে কৃষিতে উপযুক্ত মাত্রায় সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার করতে পারে না। বর্ত্তমানে অবশ্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই অসুবিধা গুলি দূর করার চেষ্টা হচ্ছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। জেলায় কৃষি সমবায় সমিতীর সংখ্যা নগণ্য।

জেলার ভূমির বিবরণ : (হাজার হেক্টার হি :)

ভৌগলিক আয়তন - ৭০২.৮ । বনভূমি - ৩১.০ । চাষের অযোগ্য জমি - ১৪৭.১। অন্যান্য অনাবাদী জমি - ২৬.৪ । চলতি পতিত জমি - ৬.৩ । মূল চাষযোগ্য - ৪৮৯.৩ । মোট চাষযোগ্য জমি - ৬৫২.৩ । বহু ফসলী এলাকা - ১৬৩.০ ।

(সূত্র : কৃষি সহায়িকা ১৯৭৪)

পরিসংখান - ১ ।। রাজ্য ভিত্তিক ।।

কৃষক পরিবার		মোট কৃষক পরিবারের শতকরা অংশ	অধীনস্ত মোট কৃষি-জমির শতকরা অংশ
১ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক	(প্রান্তিক চাষী)	৬০	২১.৫
১ হতে ২ হেক্টার পর্যন্ত	(ক্ষুদ্র চাষী)	২২.৩	২৫.৭
২ হতে ৪ হেক্টার পর্যন্ত	(মধ্যবিত্ত চাষী)	১৩.২	২০.০
৪ হেক্টারের বেশী	(উচ্চবিত্ত চাষী)	৪.৫	২৩.৮

মোট চাষী পরিবারে সংখ্যা - ৫৫ লক্ষ।

(সূত্র : আদম সুমারী রিপোর্ট - ১৯৭১)

[১৯৮৭ সালের পরিসংখ্যান প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হলো]

পরিসংখ্যান - ২

।। জেলার জোত জমির মালিকানা ও বন্টন ।।

জোতের আয়তন	জোতের সংখ্যা	মোট জোত শতকরা হি :	আয়তন (হেক্টার)	মোট আয়তন (হেক্টার)
০ - ১ হেক্টার পর্যন্ত	১,৬০,৯০৯	৫১ .৩৪	৭৮,৪৯৩	১৭ .২৪
১ হেক্টারের অধিক - ২ হেক্টার পর্যন্ত	৭৬,৯৭৩	২৪ .৫৫	১,১২,০৫০	২৪ .৬১
২ হেক্টারের অধিক - ৪ হেক্টার পর্যন্ত	৫৬,৩১১	১৭ .৯৬	১,৫৮,১৭২	৩৪ .৭৪
৪ হেক্টারের উর্দ্ধে	১৯,২৮২	৬ .১৫	১,০৬,৫৮৫	২৩ .৪১

[সূত্র :- District Annual Plan for Agriculture - 1984-85]

(পরিসংখ্যান - ৩)

বৃষ্টিপাত **আবহাওয়া**

স্বাভাবিক মাসের নাম	মিলি মিটার	° সেন্টিগ্রেড সর্বাধিক	সবনিম্ন	গড়
জানুয়ারী	১৩.৫০	২৪.৮৬	১১.৪৯	১৮.১৭
ফেব্রুয়ারী	৩২.৫০	২৭.০০	১৪.৭০	২০.৮৮
মার্চ	৩৯.১০	৩২.১৪	১৮.৩৪	২৫.২৪
এপ্রিল	৫৫.৬০	৩৪.৩৮	২২.৬৩	২৮.৫০
মে	১৩৯.২০	৩৫.২৪	২৯.৩৯	৩২.৩১
জুন	২৫৬.৮০	৩৫.১০	২৫.৭২	৩০.৪১
জুলাই	৩৩৩.৩০	৩২.২৮	২৬.৪৬	২৯.৩৭
আগষ্ট	৩১৭.০০	৩১.৫১	২৫.৫৩	২৯.০২
সেপ্টেম্বর	২১৬.৯০	৩১.২৯	২৫.৬৪	২৮.৪৭
অক্টোবর	৯৪.৫০	২৯.৭৭	২২.৬৮	২৬.২২
নভেম্বর	২৫.১০	২৮.৮০	১৬.০০	২২.৪০
ডিসেম্বর	৫.১০	২৫.২২	১১.৮৬	১৮.৫৪
মোট	১৫২৮.৬০			

(সূত্র ঃ বর্ধমানের কৃষির বাৎসরিক পরিকল্পনা - ১৯৮৪-৮৫)

মাটির শ্রেণী বিন্যাস ঃ- বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল মূলত শিল্প, কলকারখানা এবং খনি এলাকা। পানাগড়ের পর থেকে দুর্গাপুর আসানসোল, কুলটী, চিত্তরঞ্জন বিভিন্ন ভারী ও মাঝারী শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। রাণীগঞ্জ এবং সংলগ্ন এলাকা কয়লা খনিতে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলটুকু বাদে জেলার পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা, এই কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির পরিমাণ সমগ্র জেলার হিসাবে ৬৫% থেকে ৭০%।

বর্ধমানের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মাটী দামোদর নদী দ্বারা বিধৌত পলিমাটী অঞ্চল। এই মাটী মোটামুটি কৃষিকাজের পক্ষে উপযুক্ত। (ফসফেটের পরিমাণ ৫.৫%হতে ৭.২%)। মাটীতে এলাকানুযায়ী গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন এবং জৈব পদার্থের পরিমাণ কম। গ্রহণযোগ্য ফসফেটের পরিমাণ কম থেকে মাঝারী ধরণের। আর পটাশের পরিমাণ মাঝারী থেকে বেশী ধরণের।

বর্ধমান জেলার কিছু কিছু ব্লকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাঁকুরে মাটী (বালি সহ) বা ল্যাটারাইট। যেমন আউসগ্রাম কাঁকসা, ফরিদপুর, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, খণ্ডঘোষ, রায়না, ভাতার, মেমারী, পূর্বস্থলী, কাটোয়া এই সব ব্লকের কোন কোন অঞ্চলে ল্যাটারাইট মাটী দেখা যায়। এই মাটী হাল্কা ও অম্লভাবাপন্ন। (ফসফেটের পরিমাণ ৪.৮% থেকে ৬.৫%)। জমি সাধারণতঃ অসমতল।

মাটীতে জৈব পদার্থ ও গ্রহণযোগ্য ফসফেট এবং মিনারেলের পরিমাণ খুবই কম। উপরোক্ত ব্লকগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্লকের যেমন গলসী, আউসগ্রাম,

ভাতার, মেমারী, মন্তেশ্বর, রায়না, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি এলাকায় কাদা (পাঁক) মাটী, স্থানীয় চাষীরা যাকে মেটেল মাটী বলে। এই মাটী গ্রহণযোগ্য জৈব পদার্থ ফসফেটের পরিমাণ বেশ ভাল। ধান চাষের পক্ষে এই মাটী খুবই উপযুক্ত।

আসানসোল মহকুমা অঞ্চল জুড়ে নেইসিক কাঁকুড়ে মাটী দেখা যায়। জমি অসমতল এবং রং লালচে। মাটীতে কাঁকর ও বালির ভাগ খুব বেশী এবং গ্রহণ যোগ্য জৈব পদার্থের পরিমাণ কম। এই মাটীর গভীরতা বেশী নয়, সেজন্য ভূমিক্ষয় একটা বিরাট সমস্যা।

(দ্রষ্টব্য : ম্যাপ - ১)

সেচ ব্যবস্থা :

কৃষিকার্যের অন্যতম সর্ত সুষ্টু সেচ ব্যবস্থা। সেচের সুষ্টু বন্দোবস্ত যদি না থাকে, যদি জমিতে পর্যাপ্ত জল দেওয়া না যায় তা হলে কৃষিকার্য সম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলার প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র চাষের জমিতে পর্য্যাপ্ত জল, দামোদর নদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রন, জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে বিহার রাজ্যের সহযোগিতায় দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন সংক্ষেপে ডি, ভি, সি সংস্থা গঠন করেন। দুঃখের কথা ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর ডি, ভি, সি-র সম্পুর্ণ রূপায়ন ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প আজ প্রায় ব্যর্থ। অধিক বৃষ্টিপাত হলেই আজ বর্ধমানের বেশ কিছু ব্লক, পার্শ্ববর্তী হুগলী জেলার আরামবাগ, খানাকুল ব্লক বন্যা প্লাবিত হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে ডি,ভি,সি ক্যানেল মারফত বর্ধমান জেলার প্রায় ৩,০৪,৯০৩ হেক্টার জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়।

ঐ একই বৎসরে ডীপ টিউবওয়েল মারফত ৩৩,৯১৫ হেক্টার, রিভার লিফট ইরিগেশন মারফৎ ৩২,৩৭৫ হেক্টার, শ্যালো টিউবওয়েল মারফৎ ১,০১,৭০০ হেক্টার, এবং অন্যান্য সূত্র যেমন পুকুর, দীঘি, বিল ইত্যাদি থেকে প্রায় ৬৮,৯৮৯ হেক্টার জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। উপরোক্ত তথ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে জেলায় সেচ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। কারণ জেলার মোট আয়তনের $\frac{৩}{৪}$ অংশ সেচ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। কিন্তু প্রকৃত চিত্রটা অন্যরূপ। সময়ে যদি বৃষ্টি না হয় ফলন মার খায়। যদি অধিক বৃষ্টি হয় তাহলে বন্যায় চাষ জমি ডুবে যায় এবং পুনরায় চাষের পর্য্যাপ্ত সময় না থাকলে চাষীরা সর্বস্বান্ত হন। পরন্তু নিয়মনীতি না মেনে, মাটীর নীচে জলস্তর সম্পর্কে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে যত্রতত্র শ্যালো টিউবওয়েল ও ডীপ টিউবওয়েল বসানোর ফল হয়েছে মারাত্মক। প্রথমত ভুগর্ভস্থ জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় পুকুর, দীঘিতে জলের টান পড়ে। জমি তার সরসতা হারিয়ে রূক্ষ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ জলের স্তর নেমে যাওয়ায় - শ্যালো টিউবওয়েলের লেয়ার ফেল করে। ফলত : সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ধান গাছের থোর আসার মুখে জমিকে জমির গাছ জ্বলে যায়।

(পরিসংখ্যান - ৪) বিভিন্ন ফসলে সেচ সেবিত অংশ (১৯৮৩ - ৮৪)

ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টার)	সেচ সেবিত অংশের পরিমাণ (১৯৮৩-৮৪)	মোট কত % শতাংশ সেচ সেবিত (১৯৮৩-৮৪)
আউশ ধান্য	২৫,০০০	২২,৫৫০	৯০
আমন ধান্য	৪,০০,০০০	৩,০৭,০৬০	৭৫

বোরো ধান্য	৮৫,০০০	৭৭,৩১২	৯১
গম	২০,০০০	১৯,৫১৬	১০০
আলু	২৬,৫০০	৩৩,২২৯	১০০
সরিষা (তৈলবীজ)	২০,০০০	২০,৮০০	১০০
ইক্ষু	২,৫০০	২,৬১৬	১০০
আনাজ, সব্জী	২৫,০০০	২৬,১০০	১০০
পাট	১২,০০০	৬,২৮০	৬০
অন্যান্য ফসল	৯৪,৫০০	২৬,৪১৯	২৮

জেলার চাষ বাস : বর্ধমান জেলায় প্রয় সব রকম ফসলই উৎপন্ন হয়। তবে বাণিজ্যিক ও সমষ্টিগত ভাবে ধান ও আলুর চাষই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া ও সরিষা, গম, পাট আখ ও বিভিন্ন ধরণের আনাজপাতি উৎপন্ন হয়।

দুই দশক আগেও ধানচাষের ফলন ছিল নূন্য। তখন বিঘা প্রতি গড় ফলন ছিল ৮ থেকে ১০ মণ। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগে সেই ফলন বিঘা প্রতি ১৮ হতে ২০ মনে (গড়) দাঁড়িয়েছে। ফলন বেড়েছে সত্য, কিন্তু গুণমান এবং স্বাদ গেছে হারিয়ে। কালোজিরা নামে এক প্রকার ধানের কথা শুনতে পাওয়া যায়, যার গন্ধ ছিল কালোজিরার মত। আর একপ্রাকার ধানের কথা শুনতে পাওয়া যায়, ধান নাবাল বিল জমিতে চাষ হয়। অধিক বৃষ্টিপাতে বিলের জল যত বাড়ে, রাতারাতি ধানগাছ ও জলের উপরে মাথা চাড়া দিয়ে লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। এবং জমিতে জল থাকতে থাকতেই ঐ ধান কাটিতে হয়। তখন মাঝারী চাষীরাও বাড়িতে খাবার জন্য দেড় দুই বিঘে জমিতে ও দাদখানি, বাসমতী, গোবিন্দভোগ প্রভৃতি বাসযুক্ত সরু ধানের চাষ করতেন। এখন একদিন পায়েস খেতে হলে সরু চালের জন্য দোকানে ছুটতে হয়। আর দোকানের ঐ সব চালের প্রায় সবটাই অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করা। স্বাদযুক্ত বিচিত্র প্রকার ধান আজ লুপ্ত প্রায়, সে জায়গায় সম্পূর্ণ বহিরাগত (আমন) আই আর - ১০০৫, ১০০৬ ১৩১০, ১০১১, পংকজ, শঙ্খ, প্রকাশ, ক্ষীতিশ। (আউস ও বোরো) পদ্মা, জয়া, রত্না, ১০৩৬, ১০৫০ প্রভৃতি। ছোট ছোট, মোটা-মোটা ও মাঝারী ধরণের এই ধান স্বাদ হীন। স্বাদ না থাকলেও চাষীরা এসব ধানের চাষেই জোর দেন - কারণ ফলন অনেক বেশী এবং সময় লাগে কম। ১০৫০ (আউস) শ্রাবণ মাসের দু তারিখে রুইয়ে আশ্বিন মাসের বারো তারিখে কাটা চলে অর্থাৎ পুরো আড়াই মাসও লাগে না। আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে এই সব অধিক ফলনশীল ধান অধিক মাত্রায় বাণিজ্যিক। এই চাষে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় বেশী, এবং মজুর লাগে অধিক সংখক। আবার এই সব ধানে পোকা মাকড়ের আক্রমণও খুবই বেশী - ফলে কীটনাশক ঔষধের আজ রমরমা। দুঃখের কথা কিন্তু একটাই চাষী কিন্তু আজও অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় শষ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।

ধানের মতই সরিষা, আলু, গম সব ফসলেই উচ্চ ফলনশীল বীজ এসে গেছে সত্য তবে ধানের মত এত ব্যাপক উন্নতি ঘটে নি।

আলুর উন্নত ও চালু জাতগুলি হল - কুকরী, জ্যোতি, চন্দ্রমুখী

সরিষার মধ্যে প্রচলিত নাম গুলি হল - রাই, ছাঁচি, হলদি, বরুণা ইত্যাদি। ছাঁচি সরিষা প্রধানতঃ রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। হলদি হতে তেল নিষ্কাষণের পরিমাণ বেশী বলে অয়েল মিল খনি প্রভৃতি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হলদির ব্যবহার বেশী। গম বীজের প্রচলিত বাণিজ্যিক নামগুলি হল - পিষি, দুধিয়া, সোনালিকা।

সমগ্র পশ্চিম বংগের ন্যায় বর্ধমান জেলাতেও জোতের আয়তন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা মোট জোতের আশী শতাংশের বেশী। সেজন্য চাষে যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনো তেমনভাবে হয় না। তবে চাষীদের যন্ত্রপাতির সুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানো গেছে। একটি গরু বা মোষের হালে যেখানে সমস্ত দিনে (৮ ঘন্টা হি ঃ) ১ বিঘা জমি চাষ দেয়, সেখানে একটি ট্রাক্টর ঐ একই সময়ে ১০ হতে ১২ বিঘা জমিতে ২ টি চাষ দেয়। উপরন্তু ট্রাক্টরে জমির তলার মাটী খুব গভীরভাবে ওলোট-পালোট করা যায়। ট্রাক্টরের চাষের সুবিধটুকু চাষী বুঝেছেন বলেই অনেক চাষীই সাধ্যমত ট্রাক্টরের সাহায্য নিয়ে থাকেন। এই ভাবে চাষ-বাসের প্রতিটি ক্ষেত্রে যন্ত্রের উপকারিতা সম্পর্কে চাষীকে সম্যক পরিচিত করাতে আরও সময় এবং প্রচারের প্রয়োজন।

ঋণ ঃ কৃষিতে ঋণদানের জন্য এখনো অনেক জায়গাতেই 'বারী' প্রথা বা মহাজনী প্রথা বিদ্যমান। তবে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 'সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি'র মাধ্যমে ছোট চাষীদের অল্প সুদে ঋণ দান করে মহাজনের হাতে হতে তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছেন। সমস্যা একটাই, চাষীরা সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে . পারেন না। সমবায় ব্যাঙ্কের ১৯৮৭-৮৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "...পূর্ববর্তী বছরের ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ... স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ আদায় শতকরা ৬৪.০৮ শতাংশ হতে বেড়ে হয়েছে ৬৭.৮ শতাংশ।" অর্থাৎ অনাদায়ী কৃষি ঋণের পরিমান ৩২.২ শতাংশ। ১৯৮৮-৮৯ সালে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষিতে ঋণ দানের পরিমান স্বল্প মেয়াদী (লক্ষ টাকায়) ১২১১.৯৬ মধ্যম মেয়াদি (লক্ষ টাকায়) ২৭.৫০।

(পরিসংখ্যান - ৫)

পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলার সহিত বর্ধমান জেলার তুলনামুলক পরিসংখ্যান ।

(সূত্র - কৃষি সহায়িকা ১৯৭৯-৮০)

জেলার নাম	ফসল	চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ	গড় ফলন হেঃ প্রতি কিলো	মোট উৎপাদন মেঃ টঃ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বর্ধমান	আউস	২৬.৩	১৮৩৭	৪৮.৩
হুগলী	ধান্য	১২.৬	১৫৩৪	১৯.৪
মেদনীপুর পশ্চিম		৪২.০	৮৯৩	৩৭.৫
মেদনীপুর পূর্ব		৪.৬	১৫৪৯	৭.১
মুর্শিদাবাদ		৯০.১	১০৪৩	৯৪.১

বর্ধমান	আমন	৪০২.৯	১৭৩৫	৬৯৯.১
পুরুলিয়া	ধান্য	২১৮.৫	৬৭১	১৪৬.৬
বীরভূম		৩২১.২	১৫৯৭	৫১৩.০
হুগলী		১৭৩.৯	১৪৩৪	২৪৯.৪
মুর্শীদাবাদ		২০৬.৮	১৫২২	৩১৪.৭
বর্ধমান	বোরো	৩০.৬	২৬১১	৮০.০
মেদিনীপুর পূর্ব	ধান্য	৩৮.০	২৭৯৭	১০৬.২
মুর্শীদাবাদ		১৮.৬	২৯২৫	৫৪.৪
নদীয়া		২৬.৪	৩১০৫	৮০.৭
হুগলী		২৯.৯	২৯৬০	৮৮.৪
বর্ধমান	গম	২৫.৭	১৫০০	৩৮.৫
মুর্শীদাবাদ		১১২.১	১৭৮৩	১৯৯.৯
নদীয়া		৪৭.১	১৮১৫	৮৫.৫
বীরভূম		৫৮.৫	১৬১৮	৯৪.৬
বর্ধমান	আলু	২৫.৫	২৩৮২৪	৬০৬.৪
হুগলী		৩১.১	২৩৩৩৯	৭২৬.২
হাওড়া		১.৯	২১০৩৮	৪১.০
পুরুলিয়া		(৫০ হেঃ কম)	২১০৩৮	০.৮
বর্ধমান	সরিষা	১৫.২	৭৩২	১১.১
হুগলী		৩.৩	৬৯৮	২.৩
বীরভূম		৬.২	৭২৩	৪.৪
বাঁকুড়া		৩.০	৬৯৮	২.১
পুরুলিয়া		০.৫	৬৯৮	০.৪
			হেঃ প্রতি বেলে	
বর্ধমান	পাট	১৩.১	৮.৪৮	১১১.২
হুগলী		২৮.৫	১১.২৭	৩২১.১
মেদনীপুর পূর্ব		১১.৪	১০.৪৫	১১৮.৮
বীরভূম		০.২	৯.৮৭	১.৯
হাওড়া		৪.২	৯.৯২	৪২.১

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পাট এবং বোরো ধানে বর্ধমান জেলা পিছিয়ে। বাদ বাকী আউস, আমন, আলু, সরিষা সব চাষেই বর্ধমান জেলার গড়

উৎপাদন প্রথম। এবং আউস, আমন ও বোরোর মোট ফলন ৮২৭.৪ মেঃ টঃ আলু এবং সরিষা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও জেলার মোট উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

জেলা কৃষি করণের ১৯৮৮-৮৯ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আমন ধান এবং পাট ছাড়া প্রতিটি ফসলের ক্ষেত্রেই চাষ জমির পরিমাণ বেড়েছে। গড় উৎপাদন ও মোট উৎপাদন ও বেড়েছে অধিক মাত্রায়। ১৯৭৯-৮০ সালে আমন ধান্য ও সরিষার ফলন ছিল হেক্টর প্রতি যথাক্রমে - ১৭৩৫ কি ঃ ও ৭৩২ কিলো ১৯৮৮-৮৯এ ঐ ফলন দাঁড়িয়েছে হেক্টর পিছু যথাক্রমে - ২৫২৩ কিলো ও ৯৪২ কিলো।

(পরিসংখ্যান - ৬)
বর্ধমান জেলার ১৯৮৮-৮৯ সালের উৎপন্ন ফসলের তথ্য চিত্র।
(সূত্র - জেলা কৃষি করণ)

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ ('০০০ হেক্টর)	গড় উৎপাদন কিলো গ্রাম	মোট উৎপাদন ('০০০ মেঃ টঃ)	সময়
আউস ধান্য	৩৩.৪৪৮	২৭৭৬.০	৯২.৮৫	আষাঢ়ের মাঝা মাঝি হতে আশ্বিন
আমন ধান্য	৪০০.৩০৩	২৫২৩.০	১০১০.০৪	শ্রাবণ হতে অগ্রান-পৌষ।
বোরো ধান্য	১০৮.৪২৮	২৮০৩.০	৩০৩.৯১	মাঘ ফাল্গুণ হতে বৈশাখ-জৈষ্টর প্রথম
সরিষা	৪৮.৮৯৩	৯৪২.০	৪৬.০৪	কার্ত্তিক হতে মাঘ
আলু	৩৭.৫৩৭	৫৬০.৩	২০.৯১	অগ্রাণের শেষ পৌষ হতে মাঘের শেষ ফাল্গুণ।
পাট	৯.১৯৩	১৪৭.৩২ ('০০০ বোলে)	১৬.০৩ বোলে	জৈষ্ট হতে ভাদ্র আশ্বিন
আনাজ ও সব্জী				
শীত কালীন	২৬.০৮০	৫৫৫.১৫	১৫.০০	
গ্রীষ্ম কালীন ঃ	১৪.৬৬৬	৬৬৭.০	১০.০০	
বর্ষা কালীন ঃ (ভাদুই)	১১.০৪২	৮৬৯.৫	১০.০০	

বিঃ দ্রঃ আমাদের দেশে চাষ আবাদ এখনো অনেকাংশে প্রকৃতি নির্ভর। সে জন্য আবহাওয়া বৃষ্টিপাত বিভিন্ন ভাবে চাষের প্রকৃত সময়ের হেরফের ঘটায়। সেজন্য চাষের প্রকৃত সময় সঠিক ভাবে মানা যায় না। তবুও মোটামুটি সময়টা দেওয়া হল, উপরের পরিসংখ্যানে।

জেলার কৃষিকার্যে সারের ব্যবহার :

জেলার মাটীতে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য জৈব পদার্থ বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন প্রকার। সমষ্টিগত ভাবে মাটীতে ফসফেটের পরিমাণ অনুমানিক ৫% হতে ৭% শতাংশ গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজের পরিমাণ কম, প্রায় ৫% শতাংশের নীচে পটাশের পরিমাণ মাঝারী ধরণের।

(পরিসংখ্যান - ৭)

জেলায় ১৯৮৪-৮৫ সালে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ । (সূত্র - জেলার বাৎসরিক কৃষি পরিকল্পনা ১৯৮৪-৮৫)

	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
	মেঃ টঃ	মেঃ টঃ	মেঃ টঃ
খারিফ চাষ	১৭,০০০	৪,০০০	৩,৬০০
রবি চাষ	২৭,৮০০	১২,০০০	৮,৯০০
মোট :	৪৪,৮০০	১৬,০০০	১২,৫০০

বর্ধমানে চাষ আবাদে রসায়নিক সারের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। ১৯৭৯-৮০ সালে যথাক্রমে ব্যবহৃত নাইট্রোজেনের পরিমাণ ছিল ২১,৯৭৮। ফসফেটের পরিমাণ ছিল ৮৮৬৯ এবং পটাশ ব্যবহৃত হয়ে ছিল ৩৯৭৭ মে : ট :।

উপসংহার :

কৃষিবিষয়ক আলোচনার দুটি দিক আছে। ভূমিস্বত্ত্বের আলোচনা এবং উৎপাদন সংক্রান্ত আলোচনা। আমাদের দেশে 'জমি' শুধুমাত্র অর্থনীতির বিষয় নয় জমি রাজনীতিরও অন্যতম প্রধান বিষয়। গ্রামীণ রাজনীতি আবর্তিত হয় জমিকে কেন্দ্র করে। ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থায় মধ্যস্বত্ত প্রথা কায়েম হয়। এই ব্যবস্থায় একদল লোক জমিতে চলে আসেন জমির সঙ্গে যাঁদের নাড়ীর টান ছিল না। বর্ধমানের রাজ পরিবার এমনই এক মধ্যস্বত্তভোগী - যারা আদিতে ব্যবসায়ী ছিলেন। এরা জমিদারীর খাজনা আদায় নিশ্চিত করার জন্য পত্তনি প্রথার সৃষ্টি করেন - যা পরে সমগ্র বাংলা তথা পূর্বভারতে চালু হয়। ১৮১৮ সালে পত্তনি প্রথা আইনসিদ্ধ হয়। একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই অসংখ্য পত্তনিদার - দরপত্তনিদার-সে পত্তনিদারের সৃষ্টি হয়। এঁদের বেশীর ভাগই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতেন। লোকমুখে এরা 'জমিদার' রূপে পরিচিত হতেন। ১৯৫৫ সালের পর জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটলে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ 'জমিদার' থেকে সাধারণ বৃহৎ চাষীতে পরিণত হন। বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে এক সময়ে এরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনেকেই শহরে চলে আসেন এবং অন্য বৃত্তিতে মনোযোগী হন। ১৯৫৫-র পর থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ভূমিসংস্কার আইনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে জমির সীলিং বা উধর্সীমাকে ক্রমশঃ কমিয়ে আনা হয়েছে। এভাবে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত জমি বা খাস জমি বন্টন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনীতির খেলায় মেতেছেন। ১৯৮৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ৪ হেক্টারের বা তার বেশী পরিমাণ

জমির মালিকের সংখ্যা ১৯ হাজারের সামান্য কিছু বেশী। জেলার মোট কৃষিজোতের সংখ্যা ৩ লক্ষেরও বেশী। এর অর্ধেক জোত ১ হেক্টার বা তারও কম পরিমানের। অর্থাৎ বর্ধমানের ভূমি ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্তভোগীরা বর্তমানে প্রায় অনুপস্থিত। যারা জমিতে থেকে গেছেন তাঁরা কৃষক পরিবার হিসাবেই রয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা মানসিকতার পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে।

এবার অর্থনীতির কথা। সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ, উন্নত কীটনাশক এবং সারের প্রয়োগ, উন্নত বীজ ও কৃষি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে এবং মোট উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। বর্ধমানে কিন্তু কৃষিতে যান্ত্রিকরণ দেরীতে শুরু হয়েছে এবং এখনও আশানুরূপ নয়। সমবায় চাষের অনুপস্থিতি এবং জোতের খণ্ডীকরণ এর একটা কারণ। আলু ছাড়া অর্থকরী ফসলের চাষ উল্লেখযোগ্য নয়। এখনও প্রধান ফসল ধান। কৃষি পরিষেবার ব্যবস্থা তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি। গ্রামাঞ্চলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। পুকুর বুজিয়ে, জঙ্গল কেটে জমির পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জলাভাব দেখা দিচ্ছে ভূগর্ভস্ত জলের স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আর কয়েক বছরের পর বর্ধমানের কৃষিতে বিপর্য্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে। জমি থেকে শহরমুখী জনস্রোত প্রবল হচ্ছে। আর কয়েক বছরের মধ্যে বিলি করার মত খাসজমি আর পাওয়া যাবে না। উর্ধসীমা আইনে জোতের আকার যা দাঁড়িয়েছে তার থেকে আর কমিয়ে আনাও মুস্কিল হবে - কেননা তাহলে তা আর 'অর্থনৈতিক জোত' থাকবে না। গ্রামাঞ্চলে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে 'জমি' সরে গেলে রাজনৈতিক দলগুলিকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। বিকল্প রাজনীতির চর্চা শুরু হলে জেলার কৃষিক্ষেত্রেও বিকল্প চিন্তার প্রয়োগ ঘটবে। সেই বিকল্প চেহারাটি কি দাঁড়াবে এখনই তা বলা সম্ভব নয়।

সংযোজন ঃ

বর্ধমানের ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষি পরিচয়

(ক) জমি ব্যবহার (হেক্টর হিসাবে)			(খ) ১৯৮১-র সেনসাস অনুযায়ী
মোট জমি -	৭,০০,১০০	হেক্টর	কৃষি পরিবার - ৩,১৩,৫৩৫ টি
চাষের জমি -	৪,৫৫,৩০০	,,	০ - ১ হেক্টর পর্যন্ত
বহুফসলী জমি -	২,৪৪,৯০০	,,	জোতের সংখ্যা - ১,৬০,৯০৯ টি (১৭.২৪%)
একফসলী জমি -	২,১০,৪০০	,,	১ থেকে ২ হেক্টর - ৭৬,৯৭৩ টি (২৪.৬১%)
সেচ-সুবিধাপ্রাপ্ত			
(১) খারিফ -	৩,৮৪,০০০	,,	২ থেকে ৪ হেক্টর - ৫৬,৩১১ টি (৫৮.১৫)
(২) রবি -	১,৬০,০০০		৪ হেক্টরের বেশী - ১৯,২৮২ টি
বনভূমি -	৩১,০০০		
চারণভূমি -	৩,৫০০		
ফল ও ফুলের চাষ -	৯,৪০০		

খ। ১৯৮৭ র হিসাব অনুযায়ী বর্গাদার ও পাট্টাদার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঃ

মোট খাস জমির পরিমাণ	=	৭৫,১৪৯.৯৩	একর
মোট বিলিকৃত খাসজমি	=	৪৩,৪১৬.৭২	,,
বিলি করতে বাকি	=	৭৪১.০০	,,
ইনজাঙ্কশান হয়েছে	=	২২,৪৭৮.০০	,,
পাট্টাদারের সংখ্যা	=	৬৯,০৮৪	জন

মোট বর্গাদারের সংখ্যা	=	১,১২,১২২	জন
তপশীলভুক্ত জাতির বর্গাদার	=	৩৭,৪১৬	,,
তপশীলভুক্ত উপজাতির বর্গাদারের সংখ্যা	=	১৪,৭৯০	,,
মুসলিম বর্গাদারের সংখ্যা	=	২৫,১৪৭	,,
মোট রজিষ্ট্রীকৃত বর্গাজমির পরিমাণ	=	৯৮,৮৮১.৯৯	একর

বর্ধমান : পর্যটকের অহল্যাভূমি

দেবনাথ মৈত্র

সেকালের বর্ধমান এবং আজকের বর্ধমানের মানচিত্র এক নয়। সময়-ধূসর পাণ্ডুলিপির সব অক্ষর চেনা যায় না ; তবু যা রয়েছে তাও অমূল্য। পণ্ডিতেরা, ইতিহাস পর্যবেক্ষকরা মনে করেন অনেক যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তবু যা রয়েছে পর্যটকদের পক্ষে কম নয়। কেন কে জানে, স্থানটি, বিশেষকরে পর্যটকদের, অহল্যাভূমি হয়েই রইল। দূর ইতিহাসের কাল থেকে আজ অবধি বর্ধমান নানা ভাবে বেঁচে রয়েছে। কখনো জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান এর সঙ্গে জড়িত, কখনো প্রেমের পীঠস্থান, কখনো এখানকার উল্লেখ পাওয়া যায় আকবর-ই-নামাতে, কখনো আবার রণক্ষেত্রে বাজছে রণদামামা দিকে দিকে রক্তগঙ্গা বইছে। রাজা, প্রেমিক, সাধু, কবি, ভক্ত সবার পদচিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তরে। এঁরা সকলে, সময়ে সময়ে, এসেছেন, বসবাস করেছেন ভালবেসেছেন এবং স্থানটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন ধারা এখানে মিলেমিশে রয়েছে - আশ্চর্য সহাবস্থান বিভিন্ন ধর্মের। প্রাচীন সে কালের গর্ভ থেকে বহুস্থানের জন্ম নিয়েছে যা আজকের আকর্ষণ। রাজপ্রাসাদ থেকে ফকিরের আখড়া, বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। আজ নতুন করে আবিষ্কার হচ্ছে বৌদ্ধ আমলের প্রত্ন চিহ্নগুলি। এরা অনেকেই পর্যটক সমাগম দাবী করে। একালের মানুষজনের কাছে তাদের অনেক কিছু বলার আছে।

শহর চত্তরে যেখানে সেকালের পদধ্বনি আজও শোনা যায় :

পীরবাহারাম : ন্যাশানাল মনুমেন্ট হিসেবে স্বীকৃত এই সমাধি ক্ষেত্রটি দূর ইতিহাসের খবর বয়ে আনছে। তুর্ক থেকে আসা বাহরাম সাক্কার কবর এখানে। তিনি ভারতে আসেন হুমায়ূনের আমলে। সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, এখানে এসে মারা যান ১৫৬৩ সালে। আকবর এই সংবাদ পেয়ে এখানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান ১৫৬৪ সনে। এছাড়া এখানে আরো দুটি সমাধি রয়েছে। একটি জাহাঙ্গীর পত্নী নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগানের এবং অপরটি কুতুবুদ্দিনের। মেহেরুন্নিসা (পরে নূরজাহান) কে শের আফগানের কাছ থেকে ছিনেয়ে নিয়ে আসবার জন্য সেলিম, কুতুবুদ্দিনকে পাঠান। দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই নিহত হন। এখন দুজনেই পাশাপাশি সমাহিত। এখানকার নির্জনতা মনকে আপনা আপনি কোন সুদূরে পাঠিয়ে দেয়।

কঙ্কালেশ্বরী কালী :- কাঞ্চননগরের এক প্রান্তে রয়েছে কঙ্কালেশ্বরী কালী বাড়ী। মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দেখলে বোঝা যায় বহু প্রাচীন এই মন্দির। সঠিক সন পাওয়া যায় না। অদ্ভুত এই কালী মূর্ত্তি। এখানে মা কঙ্কালরূপিণী। নিকস্ কালো পাথরের ওপর খোদাই করা একটি কঙ্কাল, শিরা ধমনিসহ যার গলায় ঝুলছে নরমুণ্ডের মালা। ভয়ঙ্কর এর রূপ, ভয়পূর্ণ ভক্তি আদায় করে নেয়। মূর্ত্তিটির খোদাই এর কাজ অসাধারণ। প্রচার না থাকায় ভীড় কম। কালীর এই চামুণ্ডা রূপটি অনেকেই বৌদ্ধ চামুণ্ডা রূপ বলেন। কেউ কেউ বলেন এটি বৌদ্ধ আমলে তৈরী।

খাজা আনোয়ার বেড় : এর অপর নাম নবাব বাড়ী। আজ ভগ্নদশায় পৌঁছেছে। ঢোকার মুখে যে তোরণটি পরে তা যে এককালে অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং সুরক্ষার কাজ করত তা বোঝা যায়। ভিতরে একটি চতুষ্কোণ জলাশয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাওয়া মহল। জলাশয়ের অপরদিকে যে স্মৃতি সৌধ সেটি খাজা আনোয়ারের সমাধি। এছাড়া এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় কবর। প্রচলিত ইতিহাস কিছু থাকলেও সঠিক কাদের কবর এবং কত পুরানো, সে খবর জানা যায় না।

জুম্মা মসজিদ : রাজবাড়ীর দক্ষিণে, পুরাতন চকের এই মসজিদটি আকবরের আমলে তৈরী।

আজও নবীন :

বর্ধমান রাজবাড়ি : অবিভক্ত বাংলাদেশে এমন বিশাল রাজপ্রাসাদ খুব কমই ছিল। এখন এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস রূপে ব্যবহৃত। সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই রাজবাড়ীতে একদা অসংখ্য প্রহরীর বাধা ডিঙিয়ে প্রবেশ করতে হত। এখন এ রাজ প্রাসাদ অতীত গৌরবের সাক্ষীমাত্র দাঁড়িয়ে আছে কালের প্রহরায়।

গোলাপবাগ : বর্ধমান ভ্রমণের কথা উঠলেই প্রথমে এই স্থানটির কথা মনে আসে। এককালে বর্ধমান রাজ পরিবারের আউট হাউস আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত। জমিদারী আমলে এটি দুর্গের মত ব্যবহার হত তাই চারিধারে পরিখা। শোনা যায় পালাবার জন্য ছ মাইল লম্বা এক সুড়ঙ্গ ছিল এখান থেকে। এর নাম গোলাপবাগ হয় কারণ রাজাদের আমলে এটি গোলাপের বাগিচা ছিল। ছিল রাজার নিজস্ব ডিয়ার পার্ক ও চিড়িয়াখানা। এককালে পরিখা জুড়ে ঘুরে বেড়াত রঙিন মাছ - রূপকথার মত হারিয়ে গেছে সেগুলি। কিন্তু আজও দূর দ্বীপের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে আছে দিলখুসা। শীতের দুপুরে পিঠে রোদ এলিয়ে দুসারি দেবদারু গাছের মধ্যে দিয়ে, লাল মোরামের রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে বেড়ানোর পক্ষে অপূর্ব স্থান এটি।

সর্বমঙ্গলা মন্দির : বর্ধমানের অন্যতম বিখ্যাত এবং জাগ্রত দেবী মা সর্বমঙ্গলা। ভক্তদের ভীড়ই তা প্রমাণ করে দেয়। শুধু এ শহরের নয়, দূর দূরান্ত থেকেও মানুষ এখানে পূজো দিতে আসেন। প্রায় ২৫০ বছরের পুরানো এই মন্দির তৎকালিন বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ রাই এর আমলে প্রতিষ্ঠিত। দেবী মূর্তি অষ্টদশভূজা - কালো পাথরের তৈরী। তাঁর পদতলে অসুর এবং মহিষ। দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি একটি পীঠস্থানও কারণ এখানে সতীর নাভি পরেছিল বলে কথিত আছে।

কাঞ্চননগরের বারোদুয়ারী : ১৭৩৭ সালে বর্ধমানের কীর্তিমান রাজা কীর্তিচাঁদের যুদ্ধজয়ের সংবাদ নিয়ে কালের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে এই তোরণ। যুদ্ধ জয়ের আনন্দে তৈরী হয় বারোটি তোরণ। তার মধ্যে একটি আজো রয়েছে - বাকিগুলি কালের গর্ভে বিলীন। শুধু বারোদুয়ারী (বার দ্বার থেকে) নামটি রয়ে গিয়েছে। এই কাঞ্চননগর অঞ্চলটি এক সময় প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং জনবহুল বাসস্থান ছিল।

নবাব হাট ১০৮ শিবমন্দির : বর্ধমান থেকে গুসকরা যেতে, ষ্টেশন থেকে চার কিমি পথ ১০৮ শিবমন্দির। ১৭৮৯ সালে তৈরী হয় এটি। রাজমাতা বিষণ কুমারী দেবী এটি নির্মাণ করান। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ১০৮ টি মন্দির। সামান্য দূরে আরও একটি শিব মন্দির রয়েছে, তবে যেহেতু এটি লাগোয়া নয় সেই হেতু এটিকে গোণা হয় না। কথিত আছে একলা এই মন্দিরটি রাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল, পথে ভোর হয়ে যাওয়ায় থেমে যায়। শিবরাত্রির সময় দিন কয়েক ধরে বিশাল মেলা বসে।

কমলাকান্ত কালীবাড়ী : সাধক কমলাকান্তের নাম থেকে এই কালীবাড়ীর নামকরণ। সাধক কমলাকান্ত এখানে সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর মঞ্চমুণ্ডের আসন আজো রয়েছে এই কালীবাড়িতে। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এই কালীবাড়ী। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন দেবীর কাছে পূজা দিতে।

বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ী : শহরের অনতিদূরে তেজগঞ্জ মহল্লায় অবস্থিত এই মন্দির। মন্দিরটিকে ঘিরে একটি করুণ গল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। কালীমূর্ত্তির বেদীর নীচে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে যা নাকি রাজবাড়ীর অন্দরমহলে গিয়ে শেষ হয়েছে। রাজার মেয়ে বিদ্যা, পুরোহিতের ছেলে সুন্দর। এরপর পাঠক অনুমান করে নিন। ব্যর্থ প্রেমের সেই কাহিনীকে মনে পড়িয়ে দিতে মন্দিরটি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শহর থেকে দূরে : ইতিহাসের পদচিহ্ন ধরে :

কল্যাণেশ্বরী মন্দির : মাইথন বাঁধের দু তিন কিমি আগেই আছে হ্যাংলা পাহাড়ে কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দির। পাঁচশো বছরের পুরানো এই মন্দির খুবই সাদামাটা হলেও অত্যন্ত জাগ্রত বলে খ্যাতি আছে। এক সময়ে নরবলি হত এই মন্দিরে বলে শোনা যায়। মেলা ও ছুটির দিন বেশ ভীড় হয়।

বরাকর দেউল : মাইথন থেকে ৮ কিমি দূরে বরাকরে অতি প্রাচীন এক দেউল আছে। ১৪৮৬ এবং ১৫৪৭ সালের শিলালিপি পাওয়া যায়। স্থানীয়রা এর আকৃতির জন্য এই মন্দিরটিকে "বেগুনিয়া" দেউল বলেন। মন্দিরটি শিবের। সম্ভবত গোপভূমের রাজা হরিশচন্দ্রের স্ত্রী হরিপ্রিয়া (১৩৮২ শকাব্দ) এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

যাতায়াত : মাইথনের নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন ৮ কিমি দূরে বরাকর। বরাকর থেকে বাস, রিক্সা, অটো পাবেন। এছাড়া আসানসোল (২৮ কিমি), ধানবাদ (৫০ কিমি) ইত্যাদি জায়গা থেকে সবসময় বাস যাতায়াত করে।

থকার জন্য রয়েছে ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পযটন বিভাগের টুরিষ্টলজ। দুটিরই অগ্রিম বুকিং চাই। এছাড়া ছোট দ্বীপের ওপর রয়েছে মজুমদার লজ। D.V.C.-র নিজস্ব টুরিষ্ট উইং-এও থাকা যায় (বুকিং লাগবে) ।

ডিসের গড় : বরাকর ও দামোদর নদের সংযোগস্থলে ডিসের গড় অবস্থিত। বহু আগে এখানে একটি মাটির দুর্গ ছিল আজ তার চিহ্ন মেলে না। মুসলমান যুগে স্থানীয় রাজশক্তির (পঞ্চকোটি রাজ) বিরুদ্ধে দুর্গ সুদৃঢ় করা হয় এবং নাম হয় ডিহি সের গড় যার থেকে আজ ডিসের গড়। এখানে একটি সুপ্রসিদ্ধ পীরের স্থান আছে। ৫ই চৈত্র থেকে ২০ শে চৈত্র এখানে বিশাল মেলা বসে। মেলাটির বৈশিষ্ট্য হল, হিন্দু-মুসলমান একত্রে উপাসনা, সিন্নি উৎসর্গ করেন।

পাণ্ডবেশ্বর : রাণীগঞ্জ সিউড়ি রোড বরাবর ১০ কিমি দূরে অজয় নদের ওপর পাণ্ডবেশ্বরের অবস্থান। এখানে কয়েকটি ছোট ছোট শিবমন্দির আছে। কথিত আছে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাস কালে এই মন্দির সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভরতপুর : পানাগড়ের অদূরে দামোদর নদের অববাহিকায় বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগ খননকার্য চালিয়ে ভরতপুর নামক স্থানে বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি অত্যন্ত প্রাচীন। ধ্বংসাবশেষের অনেকগুলি স্তর পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্বেও এ অঞ্চলে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার মানুষের ব্যবহৃত জিনিষপত্র পাওয়া গেছে। পূর্ণাঙ্গ খননকার্য এখনও বাকি।

কালনা : ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে কালনা রেল ষ্টেশন। বর্ধমান থেকে বাসেও যাওয়া যায়। সারাদিনে অসংখ্য এক্সপ্রেস এবং লোকাল বাস যাতায়াত করছে। বর্ধমান মহারাজ গঙ্গার ধারে বাসের জন্য একটি প্রাসাদ এবং ১০৮ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখনো এই ১০৮ শিবমন্দিরটি এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। সাধক কমলাকান্তের জন্মও হয় এই শহরে। ভাগীরথী তীরে শহরের অবস্থান। শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকামাতা। অম্বিকামাতার মন্দিরও আছে। মধ্যযুগের বহু স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে। প্রায় চারশো বছরের পুরানো। মজলিশ সাহেব এবং বদর সাহেবের সমাধি আছে। এই সমাধি এখানে বেশ নাম করা। বড় মসজিদটিতে প্রাচীন হিন্দু ভাস্কর্যের চিহ্ন দেখা যায়। এছাড়া রয়েছে লালজির মন্দির এবং কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদের আমলে তৈরী। দুটি মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দেখবার মত। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এর স্থাপত্য। মন্দিরগুলি ২৫ চূড়া বিশিষ্ট মন্দির সারাভারতে এই ধরনের দেব দেউল কমই আছে। কীর্তিচাঁদের মা বিষণ কুমারী দেবীর 'রাই' এই সঙ্গে বিবাহ হয় এক সন্ন্যাসীর শ্যামের। এই শ্যাম হল বিষণকুমারীর লালাজি বা জামাই। এই লালাজি থেকে আজকের লালজি নামকরণ।

কালনায় থাকবার হোটেল, PWD এবং ইরিগেশনের বাংলো আছে ।

কাটোয়া : কাটোয়া প্রাচীন শহর । অজয় এবং গঙ্গার সংযোগস্থলে অবস্থান করছে শহরটি । অবস্থানের দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এককালে মুসলমান শাসকরা শহরটিকে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলেন । এক সময়ে এখানে একটি গড় বা দুর্গ ছিল । সেই গড়ে বসে পরবর্তীকালে নবাব বর্গী আক্রমণ ঠেকান । ক্লাইভ, পরে, সেই দুর্গ দখল করেন । এখানে বসেই ক্লাইভ পলাশি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন বলেই ধারণা

করা হয় । বিস্তারিত পরিকল্পনাও তৈরী করেন এই কাটোয়ায় গঙ্গার ধারে আমবাগানে বসে। দুর্গের পরিখার চিহ্ন কিছু কিছু পাওয়া যায়। সেই আমবাগান আর নেই কিন্তু জায়গাটির নাম 'সাহেব বাগান' হয়ে ক্লাইভ এবং আমবাগানের স্মৃতি বহন করছে । চৈতন্যদেব এখানে দীক্ষা নেন । সেই কারণে আজও এটি একটি বৈষ্ণব তীর্থ । মুরশিদ কুলি খাঁর তৈরী মসজিদটি উল্লেখের দাবি রাখে । ফারুকশাহ-এর মসজিদটিও উল্লেখযোগ্য । এছাড়া বড় প্রভুর আখড়া, গৌরাঙ্গ বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির (কালী) ইত্যাদি।

তাছাড়া উল্লেখযোগ্য হল উইলিয়াম কেরীর সমাধি। তিনি কাটোয়ার স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে এবং মিশনারী হিসাবে একটানা ৪২ বছর কাটিয়েছেন।

বর্ধমান থেকে দুঘন্টার বাস রাস্তা । প্রতি ঘন্টায় বাস ছাড়ে । এ ছাড়া কালনা, নবদ্বীপের সঙ্গেও বাস যোগাযোগ আছে । কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনেও কাটোয়া আসা যায় । থাকবার জন্য জেলা পরিষদের নতুন একটি ভবন হয়েছে । বর্ধমান থেকে বুকিং করতে হবে ।

কোগ্রাম ঃ প্রাচীন মঙ্গলচন্ডীর পূজা হয় এখানে । অজয় ও কুনুর নদীর মিলনস্থল এখানে । মঙ্গলচন্ডী ছাড়াও প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তিও পূজিত হন এখানে । এই গ্রামেই কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন ।

জঙ্গলমহল ঃ আজ যেখানে দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে সেখানে একসময় ছিল ঘন জঙ্গল । ডঃ বিধান রায়ের আমলে জঙ্গল কেটে গড়ে ওঠে এই শিল্প নগরী । কিন্তু এই জঙ্গলের বেড় ও পরিধি অনেকদূর বিস্তৃত । দুর্গাপুরের পিছনে এখনও ঘন বনাঞ্চল রয়েছে । গুসকরা থেকে শুরু দুর্গাপুর ছাড়িয়ে বিহারের দিকে চলে গেছে এই বন, এ দিকে বীরভূম, শান্তিনিকেতন ওধারে পুরুলিয়া জুড়ে এই বনাঞ্চল । বিস্তীর্ণ, রুক্ষ লাল কাঁকুড়ে মাটীর এই বনাঞ্চলকে বলা হয় জঙ্গলমহল । আজও জঙ্গলমহল রহস্যপূর্ণ এবং সুগম নয় । বসবাসকারী আদিবাসীরা শিক্ষিত নয় নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে তেমন ভাবে পরিচয় হয়নি জঙ্গলমহলের । কথিত আছে এই জঙ্গলমহলের পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেবী চৌধুরানী উপন্যাস রচনা করেন । ভবানী পাঠকের বাস্তবতাও অনেকে খুঁজে পান । এই অঞ্চলে কয়েকটি আকর্ষণীয় স্থান আছে ভ্রমণ পিপাসুদের জঙ্গলের রহস্য বরাবরই টানে । তবে জঙ্গলমহল দিনে দিনে ঘুরে আসাই উচিত এবং সঙ্গে জীপ থাকলে ভালো হয় নাহলে সব জায়গায় পৌঁছনো যাবে না ।

শ্যামরূপার গড় ঃ কাকসা থানার নামকরণ হয়েছে কংশেশ্বর থেকে । কংশেশ্বর শিবমন্দির অনেক পুরনো । এই থানার অন্তর্গত টেঁকুর ছিল গোপরাজা ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষের রাজধানী । ইছাই ঘোষের আরাধ্য দেবী শ্যামারূপার (ভবানী) নাম থেকে গড়ের নাম হয় শ্যামারূপার গড়। গভীর জঙ্গলে ঢাকা এই অঞ্চল । দুর্গাপুর মলান দিঘী অজয় রাস্তার পূর্ব্বদিকে মাইল দুয়েক ভিতরে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও পাওয়া যায় । একাদশ শতাব্দীর তাম্রলিপি পাওয়া গেছে এখান থেকে ।

ইছাইঘোষের দেউল (গৌরাঙ্গপুর) : অজয় নদের তীরে গৌরাঙ্গপুর । শ্যামারূপার গড়ের পূর্ব দিকে মাইল কয়েক দূরে । দেউলটি সুন্দর, স্থাপত্য ও গঠন আকর্ষণীয় ।

রাজগড় : উৎসাহীরা এই গড় দেখতে আসতে পারেন । বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী এই ভগ্ন রাজগড় । মন আপনা আপনি ইতিহাসমুখী হয়ে ওঠে । পানাগড় ইলামবাজার রাস্তায় তিলকচন্দ্রপুরে এর অবস্থান । এর কারুকার্য ভগ্নাবস্থায় হলেও আকর্ষণ করে ।

অমরারগড় : মানকর ষ্টেশন থেকে নেমে বাসে বা রিক্সায় আমরারগড় যাওয়া যায় । সদ্গোপ রাজাদের রাজধানী ছিল এটি । সেই প্রাচীন নগরীর চিহ্ন সামান্যই বর্তমান । তবে রাজাদের আরাধ্যের মন্দিরটি এখনো বর্ত্তমান । দেবী শিবাক্ষার মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন দশম খৃষ্টাব্দে রাজা ভল্লুপাদ । মানকরের রাজবাড়ীটি পথে পড়ে । এখানে এলে, এটি না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না ।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি : জঙ্গলমহলে অন্যতম বিখ্যাত স্থান পাণ্ডুরাজার ঢিবি। এই খ্যাতি ঐতিহাসিক কারণে। এখান থেকে বহু পুরাতন সীল, পোড়ামাটির মূর্ত্তি, লোহার বর্শা ফলক ইত্যাদি বহু ঐতিহাসিক জিনিস আবিষ্কৃত হয়। তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন মিলেছে যা পঃ বঙ্গে আগে পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে ক্রীট (গ্রীস) দ্বীপের সঙ্গে এখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। কয়েক যুগ ধরে সভ্যতা এখানে বিরাজ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যে চিহ্ন পাওয়া যায় তার বয়স প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর। অণ্ডাল ষ্টেশনে নেমে রামনগর বা গোঁসাইখণ্ড হয়ে পাণ্ডুরাজার ঢিবি দেখতে আসতে হয়।

শুধু ইতিহাস নয় : যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল। স্বল্প ছুটি উপভোগ করার জন্য পিকনিক স্পট। সেই রকম আধুনিক আকর্ষণের কথাও বাদ দেওয়া যায় না। ঐতিহাসিক মূল্যে শুধু নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, তীর্থদর্শনে অথবা নিরিবিলিতে কটা দিন কাটানোর জন্যও এখানে চলে আসা যায়। এই অহল্যাভূমি উৎসাহী পর্যটকদের পদার্পণের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

আসানসোল : চারপাশে অনেক কয়লা খনির জন্য এবং শিল্প নগরী হিসাবে এর খ্যাতি। বর্ধমান থেকে অনেক ট্রেন এবং বাস রয়েছে। ঘন্টা আড়াই-এর পথ। আসানসোলকে কেন্দ্র করে বার্ণপুর (৪ কিমি), কবি নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়া (১১ কিমি), চিত্তরঞ্জন (২৫ কিমি) ঘুরে নেওয়া যায়। চিত্তরঞ্জনের প্রধান আকর্ষণ তার লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ সেখানে রেল ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে (A.O-র অনুমতিছাড়া ঘুরে দেখতে দেওয়া হয় না)। চুরুলিয়ার প্রায় ৫/৬ কিমি উত্তর পূর্বে 'রাজা নরত্তমের দুর্গ' বলে পরিচিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। দুর্গটি সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের আগে তৈরী হয়েছিল। আসানসোলে একাধিক হোটেল আছে।

দুর্গাপুর : দুর্গাপুরকে আধুনিক ভারতের 'রূঢ়' বলা হয়। স্টীল প্লান্টের জন্য বিখ্যাত। এখানকার টাউনশীপটিও সুন্দর সুপরিকল্পিত। স্টীল প্লান্ট দেখতে প্রায় একটি দিন লাগে এবং আগেভাগে তার জন্য অনুমতি নিতে হয় PRO, DSP-র কাছ থেকে। এছাড়া এখানে পার্ক লেক ও ডীয়র পার্কও রয়েছে। টয় ট্রেনে চড়তে বাচ্চা বুড়ো সকলের ভালো লাগবে। কিন্তু সব চেয়ে আকষণীয় ভ্রমণের জন্য এখানকার ডিভিসি ব্যারেজটি। পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিষ্ট লজ আছে ব্যারেজের কাছে। ৬৯২ মিটার লম্বা বাঁধটি পায়ে পায়ে বেড়ানোর জন্য অত্যন্ত মনোরম। শীতকালে পিকনিক করা যেতে পারে এর ধারে। বিকালের সূর্যাস্তও বেশ লাগে এখান থেকে। মৎস্য শিকারীদের স্বর্গ বলেও এই জলাধারের খ্যাতি আছে। হাতে সময় থাকলে, ডিসি হলের কাছে 'ইছাই ঘোষের দুর্গ' বলে খ্যাত একটি ভগ্নাবশেষ রয়েছে।

থাকার ব্যবস্থা ইউথ হোস্টেল, দুর্গাপুর হাউস (বুকিং PRO, DSP) টুরিস্ট লজ (বুকিং ম্যানেজার বা পর্যটন বিভাগ, কলকাতা-১) এবং অন্য অনেক হোটেল আছে। প্রধান যোগাযোগ ট্রেন। বাসও আছে প্রচুর। যেতে সময় লাগে ঘন্টা দেড়েক।

মাইথন : বিহার আর পশ্চিমবঙ্গকে (উত্তর পশ্চিম কোণে) ভাগ করে চলে যাচ্ছে বরাকর নদ। এই বরাকর নদের উপর ১৫৭১২ ফুট লম্বা আর ১৩৬ ফুট উঁচু মাইথন ড্যাম। জলাধারের এক প্রান্ত পশ্চিমবঙ্গে অপর পাড় বিহারে। ছুটির সময় যাত্রীদের ভিড় দেখা যায়। বাধের জলে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া এখানকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও ঘুরে নেওয়া যায় অনুমতি নিয়ে। নিরিবিলিতে ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা। বিস্তীর্ণ জল, ছোট ছোট টিলা, জঙ্গল, ড্যামের ওপর থেকে বরাকর নদের দৃশ্য ভ্রমণার্থীদের মন কেড়ে নেয়। সূর্যাস্তের সময় নৌকা বিহার অথবা চুপ করে দাঁড়িয়ে জলার ওপারে সূর্যডুবি দেখতে দারুণ লাগে। আকাশ পরিস্কার থাকলে দূরে সিন্ত্রির কারখানার 'শিল্যুট' দেখা যায়।

ফেরার পথে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা এবং সুন্দর ছবির মত সাজানো শহরটি দেখে নিতে পারেন।

চড়ুইভাতির আমন্ত্রণ : পান্নারোড :

বর্ধমান হাওড়া কর্ড লাইনে, বর্ধমান থেকে ১৫ কিমি দূরে, তৃতীয় স্টেশন পান্লারোড। স্টেশন থেকে রিক্সায় পাঁচ কিমি অথবা আধঘন্টা হেঁটে গেলে পান্লারোড ডাক বাংলো। সেচবিভাগের সুন্দর বাংলো বর্ধমান থেকে বুকিং করতে হয়। বর্ধমান থেকে সরাসরি গাড়িতেও যেতে পারেন। নিরিবিলিতে দু একদিন কাটানোর পক্ষে সুন্দর জায়গা। বাংলোর সামনে বিস্তীর্ণ বালুকাভূমি পেরিয়ে বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ দামোদর নদ। দামোদর এখানে বাঁক নিয়েছে সে জন্য আরো সুন্দর লাগে। নদীর পাড়ে রয়েছে একটি ছায়াঘন আমবাগান। বাংলা সিনেমার শুটিং এর একটি আদর্শ জায়গা। সারা শীতকাল জুড়ে পিকনিক করতে আসে লোকে।

ওরগ্রাম : বর্ধমান গুসকরা বাসে ওরগ্রাম যেতে হয়। সুন্দর পিকনিক স্পট। বনবিভাগের রেস্ট হাউস আছে এখানে বিশ্রাম ও চড়ুইভাতি করা যেতে পারে - তবে বিট অফিসারের অনুমতি লাগে। এ ছাড়া পাশেই যে জঙ্গল আছে সেখানে কিছুটা ঢুকে একটি বড় লেক আছে। লেকের পাড়ে আলো আঁধারিতে ছাওয়া বনের

মধ্যে পিকনিক করার আনন্দ উপভোগ করে দিনে দিনে ফিরে আসা উচিত হবে। সঙ্গে গাড়ী বা জীপ থাকলে ভালো হয়।

রণ্ডিয়া : পানাগড় থেকে জীপ বা রিক্সায় চলুন রণ্ডিয়াতে। দামোদর থেকে ইডেন ক্যানেল এখান থেকে বেরিয়েছে। বৃটিশ আমলের একটি সুন্দর বাংলো আছে। সম্প্রতি এটিকে আধুনিক করা হয়েছে। দুচারদিন যারা একান্তে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে চান তাঁদের পক্ষে আদর্শ জায়গা ।

আবার বর্ধমান : শহর বর্ধমান এত প্রাচীন যে প্রাচীনতার কিছু স্পর্শ থেকেই যায়। তারই মধ্যে যেগুলি কম প্রাচীন অথবা নতুন গড়ে তোলা হচ্ছে, তার কথা এবার বলা যাক।

রমনার বাগান / মৃগউদ্যান :

রমনা বাগান বিজার্ভ [illegible] দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় ১৪ একর জমির ওপর। দুপাশে সবুজ শাল, সেগুন ইত্যাদি গাছে ছাওয়া এই অঞ্চলে লাল সুরকির রাস্তা ধরে হাঁটতে বেশ লাগে। চার-পাঁচ রকমের হরিণ রয়েছে এখানে। তার সংখ্যাও বাড়ছে। এখানে একরাত কাটানোর জন্য বনবিভাগের দু কামরার রেষ্ট হাউসও রয়েছে।

কার্জন গেট : বর্ধমান শহরের তোরণের মত দাঁড়িয়ে আছে কার্জন গেট বিজয় চাঁদ মহাতাব রোড এবং জি টি রোডের সংযোগস্থলে। তৎকালিন বড়লাট লর্ড কার্জনের বর্ধমান আগমন উপলক্ষে ১৯০৪ সালে তৈরী হয় এই গেট। ইউরোপীয়ান শৈলীর ছাপ স্পষ্ট। এখন এটি 'বিজয় তোরণ' নামে পরিচিত।

বাবা বর্ধমানেশ্বর : জমি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার হয় এই বিশাল শিবলিঙ্গটি। এই মাপের শিবলিঙ্গ একমাত্র ভুবনেশ্বরের শিবলিঙ্গটির সঙ্গে তুলনীয়। এর ওজন প্রায় ১৪ টন। ধারণা করা হচ্ছে যে দামোদরের বন্যায় মন্দির ভেঙ্গে এটি এখানে আসে এবং মাটি চাপা পড়ে যায়। সম্ভবতঃ এরই সঙ্গে ছিল একটি সাদা ষাঁড়, অতি সম্প্রতি পাওয়া যায় বর্ধমান শ্মশানের ধার বাঁকা নদীতে তারও বিশাল মাপ। সেটি এখন সেখানেই প্রতিষ্ঠিত । বাবা বর্ধমানেশ্বরকে ঘিরে প্রতি শিব চতুর্দশীতে জমজমাট মেলা বসে।

বিজয় বিহার : বিজয় চন্দ মহাতাব এর তৈরী এ বাগানে এক অনন্য বৈশিষ্ট আছে। উদ্যানের মাঝে সরোবরকে ঘিরে ছটি মন্দির। (একটিতে এখন বিগ্রহ নেই)। চতুর্দিকে ফুলে ফুলে সাজানো থাকে বছরের বেশির ভাগ সময়। অর্জুন গাছের নীচে রয়েছে তাঁর ধ্যান করার আসন। এখানকার সব চেয়ে আকর্ষণীয় এবং মৌলিক জিনিষ হল সমস্ত দেওয়াল জুড়ে রয়েছে উৎকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক। কালে কালে বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে গেলেও এর আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

সদর ঘাট : প্রাচীন বর্ধমানের অন্যতম সমৃদ্ধ স্থান, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং দুর্দম দামোদরের পাড়ে সদর ঘাট। দামোদর নদের বওড়া বুকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন 'কৃষক সেতু'। সেতুটি কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি দিয়ে

সাজানোয় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শীতকালে গাঢ় নীল আকাশের নীচে বিস্তৃত বালুকা বেলায় চড়ুইভাতির জন্য অত্যন্ত মনোরম। এছাড়া বর্ষায় জলভরা নদেরও এক ভয় মেশানো সুন্দর রূপ আছে।

কৃষ্ণসায়র : বর্ধমান শহরের চারটি 'সায়র' বা দীঘির মধ্যে সব থেকে বড়। একদা এর চারিদিকে অসংখ্য গাছ ছিল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। চারদিকে মাটির পাহাড়ের ওপর পঞ্চাশ গজ ব্যবধানে বসানো ছিল কামান। একদা রাজাদের আমলে সরস্বতী পূজার সময় মেলা বসত এখানে, হাউই বাজির প্রতিযোগিতা হোত। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষরা কৃষ্ণসায়রকে ঘিরে একটি আধুনিক পার্ক তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন - কাজও অনেকদূর এগিয়েছে। এটি তৈরী হলে কলিকাতার বাইরে একটি চমৎকার পিকনিক গার্ডেন হবে। ভ্রমণার্থীরা যেমন আসবেন তেমনি শীতের অতিথি পাখীরা আসবে মাঝে মাঝে।

বর্ধমান শহর ঘুরতে আরো কিছু বাকি থেকে যায়। বর্ধমানের মত একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শহরকে এত চটজলদি পুরোপুরি দেখ নেওয়া যায় না। বর্ধমান জলকলে সুন্দর পিকনিক হতে পারে। কাঞ্চননগর প্রাচীন বর্ধমানের স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদা এখানকার শিল্পীদের তৈরী ছুরিকাঁচি সারা বাংলাদেশে বিখ্যাত ছিল। বাবা খক্কর সাহেবের দরগায় একটা ধুপ জ্বেলে দিতে পারেন। এখানে হিন্দুমুসলমান সকলেই পূজা দেন, মানত করেন। শের আফগানের সমাধি আর একটু দূরে।

বর্ধমান শহরে অনেকগুলি সায়র বা প্রকাণ্ড দিঘী আছে। কৃষ্ণসায়র, রাণীসায়র, কমলসায়র এবং শ্যামসায়র। কৃষ্ণসায়রকে ঘিরে একদা মাটির পাহাড় ছিল, সে পাহাড়ের উপর পঞ্চাশ গজ অন্তর কামান বসানো ছিল। আজ সে সব স্মৃতিমাত্র। এখন এ অঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। সম্প্রতি কৃষ্ণসায়রকে ঘিরে একটি আধুনিক পার্ক এবং পাখিরালয় তৈরী করা হচ্ছে। আর দু এক বছরের মধ্যে এটি বর্ধমানের অন্যতম টুরিষ্ট স্পট হবে। পাশেই রমনার রিজার্ভ ফরেষ্টে হরিণেরা খেলা করে সারাদিন। কোনো এক কুয়াশামাখা ভোরে কৃষ্ণসায়রের পাড়ে পায়ে পায়ে বেড়াতে অসাধারণ লাগবে। আরো অনেককিছু বাকি রয়ে গেল। সত্যি এবং কল্পনা মেশানো ডাকাতে কালীবাড়ী কৃষ্ণসায়রের পাড়েই।

হোটেল : শহরে একাধিক হোটেল আছে। তবে আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত হোটেল রেঁস্তোরার সংখ্যা কম। 'হোটেল কল্যাণী' 'হোটেল নটরাজ' 'মৃগয়া হোটেল' এবং আরও দু চারটি ভালো হোটেল আছে। এস্টেট অফিসারের অনুমতি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউসে থাকতে পারেন। পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। বনবিভাগের দু কামরার রেস্ট হাউস আছে। ফরেষ্ট অফিসারের অনুমতি নিয়ে এখানে থাকতে পারেন। রিজার্ভ ফরেস্টের ভিতরে। শহর থেকে কিছুটা দূরে হলেও নিরালায় সময় কাটানোর জন্য কানাই নাটশাল ঘোড়দৌড় চটির কাছে সেচ বিভাগের ডাকবাংলোটি আদর্শ হবে। এ ছাড়া জেলাপরিষদের 'বর্ধমান ভবন' রয়েছে এবং সারকিট হাউস রয়েছে।

যাতায়াত : বর্ধমানের সঙ্গে কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদ, রাঁচী, পুরুলিয়া, বোলপুর, নবদ্বীপ ইত্যাদি জায়গার সঙ্গে ভালো ট্রেন ও বাস যোগাযোগ রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমগ্র বর্ধমান জেলাকে পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা গেল না। বর্ধমান এক প্রাচীন জনপদ। সভ্যতার আদি পীঠস্থান প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের প্রত্ন-স্মৃতি চিহ্ন। দামোদরের তীরে ভরতপুরে এবং কুনুরের তীরে মঙ্গলকোটি প্রত্নতাত্ত্বিকের অহল্যাভূমি। অসংখ্য মন্দির, মসজিদ, বৌদ্ধস্তূপ, দেবালয় ছড়িয়ে রয়েছে এ জেলায়। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু মুসলমান এবং আদিবাসী ধর্মসংস্কৃতির নানা স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। সবকিছুর বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখতে হবে।

বর্ধমান ভ্রমণের সুবিধার্থে একটি ট্যুর প্রোগ্রাম দেওয়া হলো। সময় ও সুযোগ অনুযায়ী নিজের মত ট্যুর প্রোগ্রামও সাজিয়ে নিতে পারেন। আর উৎসাহীরা যে কোন ছক মানেন না - এতো বলাই বাহুল্য।

প্রথম দিনে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে রাত কাটান পান্নারোড ডাক বাংলোয়। পরদিন ভোর ভোর বর্ধমান চলে আসুন। এখানে যেদিন পৌঁছলেন সেদিন বিকেলে এবং পরদিন সকালে শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে নিন। দুপুরে বাস অথবা ট্রেন ধরে আসানসোল বরাকর হয়ে মাইথন পৌঁছান। এইখানে রাত্রিবাস। ভোরে উঠে কল্যাণেশ্বরী মন্দির ও বরাকরের দেউলটি দেখে এবং ইচ্ছে হলে পূজো দিয়ে মাইথনে ফিরে আসুন। উৎসাহ থাকলে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া (আসানসোল থেকে ১১ কিমি) দেখে আসতে পারেন। সেদিন রাত্রে দুর্গাপুর পৌঁছানই ভালো হবে। পরদিন দুর্গাপুর শিল্পনগরী এবং ব্যারাজটি ঘুরে নিন। সঙ্গে গাড়ী থাকলে পরের দিন জঙ্গলমহল চলুন ; অথবা তার আগে ভরতপুর ঘুরে নিতে পারেন। সেদিন রাত্রে বর্ধমান ফিরে আসুন। পরের দিন সকালে কাটোয়া চলুন দিনে দিনে ঘুরে নিন। রাত্রে কাটোয়ায় থেকে পরদিন কালনায় পৌঁছান। এখানেও একদিন লাগবে লালজি মন্দির, প্রাচীন মসজিদ এবং ১০৮ শিবমন্দির দেখতে। কালনায় রাত্রিবাস করে ওখান থেকেই কলকাতা অথবা বর্ধমান হয়ে কলকাতা ফিরে যেতে পারবেন।

সংযোজন : বর্ধমানের অন্যান্য ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অগ্রদ্বীপ : বৈষ্ণব তীর্থস্থান ভাগীরথীর তীরবর্তী। জনশ্রুতি বিক্রমাদিত্যও নাকি এখানে বারুণী স্নানে এসেছিলেন। বারুণীস্নান উপলক্ষ্যে ১৫ দিনের মেলা বসে।

সেরগড় : দুটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। আসানসোলের কাছে ডিসেরগড়ে।

মন্তেশ্বর : খড়ী নদীর পূবদিকে। অনেক প্রাচীন মন্দির আছে যার একটি মন্তেশ্বরের।

মঙ্গলকোট : পার্শ্ববর্তী উজানিগ্রামে বৈষ্ণবকবি লোচন দাসের জন্ম। পাঁচ পীরের সমাধি আছে। চণ্ডীমঙ্গলে উজানির উল্লেখ আছে।

কুলীনগ্রাম : জৌগ্রামে নেমে যেতে হয়। গোপালজীর মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। মাঘ মাসে বড় মেলা হয়ে।

বোড়ো বলরাম : সদর থানায়। বলরামের এতবড় মূর্তি সারা ভারতে নেই।

পাতুন ঃ মন্তেশ্বর থানার একটি গ্রাম। পতঞ্জলীর নামে শিবমন্দির আছে। 'পতঞ্জলী দর্শন' রচয়িতার স্মৃতি বিজড়িত।

ক্ষীরগ্রাম ঃ প্রাচীন যোগাদ্যা দেবীর মন্দির। দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি, পাষাণ নির্মিত। আগে নরবলি হতো।

রাঢ়েশ্বর মন্দির ঃ শ্যামারূপার দক্ষিণে গোপালপুর গ্রামের নিকট অবস্থিত। বাড়রাজ ভুবনেশ্বর রায় এই মন্দির এবং বিগ্রহ তৈরী করেন। শিবলিঙ্গ আকারে অতিবৃহৎ এবং সুদৃশ্য। শিবরাত্রি ও মাঘ সপ্তমীতে বড় মেলা হয়।

শ্রী পাট দেনুড় ঃ বৈষ্ণবদের বিখ্যাত তীর্থস্থান। মন্তেশ্বর থানায় অবস্থিত। পুরনো পুঁথিপত্রে 'দেন্দুর' রূপে উল্লিখিত । শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশবভারতীর জন্মস্থান বলে অনেকে মনে করেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের আগে দেনুড়ে শাক্ত প্রভাব ছিল। গ্রাম দেবতা দীননাথ বা দীনেশ্বর। বিক্রম চণ্ডীর একটি মূর্ত্তি আছে।

বৈষ্ণবতীর্থ কড়ুইগ্রাম ঃ পাল রাজাদের আমলে এই অঞ্চলটি ছিল বৌদ্ধ। কড়ুই এর অধিষ্ঠাতা হলেন বুড়োশিব। পরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশের একটি ধারা এখানে বসতি স্থাপন করেন। বৈষ্ণব তীর্থস্থান।

গ্রন্থঋণ ঃ

বর্ধমান সমাচার

বর্ধমান পরিচিতি। নারায়ন চন্দ্র চৌধুরী এবং অনুকূল চন্দ্র সেন
বর্ধমান সম্মিলনী । হীরক জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৭৩)

বর্ধমানের মনীষীবৃন্দ

বিশ্বজিৎ হালদার

পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের মঙ্গলময়, দুঃসাহসী এবং অভূতপূর্ব কাজের দ্বারা মানব সমাজ উপকৃত হয় এবং মানুষ চিরদিন তাঁদের স্মরণ করে। মনীষী, বরেণ্য ব্যক্তি, স্মরণীয় বা বরণীয়, যে বিশেষণই তাঁদের নামের আগে বসাই না কেন একটা ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে না যে তাঁদের জীবন ও কাজের কথা আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। কয়েক হাজার বছর পুরানো আমাদের এই বর্ধমান জেলা যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের মহৎ কাজের দ্বারা আমাদের জেলাকে ধন্য করে গেছেন। তাঁদের অনেকে আজ বিস্মৃত, অনেকের সম্বন্ধে আমরা খুব সামান্যই জানি, আবার অনেকের সম্পর্কে জানলেও তিনি যে আমাদের বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন তা আমরা জানি না। এমন কয়েকজন বরেণ্য বর্ধমান বাসীর কথা এখানে তুলে ধরছি।

সময়ের দিক থেকে বিচার করলে আমরা প্রথমে পাচ্ছি 'শূন্য পুরাণ' রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের নাম। তিনি দশম শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় বর্তমান ছিলেন। 'শূন্য পুরাণে' তিনি লিখেছেন "বাড়ী মোর বল্লুকার/পূজি শ্রী নৈরাকার।" এই বল্লুকা গ্রামটি ছিল অধুনালুপ্ত দামোদরের শাখা নদী ভল্লুকার তীরে। রামাই পণ্ডিতের পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ, স্ত্রীর নাম কেশবতী এবং পুত্রের নাম ধর্মদাস।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে বর্তমান ছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের রচয়িতা কবি মালাধর বসু। তাঁর পিতার নাম ছিল ভগীরথ এবং মাতার নাম ইন্দুমতী। গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খৃঃ অঃ) (মতান্তরে -সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ) তাঁকে 'গুণরাজখান' উপাধি দান করেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের রচনা কাল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরাম্ভন। চতুর্দ্দশ দুই শকে হইল সমাপন।"

এই শতাব্দীর আর একজন বরেণ্য ব্যক্তি হলেন বুনো রামনাথ। এই প্রাজ্ঞ নৈয়ায়িক পণ্ডিত কালনা মহকুমার সমুদ্রগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। শোনা যায় একদিন তাঁর স্ত্রী উমাসুন্দরী দেবী তাঁকে রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি ছাত্রদের পাঠ দান করতে করতে ইঙ্গিতে তেঁতুল গাছ দেখিয়ে দেন। উমাসুন্দরী দেবী তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে ঝোল রাঁধলেন বুনো রামনাথ তাই অমৃত ভেবে খেয়েছিলেন।

শ্রী চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের নিকটবর্তী দেনুড়গ্রামে বাস করতেন। তাঁর প্রকৃত জন্মস্থান ও জন্মতারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে 'প্রেমবিলাসে'র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এবং শ্রী সুনীল কুমার দে মহাশয়ের 'বৈষ্ণব ফেথ্ এণ্ড মুভমেন্ট' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় - তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কালীনাথ আচার্য এবং তাঁর আদিবাস ছিল নদীয়া জেলার নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়াগ্রামে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়ায় তিনি শ্রী চৈতন্যদেবকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন। তাঁর দেনুড় গ্রামে অবস্থান সম্পর্কে 'শ্রীপাট পরিক্রমা'তে বলা হয়েছে "বাল্যকালে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি, বৃন্দাবন দাসের হয় যেথায় বসতি।"

শ্রীচৈতন্যদেবের চেয়ে কয়েক বছরের বড় নরহরি সরকার পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নরনারায়ণ দেব। নবদ্বীপে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং এখানেই চৈতন্যদেবের সাথে তাঁর মিলন হয়। নরহরি

সরকারের রচিত পদগুলিতে চণ্ডীদাসের প্রভাব এত বেশী যে, অনেক সময় সেগুলিকে এক সুরে, এমনকি এক ভাষায় রচিত বলে মনে হয়। চিরকুমার নরহরি সরকার রচিত বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে ভক্তিচন্দ্রিকাপটল, ভজামৃতাষ্টক বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

শ্রী চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস জীবনের সঙ্গী বিখ্যাত 'কড়চা' রচয়িতা গোবিন্দ কর্মকার বর্ধমান শহরের কাঞ্চন নগরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতিসুন্দর করিতায় রচনা করেন। ইহাই গোবিন্দ দাসের বিখ্যাত 'কড়চা' । এই 'কড়চা' শ্রী চৈতন্যদেবের জীবন ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং ইহাতে বিভিন্ন স্থানের তথ্যমূলক বর্ণনার সঙ্গে তৎকালীন সমাজ চিত্রের একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত কড়চায় আত্মপরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন 'বর্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম/পিতা মোর শ্যামদাস, গোবিন্দ মোর নাম,/অস্ত্রহাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার/জাহ্নবী নামেতে হয় জননী আমার।" তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন চৌদ্দশ ত্রিশ শকাব্দে।

প্রাচীনতম চৈতন্য জীবন চরিত চৈতন্য ভাগবতে'র রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীতে দেনুড় গ্রামে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ শ্রীরামের কন্যা নারাণীর পুত্র। তাঁর জন্ম সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও 'পাট পর্যটন' গ্রন্থে লেখা হয়েছে - "হালিশহর নতি গ্রামে নারায়ণী সুত/দাস বৃন্দাবন নামে জগতে বিদিত/নতি গ্রামে জন্ম তায় দেন্দুড়াতে স্থিতি/শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিলেন তথি।" বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতানুযায়ী 'চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়েছিল ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। চৈতন্য জীবন চরিত গুলির মধ্যে 'চৈতন্য ভাগবত' এর গুরুত্ব বেশি। কারণ বৃন্দাবনদাস চৈতন্য জীবনীর অনেক উপকরণ নিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যান্য পারিষদদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এছাড়া শ্রীবাসের আভিনায় চৈতন্য জীবনের অনেক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'চৈতন্য ভাগবত' এর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল কোন নিছক আজগুবি অলৌকিক কাহিনীর উৎকট বর্ণনা এতে নেই। রাঢ়ের তথা পশ্চিমবাংলার ইতিহাস রচনায় বৃন্দাবন দাসের তথ্যগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

কবি নরহরি সরকারের শিষ্য 'চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা লোচনদাস ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার উজানি কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র শেষ খণ্ডে নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন - "বৈদ্যকূলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস/মাতা সতী শুদ্ধমতী সদানন্দী নাম/যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম/কমলাকর দাস নামে মোর জন্মদাতা।" ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী অপর এক 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা কবি জয়ানন্দ মিশ্র ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়ার নিকটবর্তী আমাইপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী চৈতন্যদেব নীলাচল যাবার পথে কবির পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে পদার্পণ করেন এবং কবির নাম রাখেন জয়ানন্দ। চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' এ লিখেছেন- "আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে। ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে ।।"

বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ আনুমানিক ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মধ্য বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন এবং মাতার নাম সুনন্দা।

তিনি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করে ব্রজবুলিতে পদ লিখেছেন। কিংবদন্তী এই যে বিদ্যাপতির 'প্রেম কি অঙ্কুর' প্রমুখ পদটি ইনি সম্পূর্ণ করে শেষে 'গোবিন্দদাস রসপুর' এই ভণিতা যোগ করেন। এর জন্য তাঁর গুরু (মতান্তরে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী) তাঁকে কবিরাজ উপাধি দেন।

গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহ 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা দামোদর সেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীখণ্ডে বর্তমান ছিলেন। তিনি গৌড়ের দরবার থেকে 'যশোরাজখান' উপাধি পান। তিনি তাঁর কাব্যে হুশেন শাহের নাম করেছেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাটোয়ার উত্তরে গঙ্গাটিকুরির নিকটবর্তী ঝামাটপুর গ্রামে ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । অতি বৃদ্ধ বয়সে সাত বছর পরিশ্রম করে তিনি ১০৫০৩ টি পয়ার ও ১০১২ টি শ্লোকে রচনা করেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । বৃন্দাবনের গোস্বামীরা 'চৈতন্যচরিতামৃত' সহ একগাড়ি বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামসুন্দরের তত্ত্বাবধানে গৌড়দেশে পাঠাচ্ছিলেন । বিষ্ণুপুরের কাছে জঙ্গলের মধ্যে ধনরত্ন ভেবে ডাকাতরা তা লুট করে। কিংবদন্তি এই যে এই সংবাদ শুনে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন । আবার কেউ কেউ বলেন এই সংবাদ শুনে তিনি সংজ্ঞা হারান এবং তৎক্ষণাৎ (কারও কারও মতে অল্প দিন পর) তাঁর মৃত্যু হয় ।

পদাবলী সাহিত্যের আর এক বিখ্যাত কবি জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন । নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন । তিনি চন্ডীদাসের সার্থক উত্তর সাধক ছিলেন । তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না । এ ছাড়া পদাবলী সাহিত্যের আরও অনেক কবি বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । স্থানাভাবে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হল না ।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার রায়না থানার রত্নানু নদী তীরবর্তী দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁর পিতার নাম ছিল হৃদয় মিশ্র । সেলিমাবাদের ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে তিনি গ্রাম ত্যাগ করেন । যাবার পথে গোচড্যা গ্রামে তিনি দেবী চন্ডীর দেখা পান । মেদিনীপুর জেলার আরড়া গ্রামের 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়' তাঁকে আশ্রয় দেন । পন্ডিতদের অনুমান ১৫৭৮ থেকে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি আরড়াতেই 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন । বাঁকুড়া রায়ের পুত্র জমিদার রঘুনাথ রায়ই তাকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দিয়েছিলেন বলে পন্ডিতগণ মনে করেন ।

প্রায় দীর্ঘ চারশত বছর ধরে বাঙালীর অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী সিঙ্গিগ্রামে। কাশীরাম দাসের কুলোপাধি ছিল দেব। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কাশীরাম দাস মহাভারতের এক জায়গায় লিখেছেন - "চন্দ্রবান পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।" অর্থাৎ ১৫২৬ শকে (১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি বিরাট পর্ব রচনা শেষ করেন। অনেকে ভুল করে বলেন কাশীরাম দাস মাত্র চারটি পর্ব রচনা করে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে লেখা হয়েছে "অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ" কবি যে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচনা করেছিলেন এর সপক্ষে আরও অনেক প্রমাণ আছে। তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট তিনি ব্যাস দেবের সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, এমন কি সবক্ষেত্রে ব্যাসদেবের মহাভারতকে অনুসরণও করেন নি। যেমন অশ্বমেধ পবটি তিনি রচনা করেছেন 'জৈমিনি ভারত'

অনুসরণ করে। অনেক সমালোচকের মতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা কাশীদাসীর মহাভারতের সাহিত্যিক মূল্য বেশী এবং কবিত্বের হিসাবে কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাশীদাস শ্রেষ্ঠ।

কাশীরাম দাসের বংশে আরো অনেকে কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অগ্রজ কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' রচনা করেন। কাশীরামের পুত্র দ্বৈপায়ন দাস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে পুত্র) নন্দরাম দাস মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব অনুবাদ করেন। সাহিত্য পরিষদের সংরক্ষিত ২৬১২, ২৩১৮ এবং ১২৪৬ সংখ্যক পুঁথিগুলি দ্বৈপায়ন দাসের ভণিতা যুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত ২১৯২ সংখ্যক পুঁথিটি নন্দরাম দাসের ভণিতা যুক্ত। নন্দরাম দাসের মৃত্যু সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকায় লিখেছেন - "বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সনের একখানি দামোদর পদাবলীর উপর লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বর্ষে ১৮ই ফাল্গুন কৃষ্ণ তৃতীয়ার দিন নন্দরাম দাসের মৃত্যু ঘটে," অর্থাৎ ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নন্দরাম দাস ইহলোক ত্যাগ করেন।

ষোড়শ শতকের শেষদিকে বর্ধমান জেলার কাইতির নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে 'ধর্মমঙ্গল' এর কবি রূপরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তী এই যে নবদ্বীপ যাবার পথে কিশোর রূপরাম ধর্মমঙ্গল রচনার জন্য ধর্মঠাকুরের আদেশ পান। এ সম্পর্কে ধর্মমঙ্গল লেখা হয়েছে -"আমি ধর্মঠাকুর, বাঁকুড়া রায় নাম, বারদিনে গীত বাপু গাও রূপরাম।"

ধর্মমঙ্গলের অপর এক বিখ্যাত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কুকরো কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্তী এবং মাতার নাম সীতা দেবী। বর্ধমান মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির পৃষ্টপোষক ছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন এবং গুরু তাঁকে (মতান্তরে বর্ধমানের মহারাজ) কবিরত্ন উপাধি দেন।

হটী বিদ্যালঙ্কার নামে একজন বিদুষী ও প্রাজ্ঞ মহিলা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার সোঁয়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মনস্বী রাজনারায়ন বসু হটী বিদ্যালঙ্কার সম্পর্কে তাঁর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে লিখেছেন - 'হটী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যাবতী বাঙালী ব্রাহ্মণ কন্যা। ইহাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রামে। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্যের ন্যায় বিদায় লইতেন।" ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়।

হটী বিদ্যালঙ্কারের ন্যায় রূপমঞ্জরী নামে আর এক বিদুষী মহিলা বর্ধমান জেলার মানকরের নিকটবর্তী কোটাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১১৮১ অথবা ১১৮২ বঙ্গাব্দে। তাঁর পিতার নাম নারায়ণ দাস এবং মাতা সুধামুখী। তিনি আজীবন অবিবাহিত থেকে নির্মল ও নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। শুধুমাত্র সাহিত্য বা ব্যাকরণ নয় চিকিৎসা শাস্ত্রের তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি পুরুষের মত বেশভূষা পরতেন মাথা মুড়িয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শিখা রাখতেন। প্রায় একশ বছর বয়সে ১২৮২ বঙ্গাব্দের ১৫ই পৌষ তিনি দেহত্যাগ করেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর 'রামরসায়ন' কাব্যের প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী ১১৯৩ বঙ্গাব্দে মানকরের নিকটবর্তী মাড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কিশোরী মোহন গোস্বামী। অ্যাডাম সাহেব তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে (১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) এই রঘুনন্দন সম্পর্কে লিখেছেন -'দ্য মোষ্ট ভ্যালিউমন্যাস নেটিভ অথার আই হ্যাব মেট্ ওইথ্ ইজ রঘুনন্দন গোস্বামী ডুয়েলিং অ্যাট মাড়ো " আড্যাম

সাহেব রঘুনন্দন রচিত ৩৭ খানি গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন। এর মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় ৩৫টি এবং বাংলা ভাষায় ২ টি। 'রামরসায়ন' এর বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় রঘুনন্দন ৪৫ বছর বয়সে অর্থাৎ ১২৩৮ বঙ্গাব্দে (১৮৩১ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধক কবি কমলাকান্ত বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে মাতুলালয়ে আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি ছিল অম্বিকা কালনা। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম মহামায়া দেবী। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র এবং তাঁর পুত্র প্রতাপচাঁদ তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন। বর্ধমানের কাছে লাকুড্ডী পল্লীতে তিনি বিবাহ করেন। বর্ধমান শহরে আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী বর্তমান। প্রথমে শিষ্য প্রতাপচাঁদ, পরে কন্যা এবং তার কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করেন। দামোদরের তীরে সহধর্মিনীর শবদাহ করতে করতে তিনি গেয়েছিলেন -"কালী সব ঘুচালী লেটা-শ্রী নাথের লিখন, আছে যেমন রাখবি কিনা রাখবি সেটা।"

বর্ধমান রাজ পরিবারের ত্রয়োদশ পুরুষ মহারাজ মহাতাবচন্দ বিভিন্ন কাজের জন্য বিখ্যাত। তিনি ছিলেন সাহিত্যসাধক এবং সাহিত্যের পৃষ্টপোষক। সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত এবং দরবেশ, সেকেন্দর নামা, মসনবী প্রভৃতি ফারসী, উর্দু আখ্যায়িকা তিনি অনুবাদ করে বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। শুধু মাত্র মহাভারত অনুবাদেই চার লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। মহাতাব চন্দের পূর্বে এবং পরে বর্ধমান রাজ পরিবারের আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি (যেমন মহারাণী বিষ্ণুকুমারী, বিজয়চাঁদ প্রমুখ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সংকলনে রাজপরিবারের উপর পৃথক একটি প্রবন্ধ থাকায় এবং স্থানাভাব হওয়ায় তাঁদের সম্পর্কে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করা হল না।

বঙ্গের বিখ্যাত পাঁচালী রচয়িতা ও গায়ক দাশরথি রায় বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী বাঁধমুড়ায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবী প্রসাদ রায় এবং মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন এক নীলকুঠীতে কাজ করেন। এরপর মাতুলালয় পীলা গ্রামে অকাবাই অক্ষয়া পাটনী নাম্নী এক রমণীর কবির দলে গান ও ছড়া বাঁধতে থাকেন। পরবর্তীকালে অকাবাই এর দল ছেড়ে নিজে পাঁচালী দলের সৃষ্টি করেন। বাংলার আবালবৃদ্ধ বনিতা তাঁর গানে মুগ্ধ হত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর এক রোমান্টিক নায়ক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালিদাস সার্বভৌম। তারানাথ সংস্কৃত কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি পান। এরপর তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কাশীতে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে তিনি কালনায় ঘরেতে খুললেন চতুষ্পাঠী আর বাজারে খুললেন কাপড়ের দোকান। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর প্রধান কীর্তি ৫৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় 'বাচস্পত্যাভিধান' প্রণয়ন। এই কাজে তাঁকে আঠার বছর গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়। গ্রন্থটি মুদ্রণে ৮০,০০০ টাকা ব্যয় এবং ১২ বছর সময় লাগে। তিনি শুধু পণ্ডিত ছিলেন না। ব্যবসায় তাঁর কীর্তি কম নয়। ঘি-দুধের ব্যবসার জন্য পাঁচশত গরু পালন করতেন, কাপড়ের ব্যবসার জন্য বারশ তন্তুবায় দিয়ে কাপড় বোনাতেন। ধান চালের ব্যবসার জন্য কালনায় কয়েকশ ঢেঁকি বসিয়ে ছিলেন। চাষ করার জন্য বীরভূমে দশ হাজার বিঘা জমি কিনেছিলেন। এছাড়াও

তাঁর কাঠ সোনা-রূপা-হীরজহরৎ, পুস্তক মুদ্রণ প্রভৃতি ব্যবসা ছিল। তিনি অনেকগুলি পুস্তকের রচয়িতা। ১৮৮৫ সালে কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচয়িতা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল বিসূচিকা রোগে ইনি কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন।

মহাভারত, হরিবংশ, শ্রী মদ্ভাগবত ও রামায়ণের বঙ্গানুবাদক এবং মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক প্রতাপচন্দ্র রায় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ বর্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামজয় রায়ের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না বলে শৈশবে প্রতাপচন্দ্রকে রাখালি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ১৬ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় এসে মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কাছে সাত টাকা বেতনে কর্মে নিযুক্ত হন। পরে চিৎপুর রোডের উপর, নর্মাল স্কুলের গায়ে ছোট একটা বইয়ের দোকান করেন। সাত বছর পরিশ্রম করে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। এরপর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে প্রথম গদ্য মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই কাজের জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট ১৮৮৯ সালে তাঁকে সি-আই-ই উপাধি দেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী প্রতাপচন্দ্র লোকান্তরিত হন।

দানবীর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী স্যার রাসবিহারী ঘোষ বর্ধমান জেলার তোড়কোণায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোকগমন করেন।

রায়বাহাদুর বৈকুন্ঠ নাথ সেন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। কর্মজীবনে, তিনি বহরমপুর কোর্ট এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি নানাবিধ সৎকার্যে বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষে তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। 'বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস' এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

অনেকগুলি নাটকের রচয়িতা এবং যাত্রা দলের পরিচালক মতিলাল রায় ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ২১ শে মাঘ বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী ভাতশালাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মনোহর রায়। জোড়াসাঁকো থানার কেরানীর কাজ, ব্রাহ্মণ গড়িয়া ও নবদ্বীপ স্কুলের শিক্ষকতা, জেনারেল পোষ্ট অফিসের কাজ তিনি কর্মজীবনে করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রাম বনবাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, কর্ণবধ উল্লেখযোগ্য। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে তিনি কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

অপর এক বিখ্যাত কৃষ্ণ যাত্রা পালাকার নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায় (কন্ঠবাবু) ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের ধরণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ দেব এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার পল্লীতে পল্লীতে ইঁহার যাত্রার এক সময় বড় কদর ছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ইনি লোকান্তরিত হন।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সুসাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার ইলসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু। যোগেন্দ্রনাথের পিতৃ নিবাস ছিল দামোদর তীরবর্তী বেড়ুগ্রামে। তিনি উপেন্দ্র নাথ সিংহের সহযোগিতায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি 'সাধারণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া তিনি 'হিন্দী বঙ্গবাসী' বাংলা দৈনিক ও ইংরাজী দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা 'টেলিগ্রাফ' প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী, বাঙালী চরিত উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ খ্রীষ্টব্দের ১৮ই আগষ্ট ৫০ বছর বয়সে মধুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাঙালী কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' এর সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বর্ধমান জেলার বহড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'বেঙ্গল গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয় কারও কারও মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে, আবার অনেকের মতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের এক পক্ষ কালের মধ্যে। 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত ভারত চন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থটি গবেষক লেখক ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। এ ছাড়া তিনি নিজে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা এ গ্রামার ইন ইংলিশ এ্যাণ্ড বেঙ্গলী, দায়ভাগ, দ্রবগুণ চিকিৎসার্ণব প্রভৃতি।

'ফোক টেলস অব বেঙ্গল' এবং 'বেঙ্গল পেজেন্টস লাইফ' এর লেখক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার সোনাপলাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাধাকান্ত দে। জেনারেল অ্যাসেম্বিলিজ ইনস্টিটিউশনে তিনি শিক্ষা লাভ করে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক খ্রীষ্টান পার্শী ভদ্রলোকের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি বহরমপুর কলেজ এবং হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' নামক একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে বলা হয় 'বাঙলার বিপ্লবীবাদীদের ব্রহ্মা' তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী অরবিন্দের নির্দেশে তিনি বরোদা থেকে বাংলায় এসে বাংলার আদি বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি' তে যোগ দেন এবং নব্য বিপ্লবীদের বিভিন্ন রকম শিক্ষা দান করেন। পরবর্তী কালে বারীন ঘোষের সঙ্গে মতবিরোধের পর তিনি বিপ্লবী কার্য কলাপ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন এবং তখন তাঁর নাম হয় নিরালম্ব স্বামী। তাঁর পত্নী হিরন্ময়ী দেবীও স্বামীর পথ গ্রহণ করে হন চিন্ময়ী দেবী। চান্নাতেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১২ জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন! তাঁর পিতার নাম বিনোদ বিহারী বসু। তাঁর জীবনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা নিক্ষেপ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পি, এন ঠাকুর ছদ্মনামে 'সনু কিমারু' জাহাজে করে জাপানে চলে যান। জাপানী ভাষা শিক্ষা করেন এবং ওই ভাষায় ১৬ খানি পুস্তক রচনা করেন। জাপ সম্রাট তাঁকে 'সেকেণ্ড অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' উপাধি দেন। তিনিই আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন এবং সুভাষ চন্দ্রের হাতে এই বাহিনীর দায়িত্বভার দান করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারী জাপানে তাঁর মৃত্যু হয়।

কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুন বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার সরডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নীলমণি ব্রহ্মচারী। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে তিনি মেডিসিন আর সার্জারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' আবিষ্কার করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী তিনি লোকান্তরিত হন।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে আমরা কলিকাতার সিমুলিয়া দত্ত পরিবারের ছেলে বলে জানি। কিন্তু তাঁর পিতৃ নিবাস ছিল কালনা মহকুমার ডেরোটোন গ্রামে। ওই রকম রমেশ চন্দ্র দত্তের সাতদেউলে আঝাপুরে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মেমারির নিকট ডেয়ে মগড়ায়, বিপিনচন্দ্র পালের কাটোয়া মহকুমায় এবং সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল কাটোয়ায়। স্থানাভাবে এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হল না।

ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয় কুমার দত্ত বর্ধমান জেলার চুপীগ্রামে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত এবং মাতার নাম দয়াময়ী দেবী। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর নামও স্মরণ করা হয়। তাঁর 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৫৬ খ্রীঃ) গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি উইলসন সাহেবের 'দ্য রিলিজিয়স সেক্টস্ অব দ্য হিন্দুজ্' গ্রন্থ অবলম্বনে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম-১৮৭০, ২য়-১৮৮৩ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থ রচনা। দীর্ঘ ৩১ বছর দুরারোগ্য রোগভোগের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সংস্কৃত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদক, কবি, ঔপন্যাসিক, নট ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ অক্টোবর বর্ধমান জেলার মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় 'বীণা' নামক নাট্যমঞ্চ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে অবসর সরোজিনী, অনলে বিজলী, ভারতকোষ (অভিধান), তরণীসেন বধ, মীরাবাই, লোভেন্দ্র গবেন্দ্র, মহাভারত (অনুবাদ), লয়লা-মজনু উল্লেখযোগ্য। তাঁর হাতেই বাংলায় গদ্য কবিতা (জুলাই ১৮৮৪) রচনার সূত্রপাত হয়। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন।

পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ বর্ধমান জেলার কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ পাস করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণ পদক পান। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে শতদল, উজানী, একতারা বনতুলসী প্রভৃতি। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

কবিশেখর কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যোগেন্দ্র মাতার নাম রাজবালা দেবী। বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের বংশে কবির জন্ম। বর্তমান বছর কবির জন্ম শতবর্ষ। বহরম পুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হতে ডিষ্টিংশন সহ বি, এ পাস করেন। ১৯১২ তে শ্রীমতী সুকৃতি দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দেশিকোত্তম' ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, লিট এবং ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি,লিট (মরণোত্তর) লাভ করেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে কিশলয়, ক্ষুদকুঁড়া, আহরণ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, শরৎসাহিত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফকির আমেদ। প্রথম জীবনে সৈনিকের কর্ম নিয়ে মধ্য প্রাচ্যে যান। রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে অগ্নি বীণা, দোলন চাঁপা প্রভৃতি। তাঁর রচিত গান নজরুল গীতি আজও জনপ্রিয়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ আগষ্ট বাংলাদেশের ঢাকার পি, জি হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।

বর্ধমানের বরেণ্য সন্তান ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরেন্দ্র নাথ সেন, মাতার নাম নবনলিনী সেন। পিতৃ নিবাস বর্ধমান জেলার গোতান গ্রাম। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পি, এইচ, ডি হন। বহু গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখক।

বৃটিশ সরকার কর্তৃক রাজেয়াপ্ত 'মন্দিরের চাবি' কাব্যগ্রন্থের কবি ডাঃ কালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর বর্ধমান জেলার পাতিল পাড়ায় (বৈদ্যপুর) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডাঃ চন্দ্রকান্ত সেনগুপ্ত এবং মাতার নাম দীনতারিণী দেবী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, শিল্পী, নাট্যকার, গীতিকার, সুচিকিৎসক, সমাজসেবক ও দেশপ্রেমিক। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বর্ধমানের চিকিৎসা জগতে আর এক প্রবাদপুরুষ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার ইলসোরা গ্রামে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা ছাড়া শিল্প চর্চায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর দানে বহু সমাজবেসা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে।

এই সংকলনে বর্ধমান জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম, সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের উপর পৃথক পৃথক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বোপরি স্থানাভাব হেতু অনেক বরেণ্য বর্ধমান বাসী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হল না। শুধুমাত্র তাঁদের নাম উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করছি।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকির চন্দ্র রায়, অনিল বরণ রায়, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, শৈলবালা ঘোষ জায়া, বিজয় ভট্টাচার্য, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গণপতি পাঁজা, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, কে, মল্লিক, বিশালাক্ষ বসু, নলিনাক্ষ বসু, প্রণবেশ্বর সরকার (টোগোদা), যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা, দেবকী কুমার বসু, মহম্মদ ইয়াসিন, জগবন্ধু মিত্র, শ্রী কুমার মিত্র, বলাইদেব শর্মা, অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, প্রথমনাথ বন্দোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব আবদুল জব্বার খান বাহাদুর সি, আই, ই, মৌলভী আবুল কাসেম, কবিরাজ শিরোমণি শ্যামদাস বাচষ্পতি, ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, জনাব আবদুস সাত্তার, জীতেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, ভোলানাথ মহান্ত, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস (গন্ধবাবা), বনোয়ারী লাল হাটী, দরবেশ পীরবাহারাম, সত্যচরণ মৈত্র, বিপীন বিহারী ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

গ্রন্থঋণ ঃ

(১) সুকুমার সেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(২) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

(৩) মণীন্দ্রমোহন বসু - বাংলা সাহিত্য

(৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থ।

(৫) বিনয় ঘোষ - পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি

(৬) সুনীতি রঞ্জন রায়চৌধুরী - ঊনিশের শতকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক।

(৭) নকুলচন্দ্র বিশ্বাস - অক্ষয় চরিত।

(৮) মন্মথ নাথ ঘোষ - কর্মবীর কিশোরীচাঁদ

(৯) সুশীল সাহা - স্মরণীয়

(১০) মনোরঞ্জন ঘোষ - মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

(১১) শৈলেশ দে সম্পাদিত - অগ্নিযুগ।

(১২) সুধীর চন্দ্র দাঁ - বর্ধমানের মনীষী।

(১৩) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন - তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

(১৪) ডঃ সুকুমার সেন - দিনের পরে দিন যে গেল।

পত্র পত্রিকা

(১) উদয় অভিযান।

(২) অভিযান সাময়িকী

(৩) বর্ধমান সমাচার

(৪) কলেজ ষ্ট্রীট

(৫) বর্ধমান সম্মিলনী স্মারক গ্রন্থ।

(৬) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

(৭) বর্ধমান পৌর সভার শত বার্ষিকী স্মরণিকা।

বর্ধমানের সমকালীন নাগর সংস্কৃতির সন্ধান : আসানসোলের সংস্কৃতি চর্চা

শিবেন মুখোপাধ্যায়

শিক্ষিত মনে ভাবের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রটি এখানে যাইই হোক, সংস্কৃতি শব্দটির সঙ্গে তবে আমাদের সকলেরই যে পরিচয় আছে শুধু তাই নয়, এ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই আপন বোধ অনুসারী কিছু নিজস্ব ধারণাও আমাদের বর্তমান, স্পষ্ট অথবা আবছা। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টায় এখানে আমরা যাচ্ছি না। কেবল, এই নিবন্ধের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থাকার জন্যই তার বিশাল পরিপ্রেক্ষিতটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেবো।

সংস্কৃতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বা নয় ছিন্নমূল বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু, তার একটা ধারাবাহ থাকে। প্রজাতি হিসাবে মানুষ তার সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকেই বেঁচে থাকার আকাঙ্খা আর চেষ্টায়, প্রকৃতির সহস্র প্রতিকূলতার বিপক্ষে তার উন্নততর বুদ্ধি ও বিচার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জয় আর পরিবেশকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার যে একক এবং পরে সমষ্টিগত সংগ্রাম একদা শুরু করেছিলো - সেই প্রয়াস থেকেই তার জীবনধারণ কৌশল আর জীবনযাপন পদ্ধতির আবিষ্কার। আর এই পদ্ধতির উদ্ভাবনার সঙ্গেই, আমাদের মনে হয়, জড়িয়ে আছে মানুষের সংস্কৃতি। মানব সংস্কৃতির এই ইতিহাস কাজেই প্রকৃত অর্থে প্রাগিতিহাসিক। এখন, স্থান ও কালভেদে মানুষের জীবন - যুদ্ধের যেমন স্বাতন্ত্র্য এসেছে তেমনই তবে জীবনচর্যায় ফুটেছে দেশভেদের লক্ষণ। আঞ্চলিকতা। প্রজাতি হিসাবে মানুষের জীবনযাপন কলার প্রতিটি ধারাই বৃহত্তর অর্থে সমগ্র মানব সমাজেরই লিখিত বা অলিখিত ইতিহাস, তার সংস্কৃতি। দেশান্তরের ভেদরেখা সেখানে আঁকা চলে না। তেমনই বাস্তবের ক্ষুদ্র পরিসরে তার আঞ্চলিক ইঙ্গিতকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কেননা মূলত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি মানুষ এবং বিশেষ এক জনগোষ্ঠী তার অস্তিত্বের ঘোষণা চায়।

সংস্কৃতির ব্যাপ্ত আধারে তাই আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মানুষের সমস্ত ইতিহাসকেই এতে এঁটে ফেলা যায়। সেই মানুষ এক দিন যে ছিলো অসহায় অরণ্যচারী, শত শতাব্দীর বহুবিধ ঘাত প্রতিঘাতের ক্রমান্বয় ঠেক খেয়ে তিল তিল অগ্রগমনের চড়াই ঠেলে যে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, টেনে তুলেছে তার যূথবদ্ধতার ফসল নিজ সমাজকেও।

এখন, ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব ; তার ভাব ভাবনাকে বাদ দিয়ে যেমন তার সমাজ নয়, তেমনই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনাচরণের খুঁটিনাটি কোনটিকে সরিয়ে রেখেও নয় সংস্কৃতি। আর এই ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে কোন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি, লোকরুচি, ঐতিহ্যের প্রতি তার মমত্ব, স্ত্রী-করণ শক্তি, নান্দনিক অভিরুচি, তার মূল্যবোধ, সামাজিক বিন্যাস এবং শাসন সম্পর্কিত তার ধ্যান ধারণা প্রভৃতিও এই সংস্কৃতিরই অঙ্গ। আবার এখানে আপাত বৈপরীত্যও আমাদের যথেষ্টই চোখে পড়ে। যেমন, একই সামাজিক বাতাবরণে বসবাস করেও দুটি পরিবারের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনা এবং তার ব্যবহারিক দিকগুলির সূক্ষ্ম পার্থক্য, খুঁটিয়ে দেখলে এই দূরত্ব ওই একই ক্ষেত্রে এমনকি একটিই পরিবারের দুই সদস্যের মধ্যেও বিদ্যমান। এখানে হয়তো খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি উল্লেখ করি যে, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সম্পর্কে এমনই বলেছিলেন যে এটা এক অন্তর্নিহিত শক্তি যার জোরে কোন একটি জনগোষ্ঠী বা সমাজ তার বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে। এই সূত্রে আমরা এটাও বুঝতে পারি ওই শক্তি ব্যক্তি মানুষের মধ্যেও একইভাবে সক্রিয়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই শক্তির উপস্থিতি ও বিকাশের তারতম্যের ফলেই দুটি সমাজের মাঝে যেমন স্বাতন্ত্রের রেখচিত্র ফুটে ওঠে, তেমনই ব্যষ্টির জীবনেও এটা লক্ষ্য হয়ে দেখা দেয়।

বর্তমান নিবন্ধে স্বাধীনতা পরবর্তী বর্ধমানের নাগর সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি ছিল । আমরা আগেই বলার প্রয়াস পেয়েছি যে বর্ধমান জেলার ভূগোল পশ্চিমাঞ্চলে একরকম, পূর্বাঞ্চলে অন্যরকম। জনগোষ্ঠীর বিন্যাস ও গঠনেও পার্থক্য আছে। ফলে সারা জেলায় একটি মাত্র মডেল বা প্রতিরূপ পাওয়া যাবে না। আসানসোল যেমন দুর্গাপুরও তেমনই একটি শিল্পাঞ্চল কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর নানাবিধ কারণ আছে। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বয়স হল বছর পঁচিশ ছাব্বিশ। এখানে প্রাচীন বসতির চিহ্নমাত্র নেই। অধিকাংশ মানুষই এসেছেন জেলার এবং জেলার গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্য ভূগোল থেকে। ফলে এখানকার সংস্কৃতি সাধনায় এবং চর্চায় শহুরেয়ানা প্রকট। গঙ্গার ওপারে কলকাতার শহরতলীতে যে আধুনিক সংস্কৃতির চর্চা চলছে দুর্গাপুরে তারই যেন সম্প্রসারণ আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন সংস্কৃতির অবশেষ, ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্য এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া এই বিস্তৃত 'কৃষি বলয়' জুড়ে স্বাধীনোত্তরকালে যে সংস্কৃতির চর্চা চলছে সেখানে মিশেছে প্রাচীন ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক নাগর সংস্কৃতির বিশ্বজনীন আবেদন। এইসব মফস্বল শহরে এখনও মেলা, পার্বণ, চরক গাজন, যাত্রা, কবিগানের পাশাপাশি আধুনিক নাটক থিয়েটার, সংগীত নৃত্য, কাব্যচর্চা সমান উৎসাহে অনুশীলিত হচ্ছে। এখানকার জনমানসে ঐতিহ্যের নস্টালজিয়া এখনও বর্তমান। মননে চিন্তায়, ধর্মীয় আচরণে, উৎসবে ব্যসনে অবসর বিনোদনে পুরনো সংস্কৃতির রেশ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচনার পরিসরে এই বর্ধমানকেও আমরা আনিনি। নানা কারণেই আসানসোল মহকুমার সংস্কৃতি চর্চাকে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে আনা হয়েছে। মিশ্র সংস্কৃতির এক চমৎকার মডেল হিসাবে। তার আগে একটু ভূমিকা প্রয়োজন।

শিল্প ও কৃষি - একটা নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী জেলাটিকে দুটি খণ্ডে বিভাজন নয়, সামান্য নজরেই যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে তা হলো যে এ দুটি অংশে বসবাসকারী জনসমাজের অধিকাংশেরই জীবিকার্জনের ক্ষেত্রের মৌলিক পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জীবনযাপন প্রনালী, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধের মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট তফাৎ। কলের চাকায় বাঁধা গতির সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের জনজীবনের যে নিবিড় সংযোগ, কৃষি নির্ভর অঞ্চলে তা প্রায় অনুপস্থিত। এক দিকে সময় যদি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, অপরাংশে তার গতি যেন বড় বেশী ধীর। আর কর্মক্ষেত্রের এই ঢিলেঢালা মেজাজে অভ্যস্ত ব্যক্তির নির্ব্যস্ত জীবন কৃষিভিত্তিক অঞ্চলের সমাজেও গভীর ভাবে প্রতিফলিত হয়। জীবনে গতির এই নিরুচ্ছ্বাস সম্ভবত ঃ এতদাঞ্চলের মানুষ ও তার সমাজ চরিত্রেও এনেছে এক ধরনের বদ্ধতা। যার অপর নাম, বলা চলে, রক্ষণশীলতা। অন্তর এবং বহির্জগতের কোন পরিবর্তনকেই সহজে যা মেনে নিতে চায় না। তবুও, সেই সময় এবং গতি ! ইতিহাসে যাকে রোধ করা যায়নি। জানিই আমরা যে এই সময়েরই গর্ভে লুকোনো

থাকে নতুনের বীজ। আবার সময়ান্তরে, সেই সৃষ্ট নতুনই কালের উগ্র আঘাতে একদিন ধ্বসে যায়। একদা যে রাঢ় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিসাবে ইতিহাসের স্বীকৃতি আছে বর্ধমানের, আজ সেখানেই তার পূর্ব অথবা পশ্চিমাংশে, অন্তত তার সমৃদ্ধ শহরাঞ্চলে সেই সংস্কৃতির কোন চিহ্ন আদৌ অবশিষ্ট আছে কিনা গবেষকরাই একমাত্র তা নির্ধারণ করতে পারেন। হয়তো এখনও লুপ্ত প্রায় সেই প্রাচীন সংস্কৃতির অতি ক্ষীণ কোন ধারা বহু রূপান্তরের বাঁকাচোরা পথ বেয়ে অন্তঃসলিলার মতো কোনও ভাবে কোথাও বেঁচে আছে মানুষের অবচেতনায়। তবে সর্বত্রই যেমন দেখা যায়, দেশজ সংস্কৃতির প্রধান একটি ধারা পাশাপাশি গ্রামীণ খাত ধরে বয়। সমকালীন সংস্কৃতির প্লাবনে পুরাতন বহু কিছুই ভেসে গেলেও নতুন পরিস্থিতিতেও কিছু টিকে থাকে, হয়তো নব আবরণে। বর্ধমানের ক্ষেত্রে এটা কতোখানি সত্য গ্রামন্তরে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণই সেই তথ্য আমোদের পৌঁছে দিতে পারে। এখানে গ্রামীণ নয়, আমরা শহুরে সংস্কৃতির বিষয়েই আলোচনায় আগ্রহী।

সমকালের সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তার পটভূমির একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। অতীতে ধর্মের যে ভূমিকা ছিলো আধার এবং সমাজের চালিকা শক্তি হিসাবে, যা ছিলো সংস্কৃতিরও উৎস স্বরূপ, বহুলাংশেই সেই শক্তির প্রাবল্য আজ হ্রাস পেয়েছে। একমাত্র কিছু মৌলবাদী ব্যতীত সমাজ জীবনে ধর্মের সেই পূর্বের অবস্থান ফেরানোয় কেউই আজ আর বড় একটা উৎসাহী নয়। পাশাপাশি এটাও লক্ষণীয় যে সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মের ফেলে যাওয়া এই শূন্যস্থান যুগধর্মে দ্রুত পূরণ করেছে রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা আজ অনুভব করতে পারি তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। এর শুভাশুভ দিকগুলি নিয়ে কোন বিতর্কে এখানে আমরা যাবো না। শুধু এটুকুই মনে রাখবো যে কোন অঞ্চল বিশেষে নয়, ইদানিন্তন সময়ে দেশের সীমানা অতিক্রম করে আজ এটি এক সাধারণ চিত্র ও চরিত্র।

কোন এক বিশেষ ভূখণ্ডে যে এক সাধারণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, তার মধ্যেই মৌচাকের প্রকোষ্ঠের মতো, সেই একই সংস্কৃতির যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গুলি ধরা থাকে - যেমন, ভারতীয় সংস্কৃতির একই পরম্পরার মধ্যেও প্রদেশগুলির সাংস্কৃতিক নিজস্বতা - সমকালের আরও একটি উল্লেখনীয় বিশেষত্ব এখানে যে সংস্কৃতি কোন এক অঞ্চল বা দেশের সীমানায় আর আবদ্ধ থাকছে না। বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির দৌলতে এক অর্থে পৃথিবী আজ অনেক ছোট হয়ে এসেছে, এক প্রান্তের ভাব আর ভাবনা পৃথিবীর অন্য অংশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দীর্ঘ প্রতীক্ষার যুগ এখন শেষ হয়ে গেছে। এবং হয়তো বা অত্যুক্তি হবে না একথা বলায়, তেমন স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও একটা বিশ্বজনীনতার আবেদন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে পৃথিবীতে। দূরত্বের অবসান ঘটিয়ে দূর যেখানে নিকট হয়ে আসে।

এতক্ষণ আমরা সমাজ এবং সংস্কৃতির মোটামুটি এক পটভূমি ও তার সাধারণ চারিত্র্য আর লক্ষণগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। এখন, আলোচনায় মূল বিষয়টিতে আসা যাক।

বর্ধমানের কৃষি আর শিল্পাঞ্চল এ-দুটি অংশের মধ্যে, নেহাৎই রুক্ষ আঁচড়ে, এখানে আমরা শিল্পাঞ্চলটিকে নিয়েই প্রাসঙ্গিক কথা শুরু করছি।

শিল্পাঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত মহকুমা দুটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, মহকুমার ওই সদরশহর দুটি ছাড়াও এ-অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি কেন্দ্র আছে, সংস্কৃতির চর্চার উৎকর্ষ যেখানে কিছু কম নয়। যেমন : রূপনারায়ণপুর,

চিত্তরঞ্জন, দিশেরগড়, কুলটি, বরাকর, বার্ণপুর, রাণীগঞ্জ এবং অণ্ডাল । কিন্তু আলাদা করে উল্লিখিত প্রতিটি শহরকেই আলোচনায় না এনে, এখানে আসানসোলকেই আমরা একটা মডেল হিসাবে ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। সমগ্র শিল্পাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ধারা এবং পরিবেশের এক সাধারণ ছবি যেখানে ধরা পড়ে বলেই আমাদের ধারণা।

শিল্পাঞ্চলের আজকের যে মিশ্র সাংস্কৃতিক চরিত্র, অনেকের মতে, শিল্পাঞ্চল রূপে গড়ে ওঠার পরবর্তীকালের ঘটনা সেটা নয়, তার একটা ঐতিহ্য আছে। এতদাঞ্চলের আপাত ঊষর ভূমিতে বিভিন্ন পর্যায়ে শিল্পস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই, মূলত জীবিকার সন্ধানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ব্যাপক ভাবে এখানে এসে জড়ো হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ভাষা ছিলো আলাদা, ভিন্ন তাঁদের রুচি ; মানসিকতা ; আর সাংস্কৃতিক চেতনা। বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প সংস্থাগুলিতে কর্মসূত্রে বহু ইউরোপীয়ও সেদিন এখানে এসেছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ তাঁরা অনুপস্থিতি হলেও, একদা তাঁদের প্রবল উপস্থিতির ছাপ তাঁরা রেখে গেছেন স্থানীয় সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে। স্থানীয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারগুলি আজও তাঁদের স্তিমিত স্বাতন্ত্র্যে, সেই সাদা ; কর্তৃত্বপরায়ণ মানুষগুলির কথা যেন মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তারও আগে, দূর অতীতের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই আরও একদল মানুষ তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচয়ে এখানে এসেছিলেন। তদানীন্তন বর্ধমানের সন্দেহভাজন জায়গীরদার শের আফগানের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর এক সৈন্যদলকে পাঠিয়েছিলেন। আর তারা এসে ছাউনি গেড়ে ছিলো আসানসোলের নিকটবর্তী পঞ্চকূট পাহাড় ও সংলগ্ন এলাকায়, এবং নিয়ামৎপুরে। সেই মুঘল নজরদার বাহিনী বাধ্যতই বেশ কিছু কাল সেখানে ঘাঁটি করে থাকায় স্থানীয় মানুষ আর সমাজের সঙ্গে ক্রমে একটা সম্পর্ক এবং ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্র গড়ে তোলে। প্রয়োজন শেষে বাহিনীর মূল অংশ স্বস্থানে ফিরে গেলেও, বেশ কিছু সেনা আর ফিরে যাননি। তাঁরা নানা কারনে স্থায়ী ভাবে এখানেই থেকে যান। আকৃতি প্রকৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্ন গোত্রের সেই মানুষেরা স্থানীয় জনসমাজে ক্রমান্বয়ে মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিতেও করেছেন এক অন্য মাত্রার সংযোজন। বস্তুত আসানসোল এবং তৎসংলগ্ন যে বিশাল শিল্পাঞ্চল পরবর্তীতে গড়ে উঠেছে তার মিশ্র সংস্কৃতির একটা উত্তরাধিকার আছে, শিল্পস্থাপনার পরে সেটা এক নির্দিষ্ট সময় থেকে গড়ে উঠেছে এমন নয়। তবে অবশ্যই, প্রায় দুশ বছর আগে এতদাঞ্চলের মাটির নীচে যখন কয়লা আবিষ্কৃত হলো তখন থেকেই প্রকৃত পক্ষে তার সর্বজনীন চরিত্র অর্জনের শুরু। চরিত্রের যে বিশ্বজনীনতা যে কোন বৃহৎ শিল্পাঞ্চলেরই সাধারণ স্বভাব লক্ষণ। এবং এই একই পরিচয় আমরা খুঁজে পাই স্বাধীনোত্তর যুগে প্রতিষ্ঠিত আজকের দুর্গাপুরেও। আমরা আগেই দেখেছি শিল্প স্থাপনার সঙ্গে আসে উন্নত প্রযুক্তি, আসে গতি, আর সেই সঙ্গেই বহিরাগত অনেক মানুষ। ফলে সেই সঙ্গেই বহিরাগত অনেক মানুষ। ফলে পূর্বতন সমাজের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দ্রুত ভেঙে যেতে থাকে; এবং বহু যোগ বিয়োগের ফলশ্রুতিতে উঠে আসে এক নতুন মানসিকতা, গ্রহণ ক্ষমতা যার ঢের বেশী, এবং স্বভাব ধর্মেই যা রক্ষণবিরোধী।

শিল্পাঞ্চলের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র আজকের আসানসোলকে যে রূপ ও আকারে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, এমনকি সদ্য-স্বাধীনোত্তর যুগেও সেটি এমন ছিলো না। সেদিনও আসানসোল ছোটখাটো, যদিও বর্ধিষ্ণু, এক মফঃস্বল শহরই মাত্র। সেই ছোট মাপের ব্যবসায় কেন্দ্রটির চারিদিক ঘিরে, নিকটে ও দূরে ইতিমধ্যেই যদিও

ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো কয়লা শিল্প, চলতি শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারী শিল্পের পত্তন হয়েছে বার্ণপুর ও কুলটিতে। কারখানা আর খনির ঘুরন্ত চাকায় যে সর্বক্ষণ ব্যস্ততা তার সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও, সরাসরি ভাবে সেখানে যারা বাঁধা পড়েনি সেই সব কৃষি ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত স্থানীয় মানুষ, শিল্পায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নিরন্তর ধাক্কায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে ক্রমশই পিছু হটছিলো। রূপান্তর ঘটছিলো তাদের চিন্তা ও চেতনায়। ইতিপূর্বে, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই কয়লা শিল্পের ব্যবসায়িক স্বার্থে, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বাগ্রে তৎকালীন এক প্রাযুক্তিক বিস্ময় স্টীম এঞ্জিন চালিত রেল চলাচল শুরু হয়ে গেছে হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত। কিছুকাল পরেই আসানসোলও যুক্ত এই রেল যোগাযোগে। এক্ষেত্রেও এটা অনস্বীকার্য যে, পরিবহন ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছিলো যে রেল তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপক সংযোগ প্রথম ঘটেছিলো এই শিল্পাঞ্চলের মানুষেরই। যাই হোক, এই রেলকে কেন্দ্র করেই আরও একটা পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিলো আসানসোলে। রেলের বিভাগীয় কর্মকেন্দ্র হিসাবে একদার ছোট সেই জনপদে আরও অনেকের মতো এসেছিলেন এক ঝাঁক শিক্ষিত, সংস্কৃতি মনা, মধ্য ও নিম্ন বিত্ত পরিবারের বাঙালি যুবক। বহিরাগত এই সব যুবকেরাই পরে আসানসোলের বর্তমান যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সেইটি গড়ার কাজে উদ্যোগী হন। কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে বহু মানুষের মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট আসানসোলের সাংস্কৃতিক আদলটি বিশেষ এক রূপ নেবার আগেই, সুপ্রাচীন জনপদ রাণীগঞ্জ আর সুস্পষ্ট ভাবে বার্ণপুরে সংস্কৃতি নিজস্ব একটা মানে খুঁজে পেয়েছিলো।

সমৃদ্ধ কয়লার খনি পরিবেষ্টিত রাণীগঞ্জ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্তও শিল্প আর ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে যে গুরুত্ব পেয়েছে, আজ তার স্থান সেই উচ্চতায় আর নেই। ভৌগোলিক কারণেই মুখ্যত দামোদর তীরবর্তী রাণীগঞ্জ থেকে ১৯০৬-এ মহকুমা সদর স্থানান্তরিত হয় আসানসোলে, কয়লা শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসাবেও ক্রমশ তার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। রাণীগঞ্জকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটি তৈরী হয়েছিলো পরিচয়ে তা মিশ্র প্রকৃতির। জীবিকার সন্ধানে একদা বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসীদের সঙ্গেই এসেছিলেন অবাঙালি মুসলমানেরাও। যেমন স্বাধীনতার পরে ব্যবসার সূত্রে যথেষ্ট সংখ্যায় এসেছেন মাড়োয়ারি, শিখ ও গুজরাটী সম্প্রদায়। স্থানীয় অর্থনীতি মূলত আজ তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে কিন্তু মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্য মেনেই সম্প্রদায়গত অসম্প্রীতির তেমন কোন চিহ্ন এখানে চোখে পড়ে না। বরং নৈকট্যের এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, স্থানীয় ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানরা তাঁদের উপাসনায় বাঙলাকেই ভাষা হিসাবে শুধু ব্যবহার করেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা সঙ্গীতকেও তাঁরা চার্চে গেয়ে থাকেন। রাণীগঞ্জের সংস্কৃতি চর্চায় স্বাধীনতা পূর্ব ও তৎপরবর্তী কালেও কিছুটা, সিয়ারসোলের জমিদার পরিবারের পর্যাপ্ত ভূমিকা ছিলো। সারস্বত ব্রাহ্মণ মালিয়া পরিবারের বড় কুমার পশুপতিনাথ ছিলেন এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতা আর সক্রিয় অংশ গ্রহণে তৈরী হয়েছিলো - গঙ্গা সিন্ধু পার্টি। নিয়মিত ভাবে যাত্রা, নাটক এবং সঙ্গীতের চর্চা করতো এই সাংস্কৃতিক সংস্থাটি।

আসানসোলের সন্নিকটে বার্ণপুর ইস্পাত নগরী রূপে গড়ে ওঠে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আর এই বার্ণপুরের সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, অনেকের অভিমতে, আসানসোলেরও সাংস্কৃতিক অবয়ব গঠনের কাজে পাথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে ভারতী ভবন। বার্ণপরের এই সাংস্কৃতিক সংস্থাটি ইসকোয় কর্মরত তদানীন্তন শিক্ষিত ও রুচিবান কিছু বহিরাগত বাঙালীর

প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিলো ১৯২০ সালে। সংস্থাটি গঠনের কাজে কোম্পানীর তৎকালীন উচ্চপদাধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতাই মাত্র নয়, পরিচালকবর্গের সহায়তাও ছিলো যথেষ্ট। ১৯৪৮-এ নামান্তরিত হয়ে ভারতী ভবন হওয়ার আগে পর্যন্ত, সংস্থাটির নাম ছিলো বার্ণপুর ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট। প্রথম দিকে অবসর বিনোদনের উপযোগী কিছু খেলাধুলো এবং সখের নাট্যচর্চা ব্যতিরেকে সংস্থার বড় কোন কাজ ছিলো না। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, খেলাধূলা নাটক যাত্রার পাশাপাশি প্রভূত উৎসাহে শুরু হয় সাহিত চর্চা। এছাড়া রেওয়াজ মতোই দুর্গা আর কালী পুজোর আয়োজন তো ছিলোই। সাহিত্য প্রেমী সদস্যদের আগ্রহে ৪৩-এ 'রবি চক্র' নামে এক স্টাডি সার্কল গঠিত হয় ভারতী ভবনে। উদ্যোগটা নিয়েছিলেন ভারতী ভবন পাঠাগারের সদ্য ভারপ্রাপ্ত তদানীন্তন সম্পাদক কালীপদ সিংহ মশায়। তাঁরই তত্বাবধানে রবি চক্র নিয়মিত রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কিত চর্চা ছাড়াও, মাসিক বৈঠকে অন্যান্য সাহিত্যিকের সঙ্গে স্থানীয় লেখকদের রচনাও পাঠ ও আলোচনা করতো। শিক্ষা প্রসার আর বিদ্যালয় স্থাপনার কর্মকাণ্ডেও পরবর্তীতে জড়িয়ে পড়ে ভারতী ভবন। ১৯৭২ থেকে বার্ণপুরে ভারতী ভবনেরই উদ্‌যোগে শুরু হয়েছিলো বঙ্গ সংস্কৃতির এক মিলন মঞ্চ সৃষ্টি করা। এই সম্মেলনের মাধ্যমে কুটীর শিল্প এবং লোক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও, নাট্যচর্চা আর সঙ্গীতকেও স্থানীয় শিল্পাঞ্চলে তাঁরা উৎসাহিত করতে চেয়েছেন, সেই সঙ্গে চেয়েছেন তা ছড়িয়ে দিতেও। আর এভাবেই, তার সমগ্র প্রয়াসের ভিতর দিয়ে ভারতী ভবন বার্ণপুরে, তথা আসানসোলেও এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধার দায়িত্ব বহন করেছে।

এদিকে, যখন অদূরের বার্ণপুরে স্বাধীনতার বেশ কিছু কাল আগেই সাংস্কৃতিক এক জাগরণ ঘটে চলেছে । গড়ে উঠছে এক নতুন পরিবেশ, তখনও খোদ আসানসোলে এমনকি ১৯৪৫-এও লোক সংস্কৃতির স্পষ্ট অস্তিত্ব। সেখানে সসমারোহ মনসা আর গাজনের উৎসবে স্থানীয় মানুষের সমাগম। যদিও ১৯৮৫-৮৬ সালেই রেল ও অন্যান্য শিল্প সংস্থায় কর্মসূত্রে যুক্ত শিক্ষিত বাবু শ্রেণী তাঁদেরই প্রয়োজনে গঠন করেছিলেন - ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট্, পরে যার নাম বদলে হয় সুভাষ ইন্স্টিটিউট্। ঠিক যেমন, সমসময়েই আসানসোলে গড়ে উঠেছিলো সাহেবদের একান্তই নিজস্ব সংস্থা - ইউরোপীয়ান ইন্স্টিটিউট্, বর্তমানে ডুরাণ্ড ইন্স্টিটিউট্ নামেই যার পরিচিতি। গোড়া থেকেই দুটি সংস্থারই উদ্দেশ্য ছিলো সীমায়িত, আর তাই অস্তিত্ব থাকলেও স্থানীয় সমাজের সঙ্গে তার কোন মানস সংযোগ ঘটেনি। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন কিছু ব্যক্তি ৪৭ এর কিছু আগে ও পরেও, বিচ্ছিন্ন ভাবে মাঝেমধ্যে চেষ্টা করেছিলেন এই দূরত্ব সরানোর। যেমন, ইস্টার্ন রেলওয়ের স্কুলের শিক্ষক প্রয়াত কালীপদ ঘটক মশায় রেলেরই কতিপয় পদাধিকারীর সহযোগিতায় গড়ে ছিলেন - মিলনী সংঘ। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেদিনের সেই অনুর্বর জমিতে কাজের কিছু চেষ্টা সত্বেও, কার্যত স্থানীয় সমাজে সংস্থাটি স্থায়ী কোন ছাপ রাখতে অসমর্থ হয়। কিন্তু, পরিস্থিতির বড় একটা পরিবর্তন ঘটে যায় ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫-র অন্তবর্তী দশটি বছরে। ৪৬ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় আসানসোলে। আর এই কাজে সোৎসাহে ; আরও কিছু বিশ্বাসে বামপন্থীর সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন প্রয়াত বিজয় পাল, রাম শংকর চৌধুরীর মতো ব্যক্তিরা। সংস্কৃতির সঙ্গে গণ-সংযোগ স্থাপনার কাজে সংগঠিত ভাবে তাঁরাই প্রথম সচেতন চেষ্টা করেছিলেন আসানসোলে। ভূমিস্তরে সাংস্কৃতিক চেতনার বীজ বপনের উদ্দেশে পাশাপাশি এগিয়ে এসেছিলো সমধর্মী গণনাট্য সংঘও। আর এই কাজে অনেকটাই সফলও হয়েছিলো সংস্থা দুটি। ক্রমশঃ চেতনার একটা উল্লেখ ঘটছিলো স্থানীয় সমাজে। ঠিক এরকমই একটা পরিবর্ত্তনোল্লেখ সময়ে ; ১৯৫৩-য়, শিল্পাঞ্চলের

বিশিষ্ট এক সাহিত্য পত্র অধুনা স্তব্ধ 'কবিকন্ঠ' সম্পাদক অসীমকৃষ্ণ দত্ত, কল্লোল যুগের সাহিত্যিক একনিষ্ঠ সংস্কৃতি কর্মী প্রয়াত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীলেন্দু রায়, চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা প্রমুখের উদ্যোগে চমৎকার একটি সংগঠন গড়ে ওঠে আসানসোলে, নাম : রবীন্দ্র সরণী। উচ্চ স্তরের এই সাংস্কৃতিক সংস্থাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিলো কল্লোল যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের। নিয়মিত সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক চর্চা ছাড়াও, সংস্থাটির শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে বিশ্বভারতীর অনুমোদিত এক শিক্ষাসূচী গ্রহণ ও তার রূপায়নের চেষ্টাও করেছিলো। বাৎসরিক ছয় দিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতো সংস্থাটি, আসানসোলে যা বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিলো একসময়।

নাট্য চর্চার একটা ধারাবাহ, যদিও সৌখিন, আসানসোলে বরাবরই দেখা গেছে । পঞ্চাশের দশকের শুরুতেও সুভাষ ইন্স্টিটিউট, মিলনী সংঘ, এবং বিশেষ ভাবে টেলিফোনস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব নিয়মিত ভাবে নাটক প্রজোজনা ও মঞ্চস্থ করতো । সাধারণত : ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকই গতানুগতিক ভাবে পরিবেশিত হলেও কিছু পরীক্ষমূলক প্রযোজনাও দেখা যেতো মাঝে মাঝে, যেমন স্থানীয় নাট্যকারদের রচিত নাটক মঞ্চস্থ করার সাহসও দেখিয়েছে দু - একটি সংস্থা । নিজেদের নাট্য চর্চার পাশাপাশি টেলিফেনেস্ রিক্রিয়েশনে ক্লাব এবং সুভাষ ইন্সিটিটিউট্ কর্তৃপক্ষ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজনও করতেন নিয়মিত । আর নাট্য চর্চার এই ধরতাই মেনেই বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও ' সতীর্থ ', ' বলাকা ', ' শিল্পীচক্র '- র মতো সংস্থাগুলি নাটকে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে চলেছে । শুধু যে আসানসোলেই এমন মাত্র নয়, সমগ্র শিল্পাঞ্চলেই নাট্যচর্চার একটা সাধারণ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় । বাণপুরের ' দিশারী ', ' অগ্নিবীণা ' স্বক্ষেত্রে উজ্বল দুটি নাম । এই সমস্ত নাট্য সংস্থাগুলির প্রযোজিত নাটক, চরিত্রে মুখ্যত প্রতিবাদী । সহজবোধ্য কারণেই যুগান্তকারী কোন কাজ এই সংস্থাগুলি হয়তো করতে পারে না, কিন্তু যেটকু তারা করে আন্তরিকতায় সেখানে কোন খাদ নেই । এবং অত্যুক্তি হবে না একথা উল্লেখে যে ক্ষেত্র বিশেষে এদের কাজ কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গেও তুলনীয় । চারিত্র্যে পার্থক্য থাকলেও দূরবর্তী চিত্তরঞ্জনেও যাত্রা ও নাটকের ভালো চর্চা আছে, সংস্থা হিসবে উল্লেখযোগ্য নাম সেখানে বাসন্তী এবং শ্রীলতা ইন্স্টিটিউশন্ । ইশাত নগরী দুর্গাপুরও এক্ষেত্রে আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কিন্তু, একদা সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে শিল্পাঞ্চলে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো দিশেরগড়, নাটকেরই প্রয়োজনে ঘুরন্ত মঞ্চও যেখানে স্থাপন করতে হয়েছে একদিন, তার স্থান আজ ততো উচ্চে আর নেই ।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে আসানসোলের সাঙ্গীতিক ক্ষেত্রটির দিকে দৃষ্টি রাখলে আমাদের চোখে পড়ে তা অপ্রশস্তই শুধু নয়, ছিলো দীন । সেদিন লোকসঙ্গীতের ধারায় ভাদু টুসু, বাউল আর কীর্তনের চলই ছিলো প্রধান । উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অতি ক্ষীণ একটি ধারা স্বাধীনতার কিছু আগে তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন বাঁকুড়ার শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় পাত্র মশায় । ছিলেন নরহরি গোস্বামী এবং সেতারী শ্রীহরি গোস্বামী । কিন্তু সেটা খুব বড় করে দেখলেও, বলা যায় নিছকই প্রস্তুতি পর্ব । প্রকৃত পক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা শুরু হয় আসানসোলে, '৪৭ - এর পর থেকে । আর এক্ষেত্রে পথিকৃত, কন্ঠ শিল্পী মিহির সিংহরায় মহাশয় । প্রায় একক প্রয়াসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্র প্রস্তুতির যে কাজ তিনি '৪৭ সালে শুরু করেছিলেন, পরবর্তীতে আরও কিছু গুণী শিল্পীর প্রযত্নে সেই ক্ষেত্রটিই পত্রে - পুষ্পে ভরে উঠে সমৃদ্ধ এক বাতাবরণের সৃষ্টি

করেছে আজ আসানসোলে। জনপ্রিয় লঘু সঙ্গীতের স্বাভাবিক চর্চার পাশাপাশি, আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনগুলিও স্থানীয় মানুষকে এখন নিয়মিত টানে। আসানসোলের তরুণতর প্রজন্মের বেশ কয়েকজন শিল্পী সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন ইতিমধ্যো। মাগীয় সঙ্গীতের অনুত্তরাধিকারের মতোই, ললিত কলার চর্চা ও তার কোন পরিবেশও প্রাক - স্বাধীনতা যুগে আসানসোলে ছিলো অনুপস্থিত। স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা প্রয়োজনে যে মূর্তিগুলি গড়তেন সেকালে, তা নিতান্তই পুতুল পর্যায়ের। কিন্তু পরিস্থিতির মৌল একটা পরিবর্তন ঘটে যায় ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুলের কলা শিক্ষক হিসাবে আসানসোলে রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য মশায়ের আগমনে। স্বাধীনোত্তর কালে উত্তরবঙ্গের এই শিল্পী মানুষটিই প্রথম রঙ ও তুলির জগৎটিকে মেলে ধরেন আসানসোলবাসীর উদ্দেশে। পরবর্তী সময় কালে নিজস্ব শিল্প সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলে শিল্প চেতনার বিকাশ ঘটানোর কাজেও পর্যায়ক্রমে আরও অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি নাম, অমরেশ বিশ্বাস। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বশিক্ষিত এই শিল্পী শুধু ছাত্রদেরই নয়, আসানসোলের তরুণ প্রজন্মকে শিল্পচর্চা ও চেতনার প্রসারে নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন। বর্তমানে, আসানসোলের বেশ কিছু আর্ট কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতির বিভিন্ন ধারায় স্বনিষ্ঠ কাজ করে চলেছেন। তবুও শিল্পের এই ক্ষেত্রটিতে প্রত্যাশিত চেতনার প্রসার আসানসোলে সম্ভবত আজও ঘটেনি। আর তাই, তরুণ প্রজন্মের অভিমানী শিল্পীদের এমন অনুযোগও কানে আসে আমাদের যে, আসানসোলের মানুষ একখানা ছবি আর একটা ক্যালেন্ডারের তফাৎ করতে পারে না! হয়তো শিল্পীদের এ একান্তের অভিমান। আর যেন তারই সাক্ষ্য দেয় নির্মীয়মাণ রবীন্দ্রভবনে স্থায়ী একটি আর্ট গ্যালারী স্থাপনায় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে। সম্প্রতি স্থানীয় শিল্পীদের নিজস্ব সংগঠন 'সিলভার প্যালেট আর্টিস্ট গ্রুপ' গঠিত হয়েছে আসানসোলে। অমনস্ক সাধারণের মধ্যে শিল্প চেতনার উন্মেষ ঘটানোই সংগঠনটির প্রধান লক্ষ্য।

শিল্প ও সংস্কৃতির ব্যাপ্ত ক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখায় চিত্রটি যেমনই হোক, আসানসোল শিল্পাঞ্চলে সাহিত্য চর্চার কিন্তু শক্তিশালী এক প্রবাহ আছে। আমাদের মনে হয় শিল্পাঞ্চলের সাম্প্রতিক সাহিত্য শুধু এই বিষয়েই সারগর্ভ একটি সম্পূর্ণ নিবন্ধ রচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এখানে সে অবকাশ আমাদের নেই। এটুকুই শুধু উল্লেখ করবো আমরা যে, বাঙালীর সাহিত্য প্রীতির ঐতিহ্য মেনেই স্বাধীনতার পূর্ব এবং পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে যাঁরা এসেছিলেন আসানসোলে, তাঁদেরই ঐকান্তিক প্রয়াসে তৈরী হয়েছে এখানকার সাহিত্য আকাশ। কল্লোল যুগের খ্যাত বা স্বল্পখ্যাত কয়েকজন সাহিত্যিক এখানে জীবিকাসূত্রে যেমন এসেছেন, তেমনই সাহিত্যের তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিতে লেখালিখি ছাড়াও ; অনেকেরই সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো প্রথিতযশা সেই সময়ের সাহিত্যিক বৃন্দের। ভারতী ভবন আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনগুলিতে, একমাত্র মোহিতলাল মজুমদার ছাড়া অতীতের এমন কোন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক নেই যিনি আসেননি কোনও না কোন সময়ে। এর একটা প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেছে আসানসোলে। ক্ষেত্রটা মজবুত হয়ে উঠেছিলো ক্রমশ। আজ, মূলত লিট্‌ল ম্যাগাজিন নির্ভর স্থানীয় সাহিত্য এমন এক চারিত্র্য অর্জন করেছে আপন বৈশিষ্ট্যেই যা সমুজ্জ্বল। শিল্পাঞ্চলের রুক্ষ ধূসর মাটি, তার সামাজিক পরিবেশ, খনি, ইস্পাত চিমনীর ধোঁয়া, শ্রমজীবি মানুষের পিষ্ট মুখের ছবি যে ভাবে স্থানীয় সাহিত্যে উঠে আসে, অনুরূপ ছবি কৃষি অঞ্চলের সাহিত্যে আমরা বড় একটা দেখিনা। স্পষ্টই মনে হয়, শিল্পাঞ্চলের সাহিত্য যেন মানুষের অনেক কাছাকাছি। যেমনটি অন্যত্র নয়। সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার

চেষ্টাও সেখানে যে অবিরত, ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয় । ক্রমান্বয়ে ভাঙা-গড়ার একটা খেলা চলছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যা তার সাহিত্যের স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

বর্তমানে আসানসোলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নতুন এক আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে আবৃত্তি চর্চায়। যেমন সুস্থ চলচ্চিত্র বোধ আর দর্শক তৈরীর চেষ্টায় ব্রতী সিনে ক্লাব সংস্কৃতিতে যোগ করেছে নূতন মাত্রা। '৮০-র দশকের শুরু থেকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখনীয় সংযোজন যুব শিল্পী সংসদ আয়োজিত, আসানসোল বই মেলা। ইদানীং এই শিল্পাঞ্চলে হিন্দী আর উর্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাও বেড়ে গেছে বহুলাংশে। আর, সুস্থ স্বাভাবিক এই পরাম্পরাগত সংস্কৃতির ধারায় যেন কিছুটা উপসর্গেরই মতো, অতি সম্প্রতি সদ্য তরুণ ; কিশোর ও কিশোরীদের এক অত্যাধুনিক জীবন চর্চাও আমরা লক্ষ্য করি এই শিল্পাঞ্চলে। ভি ডি ও, ভি সি আর-এর দাপটের সঙ্গে তাল মেলাতেই, প্রথাগত নৃত্য শিক্ষালয়ের পাশাপাশি গড়ে উঠছে ব্রেক ডান্স স্কুলও। আর এই সব কিছুরই সহাবস্থানে, মিলে মিশে, আজকের আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সংস্কৃতি। চরিত্রে যা মিশ্রিত।

আজ আসানসোলে জন সংখ্যার বিচারে বাঙালী সংখ্যা লঘু হলেও, স্থানীয় সংস্কৃতিতে তার অধিকার এখনও গৌণ হয়ে দাঁড়ায়নি। এবং আলোচনায় এটা আগেই লক্ষ্য করেছি আমরা, এই সংস্কৃতি আসানসোলের আদি অধিবাসীদের সৃষ্ট নয়। যদিও সম্প্রতি, এই আদি অধিবাসীদের মধ্যে এক নব-জাগরণের সূচনা চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ে - তবু স্বীকার্য, আসানসোলের সংস্কৃতি বহিরাগতেরই হাতে গড়া। বিশেষত, বহিরাগত সেই সব বাঙালী বিভিন্ন সময়ে জীবিকাসূত্রে যাঁরা এসেছিলেন। স্বভাবতই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজ তাঁদেরই প্রাধান্য এখানে। অবশ্যই, স্বতন্ত্র্যের সব চিহ্ন মুছে তাঁরা আজ স্থানীয় মানুষ। আসানসোলই তাঁদের প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা।

বিংশ শতাব্দীর এই শেষ বেলায় সারা বিশ্বেই আজ ভাঙচুর আর অস্থিরতা। শিল্পাঞ্চলে তার উন্মত্ততা যেন আরও বেশী। অর্থ রাজনৈতিক নানা সূক্ষ্ম টানাপোড়েনে মানুষ এখানে প্রতিনিয়ত ভাঙে। সেই সঙ্গে অগোচরে বদলে যেতে থাকে তার সংস্কৃতি। শিল্পাঞ্চল আসানসোলও এই ভাঙা-গড়ার নিয়মেই অনিবার্য এগিয়ে চলেছে একবিংশ শতাব্দীর উদ্দেশে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান নিবন্ধ রচনায় যাঁরা প্রভূত সাহায্য করেছেন ঃ

অধ্যাপক উদয়ন ঘোষ
,, দিব্যেন্দ্রনাথ মিত্র
,, মুকুল ঘোষ
,, রামদুলাল বসু
,, অসীমকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীযুক্ত রামশংকর চৌধুরী
,, মিহির সিংহ রায়
,, কালীপদ সিংহ
,, রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রী সমরেশ দাশগুপ্ত
,, প্রিয়দর্শী বসু
এবং অনুজপ্রতিম শ্রী
দীপ্তেন্দ্রনাথ মিত্র

ক্রীড়াচর্চায় বর্ধমান

গিরিধারী সরকার

বর্ধমানের খেলাধূলার কথা উঠলেই আমার প্রায়ই দেখা স্বপ্নের কথা বারবার মনে পড়ে যায়। বর্ধমানের রাজপথ বিজয় চাঁদ রোড দিয়ে দুটো ঘোড়ায় টানা বগি চলেছে জোর কদমে। বগি দুটোই যে অভিজাত ব্যক্তির তা বোঝা যায়। প্রথমেরটি বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ইংরজের পিছনেরটি বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচাঁদের। অনেকক্ষণ ধরে পাশ না পাবার পর খানিকটা বিপজ্জনক ভাবেই প্রতাপচাঁদ কোচোয়ানকে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সামনের ইংরেজ ম্যজিস্ট্রেটের গাড়ি বেশ খানিকটা বিজ্জনকভাবেই পাশ কাটিয়ে সামনের গাড়ির পথরোধ করে দাঁড়ালেন। পরবর্তী দৃশ্য। ক্রুদ্ধ প্রতাপচাঁদের বেত্রাঘাতে ম্যাজিস্ট্রেট ভুলুন্ঠিত। এটাই কি বর্ধমানের প্রথম ঘোড়ার থুড়ি জুড়িগাড়ি রেস। বর্ধমানের ইতিহাস মানেই বর্ধমান রাজ সংশ্লিষ্ট ইতিহাস একথা বলা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেটা ক্রীড়াচর্চা বা কালচার যাই হোকনা কেন। কেননা তার আগের বর্ধমানের নবাব বা মোগল শাসকদের আমলের তেমন বিবরণ ভালো মেলে না এমনকি ক্রীড়াচর্চারও নয়।

বর্ধমান রাজাদের আমলে বিশেষতঃ উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে অন্যান্য উপভোগ্য অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল কুস্তি, পালোয়ানি বা কসরৎ প্রদর্শন ইত্যাদি কিন্তু সংগঠিতভাবে বর্ধমানের ক্রীড়াচর্চায় ইতিহাসের প্রথম ইমারতের ভিত্তিপ্রস্তর করলেন একজন বর্ধমান রাজা।

ফুটবল : বর্ধমানের প্রথম ফুটবল খেলার প্রবর্ত্তন হয় ১৮০০ সাল নাগাদ। উদ্যোক্তাদের অন্যতম নাম : অতুল ঘোষ, মন্মথ চ্যাটার্জী, প্রমদা মুখোপাধ্যায়, ভন্টুবাবু প্রভৃতি। ১৮৯০ সাল নাগাদ পাওয়া যায় দুটি ক্লাবের নাম। প্রমদা মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, পুন্ডরীকাক্ষ বসু, সুচাঁদ মুখোপাধ্যায় তৈরী করেন 'সান স্পোর্টিং ক্লাব'। অন্যদিকে মন্মথ চট্টোপাধ্যায়, গিরীণ চট্টোপাধ্যায়, রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায়, শরৎ ঘোষ, বিনোদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্পোর্টিং ক্লাব'। প্রথমটি ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড ও দ্বিতীয়জনেরা টউনহলের মাঠে খেলাধুলো করতো। এরাই একবার গোরাবিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের বিখ্যাত শিবনাথ ও বিজয় ভাদুড়ীকে বর্ধমানে এনেছিলেন। পরে দুটি ক্লাব মিলে হয় 'বাডোঁয়ান ইউনাইটেড ক্লাব'।

১৯০১ সালে রাজা বনবিহারী কপুরের পৃষ্ঠপোষকতা, সহযোগিতা এবং অর্থানুকুল্যে বনবিহারী জেলা এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন রেভারেও ললিত মোহন দে মিশনারী চার্চের একজন পাদ্রী। এছাড়া অতুলচন্দ্র ঘোষ (রাসবিহারী ঘোষের ভাই), গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় যুক্ত ছিলেন। কয়েকটি ক্লাব এবং স্কুল তৎকালীন প্রথমাংশে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে রাজা বনবিহারী নিজে তৎকালীন পুলিশ লাইনের মাঠে ইংরজ জেলাশাসক ও বিচারকদের সঙ্গে পোলো খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড তৈরী হয়। ১৯০৭ সাল থেকেই এটি বর্ধমানের অন্যতম প্রধান খেলাধূলার মাঠ। প্রধানত ফুটবলকে কেন্দ্র করেই ১৯২৯ সালে আর, এ, ইউ, সি, ওয়েস্ট বাডোঁয়ান এ্যাথলেটিক ক্লাব (WBAC) অন্যতম দুই প্রধান প্রতিযোগী ক্লাবে পরিণত হয়। পরে মিলনী, বয়েজ

ইউনাইটেড ক্লাব, বিবেকানন্দ সংঘ, জাতীয় সংঘ গড়ে ওঠে। বনবিহারী লীগ কাপ ও চ্যালেঞ্জ কাপ ছিল সব থেকে বড় টুর্নামেন্ট। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে এই প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান, শোভাবাজার, ভবানীপুর ও পরে এরিয়ান, খিদিরপুর এই রকম নানান দল অংশ নিত। ১৯০৮ সালের পরে বহু ব্রিটিশ মিলিটারী ফুটবল দলও অংশ নিতে থাকে। ১৯২৩ সালে বনবিহারী জেলা একাদশ তথা বর্ধমানের সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের এক প্রদর্শনী খেলায় ৩-২ গোলে বর্ধমানের বিজয় যেন বর্ধমানের ফুটবল তথা ক্রীড়া জগতের এক নবজাগরণ। মোহনবাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন ডি পাল। এবং দলে উমাপতি কুমার এবং গোষ্ঠ পালের মতো খেলোয়াড়ও ছিলেন। যদিও উমাপতিবাবু বর্ধমান জেলারই সন্তান। বর্ধমানের অধিনায়ক ছিলেন ফণীভূষণ সামন্ত। এবং অন্যতম সেন্টার ফরোয়ার্ড বিনোদ গোপাল রায়। পরের বছর ১৯২৪ সালে মোহনবাগান পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এলেও খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। বিনোদ গোপাল রায় বর্ধমানের একমাত্র গোলটি করেন। তাঁর খেলা দেখে বর্ধমান মহারাজা তাঁকে বর্ধমান রাজস্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ফণীভূষণ সামন্ত পরে জোড়াবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের এবং তারই সতীর্থ রাসবিহারী দাস, জাফর আলি মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেন।

কাটোয়াতে ইন্দুপদ মেমোরিয়াল কাপের প্রতিযোগিতা হতো। স্থানীয় এক ধনী ব্যবসায়ী এই প্রতিযোগিতার ব্যয় বহন করতেন। এখানে একবার বর্ধমান জেলা দল কাটোয়া টাউন ক্লাবকে পরাজিত করে, ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজিত হয়।

বর্ধমানে স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রচুর জনপ্রিয়তা ছিল। পূর্বে খেলা হতো উচ্চতা মাধ্যমে 'A', 'B', 'C' তিনটে Team Championship-এ যথারীতি A সিনিয়ার। এইভাবেই বেশীরভাগ খেলা হতো টাউন স্কুল মাঠে। এই খেলায় বেশীরভাগই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে টাউন স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল এবং বড়শুল স্কুল। রাজ স্কুল এবং সি এম এস স্কুলও মাঝে মধ্যে ভালো ফল করতো।

কিন্তু সর্বভারতীয় ফুটবলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ই বর্ধমানের নামকে স্বর্ণময় করে তুলেছে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত তিনবার সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়ে এবং কয়েকবার রানার্স হয়ে। বর্তমানে সারা ভারতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুনামী ধারাবাহিকতা বাংলা তো নয়ই পূর্বভারতেও কারো নেই। এই কৃতিত্বের অনেকটা অংশই আমরা দিতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল প্রশিক্ষক ও সহকারী স্পোর্টস অফিসার রথীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যকে। বর্তমানে বর্ধমান ১৯৮৫ সালে রাজ্য বিজয়ী জুনিয়ার বিভাগে। ১৯৮৮তে সাবজুনিয়ার, ১৯৮৯ সালে সিনিয়ার রাণার্স হয়।

বর্ধমানের একটা সর্বকালের সেরা ফুটবল দল এভাবে করা যায়। যাদু সামান্ত (অধিনায়ক)। সুবীর চ্যাটার্জী। প্রণবেশ্বর (টোগো) সরকার। দুর্গা চৌধুরী। অমর্ত্য ঘোষ। অমিয় সামন্ত। দেবাশীষ কোনার। রমেশ দাস। মথুরা ঘোষ। মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী।

বর্ধমানের এই বিষয়ে আরো স্মরণীয় ঘটনাবলী আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে করে একটি ক্লাব গড়ে উঠেছিল যার নাম 'ডায়মণ্ড জুবিলি ক্লাব' (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে)। রাজবংশ সম্পর্কিত লালা বংশগোপাল নন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় 'টাউন ক্লাব' নামে একটি ক্লাব বর্ধমানে নিয়মিত খেলাধূলার ব্যবস্থা করে। প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড় বর্ধমানে প্রচুর ছিল এখনও আছে। সম্প্রতি বর্ধমানের দেবাশীষ কোনার এই বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলছে। এই বছরেই (১৯৮৯) দেবাশীষ সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে World University Tour-এ ঢাকার

বিরুদ্ধে খেলেছে। কিন্তু বর্ধমানে প্রধানতঃ সারাবছর ধরে খেলা চালাবার ব্যবস্থার অভাব এবং Gymnasium না থাকার অভাবে খেলাধূলার বিষয়টা যেন আগের মতোই অপেশাদারী শ্লথ মনোভাব সম্পন্নই রয়ে গেছে।

ভারত্তোলন ও দেহসৌষ্ঠব : বর্ধমান জেলা ঐতিহ্যগতভাবে এই এই বিষয়টিতে রীতিমতো গর্ব করার মতো কিছু করেছে। ১৯৫১ সালে বর্ধমান জেলা বডিবিল্ডিং এ্যাণ্ড ওয়েট লিফটিং সংস্থা গঠিত হয়। যদিও এর সঙ্গে বর্ত্তমানে আর একটি সংস্থার শাখা বর্ধমানে গঠিত হয়েছে। এ্যামেচার বডি বিল্ডিং এ্যাশোসিয়েশন (কমল ভাণ্ডারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। (১৯৮৪)। কিন্তু এর অনেক আগে ১৯২৫ সাল নাগাদ বিষ্ণুচরণ ঘোষের যোগ্য শিষ্য শঙ্কর দাস বর্মণ প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রেণ্ডস স্পোর্টিং ক্লাব। প্রতিষ্ঠার কাল থেকে অদ্যাবধি কলকাতায় বাইরে বাংলা তথা বর্ধমানের অন্যতম একটি অপেশাদারী সংস্থা হিসাবে অজস্র স্বাস্থ্যবান যুবক যুবতী তৈরীর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্ত্তমানেও সেই প্রাচীন এবং সম্পূর্ণভাবে সদস্যদের চাঁদার ওপর নির্ভরশীল হয়েও এই সংস্থা ৭৫ বছর পূর্ত্তি বা প্ল্যাটিনাম জুবিলির পথে অগ্রসরমান। বর্ধমানে সম্ভবতঃ প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে দল, মত, জাতি, ধর্ম, রাজনীতি নির্বিশেষে প্রতি তিনজনের একজনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বা আছেন। বর্ধমানে উদয়চাঁদ ব্যায়ামাগার, ইছলাবাদ এ্যাথ্লেটিক ক্লাব ও কাটোয়ার আনন্দ সংঘ আর্য ব্যায়াম সমিতি, আসানসোলের বুধা ফিজিকাল কালচার, ট্র্যাফিক জিমন্যাসিয়াম, বার্ণপুরের কুমার সেভক সংঘ তৈরী হয়। দশকের পর দশক ধরে বর্ধমান, বাংলা, তথা সারা ভারত জুড়ে প্রধানতঃ ফ্রেণ্ডস স্পোর্টিং ও এইসব ক্লাবের গঠিত সদস্যরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী, আদিত্য দে, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, অমিয় দাশ, রমাপদ সাহানা, জগদীশ চন্দ্র মিত্র দেহসৌষ্ঠব ও ভারোত্তোলন জগতের উজ্জলতম নক্ষত্র যারা বর্ধমানের মুখোজ্জল করেছেন। ১৯৫৯ সালে আদিত্য দে বর্ধমান থেকে প্রথম জাতীয় প্রতিযোগী নির্বাচিত হন। ভারত্তোলনে ১৯৬০ সালে জাতীয় প্রতিযোগী (লাইট হেভি গ্রুপে)। ১৯৬৪ সালে তিনি জাতীয় প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পান। ১৯৬৬ সালে তিনি 'প্রেস' বিভাগে ভারত্তোলনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে সর্বভারতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেন। ১৯৬০-৬৬ পর্যন্ত বিমল সাধু খাঁ বর্ধমান থেকে পূর্ব রেল দলের হয়ে যোগদান করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। সুনীল বসুও জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমান জেলায় (আসানসোল) বিজয় বাহাদুর সিং (মিডল ওয়েট)। ৭৫ থেকে ৭৮ সাল অবধি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ভারত্তোলনে বিশেষ কৃতিত্বের সম্মান লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে মনোরথ বোস ফ্লাইওয়েট বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৭০-৭১ সালে তিনি জাতীয় স্তরে অংশ নেন। ১৯৭৮ সালে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বিনয় চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র হালদার প্রমুখ এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। দেহসৌষ্ঠবে কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী, আদিত্য দে, জগদীশ মিত্র, দীপ্তি কোনার, দু কড়ি মণ্ডল, চন্দ্রোদয় বণিক, আবু হামিদ, অমরনাথ শর্মা, (তৃতীয় স্থান আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৮)। খুরশিদ আলম বর্ত্তমানে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিমান। বর্ত্তমানে বর্ধমানের মধ্যে মেয়েরাও ভারত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রচুর পদক পাচ্ছেন, ফ্রেণ্ডস স্পোর্টিং ক্লাব থেকে। স্মরণ করতে হয় বর্ত্তমানেও প্রতিষ্ঠাতা এবং আততায়ীর হাতে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় নিহত শঙ্কর দাস বর্মণ নামের অগ্রদূতকে।

পর্বতারোহন, এ্যাডভেঞ্চার তথা দুঃসাহসিক ভ্রমণ : নামী অনামী অনেক ব্যক্তি দল বা সংস্থা ভ্রমণের বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে, কিংবা প্রচারহীন ভাবেও নানান দুঃসাহসিক অভিযান চালান। আমরা সর্বদা তাই সবগুলির খোঁজ পাইনা। তবে বার্ণপুর, দুর্গাপুর এবং প্রধানতঃ আসানসোল এই বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী, অগ্রসর এবং ঐতিহ্যসমন্বিত। আসানসোলের মাউন্টেন লাভার্স এ্যাশোসিয়েশন শুধুমাত্র বর্ধমান নয় বাংলারও এক বহু পুরাতন সংস্থা। এখন তাদেরই প্রদর্শিত পথে শুধুমাত্র শিল্পাঞ্চল নয় বর্ধমানের নানান ধরনের কমপক্ষে কুড়িটি সংস্থা এই দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকটি উৎসাহী যুবক বোটানী ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথম সান্দাকফু ফালুটে যায় ট্রেকিং এ ১৯৮২ সালে। ১৯৮৩ সালে তারা তেমনভাবেই প্রশিক্ষণ বা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ছয়মাস অন্তর দুবার অযোধ্যা পাহাড়ে ঘুরে আসেন। এরপর ১৯৮৫ সালে তারা প্রস্তুতি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তার যান গাড়োয়াল হিমালয়ের কালিন্দীখাল অভিযানে। এখানে সংকল্পিত একটি শৃঙ্গ জয় করার পর দ্বিতীয় শৃঙ্গটি জয়ে ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে আসেন। ১৯৮৮ সালে বর্ধমানে তৈরী হয় অভিযাত্রী নামে পর্বতারোহন সংস্থা। প্রধানতঃ গোলাম মোস্তাফা, বিদ্যুৎ রায় এবং অজয় কোনার সহ মোট বারো জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। N.C.C. থেকে কয়েকটি অভিযানের সঙ্গী তরুণ শিল্পী অভিযাত্রী মুকুল মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে বিরাট উৎসাহ ও সহযোগিতা করেন। অভিযাত্রিক কিন্তু Indian Mountaineering Federation এর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেন 'ভ্রামণিক' নামে। বেসিক ও এ্যাডভ্যান্সড ট্রেনিং প্রাপ্ত বেশ কিছু সদস্য সহ এবং রক ক্লাইম্বিং শিক্ষিত স্থায়ী অস্থায়ী মিলে প্রায় ৩০ জন মোট বর্ত্তমান সদস্য। পর্বতারোহন সংগঠন, (ক) পর্বতারোহন শিক্ষাদান ভ্রমণবিষয়ক পাঠাগার গড়ে তোলা (খ) অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের সাজ সরঞ্জাম গড়ে তোলা প্রধানতঃ এই সব লক্ষ্য কে সামনে রেখেই গড়ে উঠেছে ভ্রামণিক। ১৯৮৭ সালে তৎকালীন অজেয় ৬৩৫২ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন শ্বেতা হিমবাহের শৃঙ্গটি জয় ভ্রামণিকের টুপিতে প্রথম পালক উড়িয়েছে। ১৯৮৯ সালে গাড়োয়ালেরই কোয়ারং-১ ও কোয়ারং-২ অভিযান ভয়াবহ লাহুল উপত্যকার মধ্যে দিয়ে শৃঙ্গের পদতলে পৌঁছেও ধারাবাহিক ৮ দিন দুর্দান্ত মন্দ আবহাওয়ার জন্যে পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমানে বিভিন্ন ধরনের এই সংক্রান্ত স্লাইড শো, আলোচনা চক্র, এমনকি সংস্থার বাইরের মানুষকে সম্ভাব্য সাহায্য ও শৈলারোহণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভ্রামণিক এগিয়ে যাচ্ছে। একাধিকবার শিশুদের ক্যাম্প করেছে, ট্রেনিংও হয়েছে। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে প্রথম শৈলারোহণ শিক্ষা শিবিরের পর ১৯৮৯ সালে ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বার্ষিক শিক্ষাশিবির হতে যাচ্ছে। এ ছাড়া এই বিষয়ে অবশ্যই বর্ধমানের প্রাতঃস্মরণীয় নাম ডাঃ তারক মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি।

টেবিল টেনিস : ১৯৭০ সালে দুর্গাপুরে জেলা টেবিল টেনিস সংস্থা গঠিত। প্রধানতঃ শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে একসময় প্রায় আশির দশকের প্রথমাংশ অবধি দুর্গাপুর, আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটী, চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুরে, বরাকর, রাণীগঞ্জ ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলে খেলাটি দ্রুত প্রসার লাভ করে। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে এই খেলাকে ছড়িয়ে দেবার আদর্শ এতাবৎকাল জেলায় রূপায়িত হয়েছে বলা যায় না। দুর্গাপুরের পর এত বড় বর্ধমান জেলায় বর্ধমান সদর শহরে, কালনা, কাটোয়া

কেন্দ্রিক বৃহত্তর অঞ্চলে খেলাটি অন্ততঃ জেলা সংস্থার সহায়তায় কোনদিনই প্রসার লাভ করেনি। বর্ধমান শহরে অপেশাদারী মনোভাব নিয়ে খেলা আগে থেকে চলছে এখনো অনেক ব্যাপক সংখ্যায় খেলোয়াড় এসেছেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এবং অসংগঠিত উপায়ে বর্ধমানের জেলায় টেবিল টেনিস স্থিতাবস্থা থেকে বর্ত্তমানে নিম্নগামী। এখন দুর্গাপুরের বাইরে কোথাও কোন প্রতিযোগিতা হয় না। আবার দুর্গাপুরেও জেলা সংস্থা এই বছরে ১৯৮৯ তেমন সফলভাবে একটাও প্রতিযোগিতা করে উঠতে পারেনি। কিন্তু রাজ্যভিত্তিক মানে বর্ধমানের সুনাম যথেষ্ঠ ছিল। দলগত বিভাগে প্রায় ১৯৭২ সাল থেকে কয়েক বছর ধরে বর্ধমানের ছেলে মেয়েরা বিজয়ী ছিল। ১৯৭২ সালে শ্যামলী চৌধুরী ও সুশান্ত বক্সীর রাজ্যদলে স্থান লাভ এবং সুশান্তর সারা ভারতে বালক বিভাগে সপ্তম স্থান লাভ নিঃসন্দেহে একটা অন্যতম ঘটনা। পরবর্ত্তীকালে শতাব্দী বর্মণ, প্রদীপ সামন্ত, দেবাশীষ চৌধুরী সেই ধারা কিছুটা অক্ষুণ্ণ রাখেন। আর বর্ধমানে টেবিল টেনিস প্রসারে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও গৌতম দুবে এটি অন্যতম নাম। জেলার টেবিল টেনিস সাফল্যের আড়ালে রয়েছেন নির্মাল্য ঘোষের মতো শ্রদ্ধেয় খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক, বেণু শর্মার ন্যায় আন্তর্জাতিক রেফারী।

ক্রিকেট : বর্ধমানের ক্রিকেট চর্চা পুরাতন হলেও যথেষ্ট মানসম্পন্ন হয়েছে সাম্প্রতিক। পূর্বে টাউনস্কুলের মাঠে খেলা হতো। যাদবোত্তোম সামন্ত, অমিয়মাধব সামন্ত, এঁরা খেলতেন। সাম্প্রতিক বর্ধমান, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সারা বাংলায় একবার চ্যাম্পিয়ান ও একবার রাণার্স হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে বর্ধমান জেলা জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে সিনিয়ার চ্যাম্পিয়ান। বর্ধমানের ক্রিকেটের প্রসারে বিবেকানন্দ সঙ্ঘ একটি অন্যতম প্রাচীন নাম। বর্ত্তমানে এদের সঙ্গে নাম করা যায় শিবাজী সঙ্ঘ, মিলনী, দিলীপ স্মৃতি সঙ্ঘ এবং কল্যাণ স্মৃতি (বর্ত্তমানে দল নেই)। ক্রিকেটে একটি বর্ধমান জেলায় সর্বকালের সেরা দলের এমন নাম প্রস্তাব করা যায়। রণদ্রি ঘোষ। সুভাষ সামন্ত। মথুরা ঘোষ (অধিনায়ক)। পশুপতি চ্যাটার্জী। রাজগুরু। অমল ভট্টাচার্য্য। সত্যেন কর। অলোক লাহিড়ী। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। জাগানি। অসিত ঘোষ। শীতকালের কয়েক মাস ছাড়া বর্ধমানে ক্রিকেটের চর্চা প্রায় হয় না বললেই চলে। কোথাও ইনডোর প্রাকটিসের জায়গা নেই যেখানে সারাবছর প্রাকটিস চলে। এমনকি বাঁধানো কংক্রীটের পীচও তেমন নেই। বর্ধমানের ক্রীড়া সংস্থার আয়োজিত প্রতিযোগিতা ছাড়া মাত্র হাতগুণতে কয়েকটি প্রতিযোগিতা হয় সারা জেলায়। সুতরাং সুযোগও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

এ্যাথ্‌লেটিকস্ : এ্যাথ্‌লেটিকস্ চর্চায় বর্ধমানের বনেদীয়ানা আছে। দুর্গা চৌধুরী, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় সর্বভারতীয় রেকর্ড করেছিলেন পোলভল্টে। তিনি অতি সহজেই সাড়ে দশ ফুট পর্যন্ত লাফাতে পারতেন। তাছাড়া সেই যুগে তিনি ২২ ফুট লঙ জাম্পও দিতে পারতেন বলে জানা যায়। পরবর্ত্তী কালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার হন। অন্যান্য এ্যাথলীটদের মধ্যে জাফর আলি - লঙ জাম্পে, ফণী সামন্ত লঙ জাম্পে, ২২০ গজ, ৪৪০ গজ দৌড়ে, আনন্দ মুখার্জী পোলভল্টে, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় ১১০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে ও লঙ জাম্পে এবং আমোদ বিহারী বোস ৪৪০ গজ দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। কলিকাতা মার্কাস স্কোয়ারে অল বেঙ্গল এ্যাথ্‌লেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে দুর্গা চৌধুরী বেস্ট এ্যাথলীটের সম্মান অর্জন করেন। তাছাড়া বিনয় চৌধুরী, (বর্ত্তমান মন্ত্রী)

নিয়তি ভট্টাচার্য্য ঐ প্রতিযোগিতায় বিশেষ পারদির্শতা দেখান। উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যে করেছিলেন বর্ধমান মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব। তিনি দুর্গা চৌধুরীকে এক বিশেষ স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। বর্ত্তমান কালে বর্ধমান জেলায় (আসানসোল) কে, মীনা দশ হাজার মিটার দৌড়ে সর্বভারতীয় রেকর্ড করেছেন এবং স্বাতী চৌধুরী ১০০ মিঃ রানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ব্যাডমিন্টন ঃ বর্ত্তমানে দুর্গাপুরে যদিও জেলা ব্যাডমিন্টন সংস্থা আছে এবং বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে অন্ততঃ কারখানার আনুকুল্যে সব খেলাধূলারই চর্চার ব্যবস্থাদি যথেষ্ট তবু যথেষ্ট ভালো কতকগুলি কমিউনিটি স্টেশনে ইনডোর হল থাকার জন্যে ব্যাডমিন্টনের মতো ইনডোর খেলাগুলির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে। বর্ত্তমানে বর্ধমানে আফতাব্ ক্লাবের একটি অপ্রশস্থ হলঘরে কোনরকমে ব্যাডমিন্টনের ইনডোর হলে পরিণত করে বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থা ছোট ছেলেমেয়েদের যে সারা বছর ব্যাপী ধারাবাহিক চর্চার ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে দিয়ে (SAI) সাইয়ের প্রতিভা অন্বেষণে এবং অন্যভাবে বহু প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে । দুর্গাপুরের তানসেন ক্লাব এই বিষয়ে একটি অন্যতম নাম। বর্ধমানে বনবাস কুটীরে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বেশ উঁচু মানের অনুশীলন চলতো। বিচ্ছিন্নভাবে বর্ধমানের কয়েকটি মুখ বারংবার এগিয়ে এলেও কখনই এই খেলাটিতে বর্ধমানের ধারাবাহিক সাফল্য নেই। শম্ভুনাথ ঘোষ, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, অতীতের অন্যতম সেরা নাম। বর্ত্তমানে দেবাশীষ ঘটক রাজ্যস্তরে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। বৈদ্যনাথ ব্যানার্জীর (বদুদা) প্রশিক্ষণেই আফতাব ক্লাবে প্রশিক্ষণ চলছে। এই খেলাটিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দলে বেশ কিছু সুনামী খেলোয়াড়ও দলে আসে। সত্যেন রায় ছিল এদেরই একজন। যদিও সর্বভারতীয় স্তরে তেমন কিছু করতে পারে নি।

ভলিবল ঃ ঠিক কতো সালে শুরু জানা যায় না তবে মোটামুটি ৫০ এর দশকে বর্ধমানের ভলিবল খেলা খুব জমজমাট হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে তৎকালে তরুণ সংঘ, মিলন সঙ্ঘ, অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। পরে কল্পতরু। ক্রমে জাতীয় সঙ্ঘ, অগ্রদূত, রতন স্মৃতি সঙ্ঘ এগিয়ে এসেছে। বর্ধমানের ভলিবল জগতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানীয় নাম বিষ্ণুপদ তেওয়ারী এবং ভূতনাথ চন্দ্র। এদের যুগেই বলা চলে বর্ধমানের ভলিবল অতি দ্রুত শৈশবস্থা ছেড়ে একলাফে যৌবনে পা দেয়। ১৯৫২ সালে বিষ্ণুপদ তেওয়ারীর ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য হয়ে রাশিয়া সফর এবং বর্ধমানের ভলিবল চর্চায় তার অভিজ্ঞতা বন্টন এবং প্রশিক্ষণ দেবার কথা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ভূতনাথ চন্দ্র বর্ধমানের ভলিবল খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বকালের সেরা প্রতিভাবান ছিলেন। ৫০ এর দশকে তিনি বাংলা দলের একজন অপরিহার্য খেলোয়াড়ই নন - অধিনায়কও ছিলেন। বর্ধমানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এমনকি বাইরের কোন দলের খেলা পড়লেও তারা ভূতনাথ (ভুতোদা) দলে আছে কিনা তা আগে জেনে নিতেন। কিন্তু নিজের খামখেয়ালীপনায়, বদমেজাজ এবং একাগ্রতার অভাবে এবং কিছুটা এইসব কারনে তার ওপর অবিচারের ফলে তিনি সম্ভাবনা থাকলেও খুব বেশীদুর যেতে পারেন নি। তবু তরুণ সঙ্ঘের ভলিবলের মধ্যে দিয়ে একদিন দনুদা, আশুতোষ মিশ্র যে ঐতিহ্যর ভিত তৈরী করেছিলেন তার সুফল এখনও বর্ত্তমান। ১৯৬০ সালে দার্জিলিং-এ আন্তঃজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে বর্ধমান এক নতুন মাত্রা যোগ করে। মাঝখানে ভাঁটা পড়লেও ১৯৭৪ সাল থেকে

আবার জয়যাত্রা শুরু। প্রায় প্রতি বছরেই আন্তঃজেলায় ভলিবলে বর্ধমান হয় চ্যাম্পিয়ান বা রানার্স হয়। ১৯৮৮ সালে চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯৮৯ সালে রানার্স। বর্ধমানে বহু ভলিবল খেলোয়াড়, খেলোয়াড় হিসাবে বাংলা ভারতের নানান প্রান্তে কৃতিত্বের সঙ্গে অবস্থান করছেন। যদিও বর্ধমান জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল সংস্থা বর্ধমানে এবং তাদের একটা নিজস্ব উপযুক্ত স্টেডিয়ামও আছে কিন্তু এদের ভূমিকা যথেষ্ট নয়। বর্ধমানে ভলিবলের নানান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতার আয়োজন তারা করে থাকেন। কিন্তু জেলার ভলিবল খেলা বা খেলোয়াড়দের উন্নতি তথা নতুন প্রতিভা অন্বেষণ বা বিকাশের জন্যে যথেষ্ট করেছেন মনে করলে হয়তো একটা খামতি থেকে যায়। বর্ধমানের সর্বকালের সেরা ভলিবল দলটিকে এমনভাবে সাজানো যেতে পারে। বিষ্ণুপদ (দনু) তেওয়ারী, ভূতনাথ চন্দ্র (অধিনায়ক), দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, টি পি গোপালন, জর্জ, নবকুমার ঘোষ ছাড়া সেলিম জাফর,পীযুষ ব্যানার্জী, বিশ্বরূপ দত্ত, সুব্রত চক্রবর্ত্তী, স্বপন ঘোষ, পার্থ বোস, কার্ত্তিক দাশ, অমিত চৌধুরী স্বপন ঘোষও বর্ধমানের ভলিবলের অন্যতম সম্মানীয় নাম। ভলিবলের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক এবং আপাদমস্তক ভলিবলমনা বরুণ পাল-এর নামের সম্পর্কে উল্লেখ না করি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দল এই বিষয়ে তেমন ধারাহিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই। বর্ত্তমানে সি, এম, স্কুলের ফল অত্যন্ত সাফল্যময়।

বাস্কেটবল : বর্ধমান জেলা সংস্থা বা কোন সংগঠন হবার অনেক আগেই রাধানগরে দ্বিজপ্রসাদ মেমোরিয়াল ক্লাব নামে একটি সংস্থা বর্ধমানে ধারাবাহিক বাস্কেটবল খেলা এবং প্রতিযোগিতা চালানোর প্রচেষ্টা করে ১৯৬০ সাল নাগাদ। মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায় আব্দুর রশিদ এরা ছিলেন এই সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। বর্ধমান জেলা দল যদিও তেমন কিছু ধারাবাহিক ভালো সাফল্য দেখাতে পারেন নি। কিন্তু বর্ত্তমান টাউন স্কুলের মাঠে বাঁধানো কংক্রীটের কোর্টে বেশ কয়েকবছর ধরে রাজ্যস্তরে একটি জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা হতো। কিন্তু বর্ধমানে জেলা সংস্থা হবার পর অরবিন্দ স্টেডিয়াম কোর্টে প্রতিদিন ধারাহিক অনুশীলন শুরু হয়। বর্ধমানের কল্যাণ স্মৃতি সঙ্ঘ এই খেলায় বেশ সাফল্যময় অবদান রাখে প্রায় সারা রাজ্য জুড়ে। বর্ত্তমানে সি এম এস স্কুল দল অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছে। বর্ধমানের মেয়েদের মধ্যে অনুশ্রী পাল, মালা ঘোষ বাংলা দলে স্থান পায়। বর্ধমানের অনেক খেলোয়াড় নানান সময়ে রাজ্য দলে খেলেছেন। বর্ধমান জেলার বাস্কেটবলের সর্বকালের সেরা দলটি এমন হতে পারে :- কালিদাস ভট্টাচার্য্য (অধিনায়ক)। বনবিহারী ঘোষ। সমরেন্দ্র কুণ্ডু। হরেরাম পাল। আশীষ বটব্যাল। মহঃ ইকবাল। সন্তু। নাজেস আফরোজ।

হকি : আমার তো হাত-পা কাঁপছে। আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দলের ক্যাপ্টেন। মূলপর্বের ফাইনাল খেলা। আমি তো কোনরকমে স্টিক ধরতে পারি। আর আমার দলে রয়েছে বেশ কয়েকজন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়। একজন সেই ভারতীয় ক্যাম্প থেকে সোজা চলে এসেছে। পরে সে সেই বছরেই ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হয়। আমাকে রাত্রি ২ টোর সময় বিছানা থেকে উঠে আগামী কালের প্রস্তুতি হিসাবে স্কুপ করে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমরা চ্যাম্পিয়ান হলাম। বেশ কয়েকবার। বিশ্ববিদ্যালয়, জেলাস্তরেও। ভাবো একবার ! আমি একটা কোনরকমে স্টিকধরা ছেলে ক্যাপ্টেনসি করছি ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়দের ! বর্ধমানের

বিগতদিনের এক চল্লিশোর্ধ হকি খেলোয়াড়ের এই আন্তরিক উক্তি থেকে বর্ধমানের হকি খেলার চিত্রটা অনেকটাই পরিস্কার ফুটে ওঠে। বর্ধমানের পুলিশ লাইনের মাঠে এই কিছু বছর আগে পর্যন্ত হকি খেলা হতো। বর্ত্তমানে শিল্পাঞ্চলে এই চর্চা কিছুটা অব্যাহত থাকলেও তবু বলা চলে বর্ধমানে হকি চর্চা আগে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বেশ কিছু সম্মান এবং সুনাম অর্জন করলেও বর্ত্তমানে হকি চর্চা ভাটার মুখে।

যথাসম্ভব বর্ধমানের ক্রীড়াচর্চার একটা মানচিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আরো কিছু কথা শেষে যোগ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বর্ধমান যে সমস্ত খেলাধূলায় কখনও বা এখনও সুনামের পরিচয় দিয়েছে বা দিচ্ছে এই আলোচনায় তাদেরই প্রাধান্য রইলো। এর বাইরে অনুল্লিখিত ক্রীড়াচর্চার বিষয়গুলি গৌণ হলেও তাদের সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা বলা যায়। লন টেনিস বর্ধমানে টাউনহলে এবং শিল্পাঞ্চলের অফিসার্স মহলে চললেও তেমন জনপ্রিয় নয়। সাঁতার প্রতিযোগিতা একসময়ে টাউনস্কুলের পুকুরে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে হতো। এখন জেলায় তেমন কোন সংগঠিত চর্চা নেই। বক্সিং দুর্গাপুরে ও আশপাশের শিল্পাঞ্চলে কিছু চর্চা হয়। বর্ধমানে N.C.C., সৈনিক মহলে এবং পুলিশে মাঝেমধ্যে চলে। শ্যুটিং পুলিশ লাইনে হয় এবং N.C.C. তে । কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনে হয় ব্যাপারটা (অন্ততঃ N.C.C. তে) প্রতিযোগিতামূলক হলে আরো ভালো হতো। খেলাধূলোয় খোসবাগানের ঘোষ পরিবার এবং সামন্ত পরিবারের (যাদু সামন্তদের) যথেষ্ট অবদান আছে। বর্ধমানের বর্ত্তমান ক্রীড়া প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ক্রীড়া সংগঠন করছেন। বর্ধমানের কংগ্রেস দল (যুব কংগ্রেস) এবং বিশেষতঃ সি, পি, এম, দলের (গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন) উদ্যোগে বেশ কিছু খেলাধূলা পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে যে ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চালু হয়েছে তাতে যদি ঠিকমতো Spotter বা Watcher থাকেন তাহলে বেশ কিছু নতুন প্রতিভার সন্ধানের মাধ্যমে বর্ধমানের ক্রীড়াচর্চা নতুন মোড় নিতে বাধ্য।

ঋণ স্বীকার :-

বরুণ পাল, রথীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, গণপতি মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি কুমার ঘোষ ও রাখহরি সরকার।।

যে সব পত্রপত্রিকা থেকে সাহায্য পেয়েছি :

১। বৈশাখী পত্রিকা

২। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল শতবর্ষ স্মরণিকা

৩। শারদীয়া বর্ধমানের বার্তা

৪। উদয় অভিযান বর্ধমান বিশেষ সংখ্যা (১৯৭৩)

পরিশিষ্ট ঃ

বর্ধমানের স্বাস্থ্যচিত্র

বর্ধমান জ্বর ঃ একদা স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ বর্ধমান জেলা ১৮৬২ থেকে ১৮৭৪ এক ভয়াবহ রোগের কবলে পড়ে । 'ম্যালেরিয়া 'জাতীয় এই বর্ধমান রোগকে 'বর্ধমান জ্বর ' নামে অভিহিত করা হয় । জেলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ ' বর্ধমান জ্বরের ' প্রকোপে মারা যান । প্রথমে কালনা মহকুমায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় পরে সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ে । Dr. French এর হিসাব অনুযায়ী এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যান । দু'একটা উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে রোগের প্রকোপ কি মারাত্মক হয়েছিল । ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৬৮৭ জন । ১৮৭২ - এ তা কমে গিয়ে দাঁড়ায়া ৩২ হাজার ৬৮৭ তে। কাটোয়া মহকুমার ১৭টি গ্রামে ১৪ হাজার ৯৮২ জনের মধ্যে ৬ হাজার ২৪৩ জন মারা যান । ১৮৭৪ সালের হিসাবে অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে বারো বছরে জেলার প্রায় ৬লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ মারা গেছেন । সে সময় বর্ধমানে আধুনিক চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না তা বলাই বাহুল্য । জেলার অধিকাংশ অঞ্চল বনজঙ্গল, জলা এবং ঝিলে পরিপূর্ণ ছিল । নদনদীগুলির বন্যায় জেলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল প্রায়শই প্লাবিত হত ।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের আগে বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল । ' বর্ধমান জ্বর ' এর প্রাদুর্ভাবের পর সরকারের টনক নড়ে । ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক টীকা দেবার জন্য একাধিক ডিস্‌পেনসারী খোলা হয় । ১৮৯২ সালের প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে যে ওষুধপত্র এবং আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ 'বর্ধমান জ্বরে ' আক্রান্ত রুগীদের সেবায় সরকার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন । ১৮৯২ - এ জেলায় গ্রামাঞ্চলে মোট টীকা দেবার কর্মীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ জন । ১ লা অক্টোবর থেকে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত টীকা দেওয়া হতো - মাথাপিছু খরচ বরাদ্দ ছিল দু 'আনা । এ ছাড়া বর্ধমান শহরে ২ জন, আসানসোল, রাণীগঞ্জ এবং কালনা, দাঁইহাট এবং কাটোয়াতে একজন করে টীকা কর্মী নিযুক্ত করা হয় । ১৮৬৯ সালে এই শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়েছে । বর্ধমান শহরে বিনাখরচে ছয়টি টীকাদান কেন্দ্র স্থাপিত হয় । শহরে টীকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় । শহরগুলিতে পৌরসভার অধীনে বিনাব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয় । এ ছাড়া জেলা বোর্ডের অধীনে দশটি ডিসপেনসারী স্থাপনের খবর পাওয়া যাচ্ছে । বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরে এবং চকদিঘী (জামালপুর) তে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের খবর পাওয়া যাচ্ছে । বর্ধমানের রাজা শহরে একটি ' রাজ হাসপাতাল '(শ্যামসায়রের পূর্ব পারে) খুলছেন । কালনার ' রাজহাসপাতাল ' স্কটল্যান্ডের United Free Church of Scutland Medical Mission পরিচালনার দায়ীত্ব নেন । রায়না থানার বোকরা গ্রামের " ব্রহ্মময়ী দেবী দাতব্য চিকিৎসালয়ের" দায়িত্বও উক্ত সংস্থা গ্রহণ করেন । এ ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর নিজস্ব ডিসপেনসারী ছিল বর্ধমান, আসানসোল, অন্ডাল এবং সীতারামপুরে । কাঞ্চননগরের ডিসপেনসারীটির প্রতিষ্ঠাতা বাবু দীননাথ দাস (ডাক্তার ছিলেন) ।

বর্ধমান, কাটোয়া, রাণীগঞ্জ এবং চকদিঘীর ডিস্‌পেনসারীতে আউটডোর বিভাগ ছিল এবং ৩২ টি মহিলাদের জন্য এবং ৭৭টি পুরুষদের শয্যা ছিল। নীচে ১৮৩৭ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থাপিত ডিসপেনসারীগুলির একটি তালিকা দেওয়া হোল।

	নাম	কবে স্থাপিত হয়
১।	বর্ধমান	১৮৩৭
২।	কাটোয়া	১৮৬০ (১লা ফেব্রুয়ারী)
৩।	রাণীগঞ্জ	১৮৬৭ (১লা জানুয়ারী)

৪।	দাঁইহাট	১৮০২ (১লা ডিসেম্বর)
৫।	পূর্বস্থলী	১৮৯৬ (১লা আগষ্ট)
৬।	কুলীনগ্রাম	১৮০৫ (১লা জুন)
৭।	মাহাতা	১৮০২ (১লা জুন)
৮।	মেড়াল	১৮০২ (১লা জুন)
৯।	জামনা	১৮০৬ (১লা এপ্রিল)
১০।	আদরা	১৮০৪ (১৫ই মে)
১১।	খণ্ডঘোষ	১৮০৪ (৯ই সেপ্টেম্বর)
১২।	মঙ্গলকোট	১৮০৪ (১১ই নভেম্বর)
১৩।	কেতুগ্রাম	১৮০৫ (১লা সেপ্টেম্বর)
১৪।	আউসগ্রাম	১৮০৫ (১৮ই সেপ্টেম্বর)
১৫।	চকদিঘী	১৮৫৯ (১৫ই এপ্রিল)
১৬।	কাঞ্চননগর	১৯০৬ (৮ই জুলাই)

জুলাই ১৯০৮ সালে তৎকালীন বাংলার লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার বর্ধমানে একটি নতুন হাসপাতাল ভবনের শিলান্যাস করেন। মোট ব্যয় ধরা হয় দু'লক্ষ টাকা। বর্ধমানের মহারাজা জমি ছাড়াও ৮০ হাজার টাকা দান করেন। বাকী ৮০ হাজার সরকার দেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে জেলা বোর্ড রোগাক্রান্ত এলাকায় সাময়িক ডিস্‌পেনসারী খোলার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৯ সালে জেলা বোর্ড একটি ভাসমান ডিস্‌পেনসারী প্রবর্ত্তন করেন। তখন খড়ি নদী নাব্য ছিল। খড়ি নদীতে ১৮ মাইল এবং ভাগীরথী নদী পথে ৭৮ মাইল ভ্রমণ করে মোট ১৩টি জায়গায় এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বোঝা যাচ্ছে তখনও 'বর্ধমান জ্বর' সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি।

মিঃ স্মিথ নামক জনৈক ইংরেজের উদ্যোগে ১৮৯৩ সালে রাণীগঞ্জে একটি কুষ্ঠাশ্রম খোলা হয়। এছাড়া আসানসোলেও অনুরূপ একটি কুষ্ঠাশ্রম খেলা হয়। Mission to Lepers in India এবং Wesleyan Mission কুষ্ঠাশ্রমগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। বর্ধমানের রাজা এবং রাণীগঞ্জের বাবু ভগবান দাস মাড়োয়ারী কুষ্ঠাশ্রম দুটিকে আর্থিক সাহায্য দিতেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ধমানের স্বাস্থ্যচিত্র এই। ১৯০১ সালে জেলার লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে। এই স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে জেলার ১৫ লক্ষ লোকের পক্ষে নেহাতই অপ্রতুল তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। গত ৮০ বছরে এ জেলার স্বাস্থ্যচিত্র যে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে বিশেষতঃ স্বাধীনতার পরবর্ত্তী চল্লিশ বছরে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্সারী এবং ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের যে বিরাট উপকার হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে বর্ধমান জেলার হাসপাতাল, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলায় লোক সংখ্যাও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। ১৯০১ সালে লোকসংখ্যা ছিল যেখানে ১৫ লক্ষ ৩৩ হাজারের কিছু বেশী ১৯৮১ তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ লক্ষের মত। স্বাধীনতার পর থেকে সরকার এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়তে থাকে। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমরা কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি যার মাধ্যমে জেলার স্বাস্থ্যচিত্র বোঝা যাবে।

১৯৮৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত জেলায় প্রধান হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ৯টি। নীচে এই ৯ টি হাসপাতালের নাম এবং শয্যাসংখ্যা দেওয়া হলো।

১।	বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল	১০০৪	টি শয্যা সম্বলিত।
২।	কালনা মহকুমা হাসপাতাল	১২৫	টি ,, ,,
৩।	কাটোয়া ,, ,,	১৫০	টি ,, ,,
৪।	দুর্গাপুর ,, ,,	১৩১	টি ,, ,,
৫।	আসানসোল ,, ,,	২০৫	টি ,, ,,
৬।	চিত্তরঞ্জন গ্রামীণ হাসপাতাল, ভাতার	৫০	টি ,, ,,
৭।	সিঙ্গত গ্রামীণ হাসপাতাল	৫০	টি ,, ,,
৮।	বল্লভপুর ,, ,,	৫০	টি ,, ,,
৯।	মেমারী ,, ,,	৬০	টি ,, ,,
	মোট	১৮২৫	টি ,, ,,

১৯৮৯-এ এসে হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যা এবং চিকিৎসার সুবিধা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। শয্যা সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার মত। ১৯৮৬ সালের জুন মাসে জেলার মোট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা (P.H.C, S.H.C. এবং উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির যোগফল) = ৪২১ টি। ব্লক অনুযায়ী সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো।

বর্ধমান সাব-ডিভিশনে :

সদর ব্লক = ২৫ টি ; খণ্ডঘোষ ব্লক : ১৬ টি ; রায়না (১) ব্লক = ১৭ টি ;
রায়না (২) ব্লক = ১৩ টি ; জামালপুর ব্লক : ২২ টি ; ভাতার ব্লক = ২৮ টি ।
আউসগ্রাম (১) ব্লক = ১৫ টি ; আউসগ্রাম (২) ব্লক = ১৬ টি ; মেমারী ব্লক (১) = ২৮ টি ;
মেমারী (২) ব্লক = ১৯ টি ; গলসী (১) ব্লক = ২০ টি ; গলসী (২) ব্লক = ১২ টি

কালনা সাবডিভিশনে :

কালনা (১) ব্লক : ১৪ টি ; কালনা (২) ব্লক : ১৩ টি ; পূর্বস্থলী (১) = ৭ টি
পূর্বস্থলী (২) ব্লক : ১৬ টি ; মন্তেশ্বর ব্লক : ১৫ টি; কাটোয়া (১) = ১০ টি
কাটোয়া (২) ব্লক : ৯ টি ; কেতুগ্রাম (১) ব্লক : ২১ টি ; কেতুগ্রাম (২) ব্লক = ৫ টি
মঙ্গল কোট ব্লক : ২১ টি ।

দুর্গাপুর সাবডিভিশান :

কাঁকসা ব্লক : ১০ টি ; ফরিদপুর ব্লক : ৭ টি ; অণ্ডাল ব্লক = ৫ টি।

আসানসোল সাবডিভিশান :

রাণীগঞ্জ ব্লক = ৩ টি ; সালানপুর ব্লক = ৪টি ; কুলটি ব্লক = ৪ টি
বারাবণী ব্লক : ১০ টি ; জামুরিয়া (১) ব্লক = ৪ টি ; জামুরিয়া (২) ব্লক = ৪ টি
আসানসোল ব্লক = ৩টি ; হীরাপুর ব্লক = ৩ টি।

শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পসংস্থার নিজস্ব যে সব হাসপাতাল আছে সে হিসাব এখানে ধরা হয় নি। বর্ধমান শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নতুন একটি জেলা হাসপাতালের তৈরীর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই স্বাস্থ্য

কেন্দ্রগুলিতে মোট শয্যাসংখ্যা ছিল ১৪৫ টি। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড় হাজারের মত।

১৯৮৫-৮৬ সালে এ জেলায় পরিবার কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৪৬ টি। জেলায় অসংখ্য নার্সিং হোম রয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যাও কলকাতার পরেই। বর্ধমান শহরের খোসবাগান মহল্লায় একসঙ্গে যতজন ডাক্তারের চেম্বার পৃথিবীর অন্য কোনো একটি অঞ্চলে তা নেই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথমে প্রি-মেডিক্যাল এবং পরে এম, বি, বি, এস কোর্স পড়ানোর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। কলকাতার পরেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের স্থান। বর্ধমান রাজ প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল স্কুল, ১৯০৮-এ জেলার হাসপাতাল যা পরে বিজয়চাঁদ হাসপাতাল নামে প্রসিদ্ধ হয় এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। হুগলী, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। বর্ধমানে ডাক্তারের কোনো অভাব নেই। অসংখ্য নার্সিং হোম এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই জেলায়। তৎসত্ত্বেও সব রোগের চিকিৎসা এ জেলায় হয় না। কলকাতার উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য এ জেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো উন্নতি এবং সম্প্রসারণ প্রয়োজন। চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রসার ঘটেছে - সে তুলনায় বর্ধমান অনেক পিছিয়ে। জেলার লোক সংখ্যা ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী ৪৮ লক্ষ ১৯৯১-এ তা দাঁড়াবে ৬০ লক্ষে। গ্রামাঞ্চলে P.H.C., S.H.C এবং উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি এই বিপুল পরিমাণ সংখ্যক মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। শুধু হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সংখ্যাবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় - আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধির দিকেই নজর দেওয়া প্রয়োজন । ৪২১ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৬৬৯ টি গ্রামের এবং ৪৯ টি শহরের ৬০ লক্ষ অধিবাসীর প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় ।

ঋণস্বীকার : (১) বর্ধমান গেজেটীয়র ১৯১০

(২) সাংবাদিক প্রবীর চট্টোপাধ্যায় তথ্য সংগ্রহ করে সহযোগিতা করেছেন।

বর্ধমান চর্চা : কিছু তথ্য :

ভূগোল :

১) ভৌগলিক আয়তন : ৭০২৮ বর্গ কি মি।

মৌজার সংখ্যা : ২৭২৮ টি।

বিদ্যুৎ পৌঁছেছে : ১৯৬৬ টি মৌজায় (১৯৮৭ পর্যন্ত)

ব্লক : ৩৩ টি।

পঞ্চায়েত সমিতি : ৩১ টি।

নোটিফায়েড অথরিটি : ২ টি।

গ্রাম পঞ্চায়েত : ২৯৪ টি।

২) জনসংখ্যার গঠন : ধর্মের ভিত্তিতে

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে :

হিন্দু : ১২২১ ০২৭ জন (৭৯.৬%)

মুসলমান : ২৪৭ ৪০৩ জন (১৮.৭%)

খ্রীস্টান	ঃ	২ ৯৬০	জন (এর মধ্যে ইউরোপীয় ১০৬১ জন ৮৭২ জন ইউশেপিয়ান এবং দেশীয় ১,০৭২ জন)
অন্যান্য	ঃ	৩৭	জন
সাঁওতাল এবং অন্যান্য	ঃ	২১ ০৪৮	জন।
	মোট	১৪৯০ ৭৪৭	জন

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঃ

হিন্দু	ঃ	৩৯৩৮৩৭৬	(৮১.৪৫%)
মুসলমান	ঃ	৮৫০৯৫১	(১৭.৬০%)
খ্রীস্টান	ঃ	২২৯৭০	(০.৪৭%)
শিখ	ঃ	১৪১০৬	(০.২৯%)
বৌদ্ধ	ঃ	৭৬৭	(০.০২%)
জৈন	ঃ	১৪৩২	(০.০৩%)
অন্যান্য	ঃ	৬৭৮৬	(০.১৪%)
	মোট ঃ	৪৮৩৫৩৮৮	জন।

মন্তব্য ঃ (১) এ জেলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ সেনসাস বা জনগণনা হয় - ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে

(২) ৮০ বছরেও এ জেলায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় অপরিবর্ত্তিত রয়ে গেছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও নারী পুরুষের অনুপাত একই। ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৫১ জনের মধ্যে মুসলিম মহিলার সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬ হাজার ৪ জন।

৩) তপশীলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা ঃ

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঃ তপ ঃ জাতি = ৯৫৯৯৯৪ জন ; তঃ উঃ জাতি =২২৮৬০৫

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঃ তপ ঃ জাতি = ১২১৩৪৩৫ জন ; তঃ উঃ জাতি =২৭৮১৯০